শাইখুল ইসলাম আল্লামা তাকী উসমানী [দা. বা.]

ইসলাহী খুতুবাত

অনুবাদ

মাওলানা মুহাম্মাদ উমায়ের কোব্বাদী

উস্তাযুল হাদীস ওয়াত্তাফসীর মাদরাসা দারুর রাশাদ
মিরপুর, ঢাকা।
খতীব বাইতুল ফালাহ জামে মসজিদ
মধ্যমণিপুর, মিরপুর ঢাকা।

[অভিজাত ইসলামী পুস্তক প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান]

ইসলামী টাওয়ার (আন্ডার গ্রাউন্ড)
১১/১, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

আপনার সংগ্রহে রাখার মতো আমাদের আরো কয়েকটি গ্রন্থ

সূচিপত্র

দাওয়াত ও তাবলীগের মূলনীতি

সুখময় জীবনের সন্ধানে

মানুষকে কষ্ট দেয়া

পাপমুক্তির উপায় ও আল্লাহভীতি

আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে সদাচরণ

মুসলিম মুসলিম ভাই ভাই

সৃষ্টিকে ভালোবাসুন

আলেম–ওলামাকে অবজ্ঞা করো না

গোস্বাকে কাবু করুন

মুমিন মুমিনের আয়না

দুটি ধারা—কিতাবুল্লাহ ও রিজালুল্লাহ

দাওয়াত ও তাবলীগের মূলনীতি

"বর্তমানে তোমরা মূসা (আ.) ও হারুন (আ.) হতে পারবে না। আর তোমাদের সামনে ফেরাউন অপেক্ষা বড় পথভ্রষ্টকেও পাবে না। এতদসত্ত্বেও হযরত মূসা (আ.) ও হারুন (আ.)-কে বলা হচ্ছে যে, তোমরা যখন ফেরাউনের কাছে যাবে, তখন কোমলভাবে কথা বলবে— কর্কশভাবে নয়। এ ঘটনার মাধ্যমে শুধু আমাদের জন্যই নয়; বরং কেয়ামত পর্যন্ত আগত সকল দাঈর জন্য এ শিক্ষা রয়েছে যে, দ্বীনের কথা কঠোরভাবে নয়; বরং নরমভাবে বলতে হবে।"

"দ্বীনের কথা তো কোনো পাথর নয় যে, উঠিয়ে মেরে দিতে হবে কিংবা এমন কোনো বিষয়ও নয় যে, অবহেলা করা হবে। বরং বুঝতে হবে, কথা বললে শ্রোতার প্রতিক্রিয়া কী হতে পারে।"

দাওয়াত ও তাবলীগের মূলনীতি

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ، وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّاٰتِ اَعْمَالِنَا، مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِىَ لَهٗ، وَاَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ، وَاَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَسَنَدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ .... صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا — اَمَّا بَعْدُ :

فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ — بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكَاةَ وَيُطِيْعُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ أُولٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللّٰهُ إِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ○ (سورة التوبة ٧١)

اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ صَدَقَ اللّٰهُ مَوْلَانَا الْعَظِيْمُ ، وَصَدَقَ رَسُوْلُهُ النَّبِىُّ الْكَرِيْمُ ، وَنَحْنُ عَلٰى ذٰلِكَ مِنَ الشَّاهِدِيْنَ وَالشَّاكِرِيْنَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ —

হাম্‌দ ও সালাতের পর

আল্লাহ তাআলা বলেছেন, 'আর ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারী একে অপরের সহায়ক। তারা ভালো কথা শিক্ষা দেয়, মন্দ থেকে বিরত রাখে, নামায প্রতিষ্ঠা করে, যাকাত দেয় এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের নির্দেশ অনুযায়ী জীবনযাপন করে। এদের উপরই আল্লাহ্ তা'আলা দয়া করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, সুকৌশলী। -(সূরা আত-তাওবা : ৭১)

আমর বিল মা'রূফ ও নাহী 'আনিল মুনকারের স্তর

আয়াতটি আমর বিল মা'রূফ ও নাহী 'আনিল মুনকার-এর সঙ্গে সম্পর্কিত। আমর বিল মা'রূফ এর অর্থ 'ভালো'র নির্দেশ দেয়া। নাহী 'আনিল মুনকার অর্থ 'মন্দ' থেকে বিরত রাখা। ফুকাহায়ে কেরাম লিখেছেন, অপরকে নিজ সাধ্যমত মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখা নামাযের মতই ফরযে আইন। অর্থাৎ- আমর বিল মা'রূফ ও নাহী 'আনিল মুনকার ফরযে আইন- এটা আমরা জানি। কিন্তু এর বিস্তারিত বিবরণ আমাদের অনেকেরই অজানা। ফলে আমরা অনেকেই এ ব্যাপারে উদাসীন। নিজেদের বিবি-বাচ্চাকে হারাম কাজ করতে দেখেও মুখে কুলুপ এঁটে বসে থাকি। আবার আমরা অনেকেই এ বিষয়ে বাড়াবাড়ি করে ফেলি। সকাল থেকে শুরু করে সন্ধ্যা পর্যন্ত শুধু মানুষের দোষ ধরতে থাকি এবং মানুষকে ত্যক্ত-বিরক্ত করে ফেলি। মোটকথা, আলোচ্য আয়াতের উপর আমল করার ব্যাপারে আমাদের মধ্য থেকে একদল ছাড়াছাড়িতে লিপ্ত, আরেক দল বাড়াবাড়িতে লিপ্ত। কারণ, আয়াতের সঠিক মর্মার্থ আমরা অনেকেই জানি না। তাই এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা প্রয়োজন।

দাওয়াত ও তাবলীগের দুটি পদ্ধতি

প্রথমত বুঝে নিন, দ্বীনের কথা অপরের কাছে পৌছানোর, তথা দাওয়াত-তাবলীগের দু'টি পদ্ধতি রয়েছে। (১) ইনফিরাদী। অর্থাৎ- ব্যক্তিগতভাবে দ্বীনের কথা পৌছানো। যেমন- এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে কোনো মন্দ কাজে লিপ্ত দেখলো কিংবা তাকে ফরয-ওয়াজিবের ব্যাপারে উদাসীন দেখলো, তাই সে ব্যক্তিগতভাবে লোকটিকে বুঝিয়ে বললো যে, মন্দ কাজটা ছেড়ে দাও এবং নেক আমল করো। (২) ইজতিমাঈ। অর্থাৎ- সম্মিলিতভাবে বা একজন একসঙ্গে অনেক লোকের কাছে দ্বীনের কথা পৌছানো। যেমন বড় কোনো মাহফিলে ওয়াজ-নসীহত করা, দ্বীনের ইল্‌ম একসঙ্গে অনেক লোককে শিক্ষা দেয়া,

উপস্থিত কোনো প্রয়োজন ছাড়া নিজ থেকে উদ্যোগী হয়ে বিভিন্ন লোকের কাছে দ্বীনের কথা নিয়ে যাওয়া এবং দ্বীনের কথা তাদেরকে শোনানো। 'মাশাআল্লাহ' আমাদের তাবলীগ জামাতের ভাইয়েরা সাধারণত দ্বীনের দাওয়াত পৌঁছিয়ে থাকে। এটা ইজতিমাঈ তাবলীগ।

দাওয়াত ও তাবলীগের উক্ত দু'টি পদ্ধতির বিধান ও আদব ভিন্ন-ভিন্ন।

ইজতিমাঈ তাবলীগ ফরযে কিফায়াহ

ইজতিমাঈ তাবলীগ ফরযে আইন নয়, বরং ফরযে কিফায়াহ। সুতরাং প্রত্যেক মুসলমানের জন্য জরুরি নয় যে, মানুষের বাড়ি-ঘর বা দোকান-পাটে গিঁয়ে দ্বীনের কথা পৌঁছিয়ে দিয়ে আসবে। কারণ, এটা ফরযে কিফায়াহ, যা কিছু লোক করলে অবশিষ্টরাও এ থেকে অব্যাহতি পেয়ে যায়। আর কেউ না করলে প্রত্যেকেই গুনাহগার হয়। যেমন জানাযার নামায ফরযে কিফায়াহ। এজন্য প্রত্যেকের জন্য জানাযায় অংশগ্রহণ করা জরুরি নয়। অংশগ্রহণ করলে সাওয়াব পাবে, না করলে গুনাহগার হবে না। তবে কেউই যদি জানাযার নামায না পড়ে, তাহলে অবশ্যই সকলেই গুনাহগার হবে। একেই বলা হয় ফরযে কিফায়াহ। অনুরূপভাবে ইজতিমাঈ দাওয়াতও ফরযে কিফায়াহ– ফরযে আইন নয়।

ইনফিরাদী তাবলীগ ফরযে আইন

ইনফিরাদী তাবলীগ ফরযে আইন। যেমন– কাউকে মন্দ কাজে লিপ্ত কিংবা ফরয-ওয়াজিব ছেড়ে দিতে দেখলে, তাকে এই কাজ থেকে সাধ্যানুযায়ী বাধা দেয়া ফরযে কিফায়াহ নয়; বরং ফরযে আইন। আর ফরযে আইন হওয়ার অর্থ হলো, প্রত্যেককেই কাজটি করতে হবে। এটা মাওলানা-মৌলভীদের কাজ বা তাবলীগওয়ালাদের কাজ বলে হাত গুটিয়ে বসে থাকা যাবে না। যে এরূপ বসে থাকবে, সে গুনাহগার হবে।

আমর বিল মা'রূফ ও নাহী 'আনিল মুনকার ফরযে আইন

আল্লাহ তাআলা কুরআন মজীদের একাধিক আয়াতে বান্দাদের গুণ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন– يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ 'তারা মানুষকে সৎকাজের আদেশ করে এবং অসৎকাজ থেকে বিরত রাখে'। এজন্যই এটা ফরযে আইন। পাঁচ ওয়াক্ত নামায, রামাযানের রোজা, যাকাত ও হজ্ব যেমনিভাবে ফরযে আইন– প্রত্যেককেই আদায় করতে হয়; অনুরূপভাবে আমর

বিল মা'রূফ ও নাহী আনিল মুনকারও ফরযে আইন। এটিও প্রত্যেককেই করতে হয়। নিজের চোখে নিজের সন্তান-সন্ততিকে হারাম কাজ করতে দেখেও যদি তাদেরকে এ কাজ থেকে বিরত রাখার তাগিদ কোনো মুসলিম অভিভাবকের অন্তরে উদিত না হয়, তাহলে এটা তার জন্য কবীরা গুনাহ হবে। সারা জীবন নামায, রোযা, হজ্ব, যাকাতসহ সবকিছু ঠিক মতই হয়ত আদায় করা হলো, কিন্তু পরিবারকে মন্দ থেকে বিরত রাখলো না, তাহলে এর জন্য তাকে অবশ্যই আল্লাহ্‌র দরবারে জবাবদিহি করতে হবে। এজন্যই শুধু নিজে শুদ্ধ হয়ে যাওয়ার নাম 'শুদ্ধ' হওয়া নয়, বরং নিজে শুদ্ধ হওয়ার পাশাপাশি অপরকেও শুদ্ধ করার ফিকির করা আবশ্যক।

যখন নাহী 'আনিল মুনকার ফরয নয়

অবশ্য এখানেও কিছু ব্যাখ্যা আছে। তা হলো, নাহী 'আনিল মুনকার ফরয হওয়ার ক্ষেত্র কী? মূলত এর ক্ষেত্র হলো, যখন বাধাপ্রাপ্ত ব্যক্তি বাধা পেয়ে তার মন্দ কাজটি ছেড়ে দিবে বলে আশা করা যাবে এবং এর ফলে বাধাদানকারীকে কোনো প্রকার কষ্ট দেয়ার আশঙ্কা না থাকবে। সুতরাং যদি কোনো ব্যক্তি গুনাহে লিপ্ত থাকে আর আপনি তা দেখে ভাবলেন যে, লোকটিকে আমি যে করেই হোক এ কাজ থেকে বিরত রাখবো। কিন্তু এটাও আপনি ভালো করেই জানেন যে, সে আপনার কথা মানবে না। এও জানেন যে, সে বরং উল্টো পথে হাঁটবে। এমনকি হয়ত ইসলামী শরীয়ত নিয়ে কটাক্ষ করবে, যার ফলে হয়ত সে কাফের হয়ে যাবে। কেননা, শরীয়তের কোনো বিধান নিয়ে উপহাস করা শুধু কবীরা গুনাহই নয়, বরং কুফরিও। আর লোকটির ব্যাপারে এ জাতীয় আশঙ্কা পুরোমাত্রায় রয়েছে। তাহলে এরূপ ক্ষেত্রে নাহী 'আনিল মুনকার আর ফরয থাকে না। বরং এরূপ ক্ষেত্রে উচিত হলো, তাকে উপেক্ষা করা এবং তার জন্য এভাবে দু'আ করতে থাকা যে, হে আল্লাহ্! আপনার এ বান্দা একটি গুনাহে লিপ্ত, সে আত্মার রোগী; আপনি দয়া করে তাকে এ রোগ থেকে মুক্তি দান করুন।

গুনাহে লিপ্ত অবস্থায় বাধা দেয়া

এক ব্যক্তি পরিপূর্ণ উদ্দামতা নিয়ে গুনাহে লিপ্ত। এ মুহূর্তে তার কাছে সত্য কথা কাঁটার মতই মনে হবে। তার মাঝে এ মুহূর্তে কারো কথা শোনার সম্ভাবনাই নেই। এমনি মুহূর্তে এক ব্যক্তি দ্বীনের তাবলীগ নিয়ে তার কাছে গেলো। ভাবলো না যে, এর প্রতিক্রিয়া কী হবে? আগ-পর বিবেচনা না করে

তাকে দ্বীনের দাওয়াত দিলো। ফলে সে তা তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিলো এবং দ্বীন সম্পর্কে হয়ত অত্যন্ত আপত্তিকর মন্তব্যও করে বসলো, যার কারণে হয়ত সে কাফের হয়ে গেলো। কিন্তু তার এই পরিণাম কার কারণে হলো? যে ব্যক্তি স্থান-কাল না বুঝে তাবলীগ করেছে তার কারণে। এ কারণে ঠিক গুনাহের মুহূর্তে গুনাহ থেকে বাধা না দেয়াই ভালো। তাই কর্তব্য হলো, সুযোগের অপেক্ষা করা এবং সুযোগ এলে তাকে বিষয়টি বুঝিয়ে বলা।

মানা ও না-মানার সম্ভাবনা যদি সমান হয়

যদি মানা ও না মানার সম্ভাবনা থাকে, অর্থাৎ– আপনি যদি মনে করেন যে, লোকটি আমার কথা শুনতে পারে, আবার নাও শুনতে পারে, তাহলে এরূপ ক্ষেত্রেও দ্বীনের কথা পৌঁছিয়ে দিতে হবে। কেননা, এমনও তো হতে পারে যে, আপনার কথা তার অন্তরে রেখাপাত করবে। যার ফলে আল্লাহ তাআলা তাকে ইসলাহের তাওফীক দিয়ে দেবেন আর সে পরিশুদ্ধ হয়ে যাবে। এর ফলে তার অবশিষ্ট জীবনের নেকগুলোও আপনার আমলনামায় লেখা হতে থাকবে।

যদি কষ্ট দেয়ার আশঙ্কা থাকে

যদি মনে করেন, লোকটি গুনাহে লিপ্ত। তাই বাধা দেয়া যায়। বাধা দিলে সে দ্বীন নিয়ে উপহাস করবে না। তবে হয়ত আপনাকে সে কষ্ট দেবে, তাহলে এরূপ ক্ষেত্রে আমর বিল মা'রূফ ও নাহী আ'নিল মুনকার আপনার উপর ফরয নয়; বরং জায়েয। তবে এক্ষেত্রেও আপনার জন্য উত্তম হলো দ্বীনের কথা বলে দেয়া এবং প্রয়োজনে কিছু কষ্ট সহ্য করা।

মোটকথা, উক্ত তিনটি অবস্থা মনে রাখবেন। যার সারমর্ম হলো, যেখানে এ আশঙ্কা থাকবে যে, লোকটি আপনার কথা শুনবে না; বরং ইসলাম নিয়ে উপহাস করবে, সেক্ষেত্রে আমর বিল মা'রূফ করা যাবে না। বরং চুপ থাকতে হবে। আর যে ক্ষেত্রে শোনা বা না-শোনা উভয় সম্ভাবনাই রয়েছে, সে ক্ষেত্রে আমর বিল মা'রূফ জরুরি বিধায় দ্বীনের কথা আপনাকে বলে দিতে হবে। পক্ষান্তরে যেক্ষেত্রে ইসলাম সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করবে এ আশঙ্কা না থাকলেও আপনাকে কষ্ট দিবে এ আশঙ্কা আছে, সে ক্ষেত্রে আপনি স্বাধীন– ইচ্ছা করলে দাওয়াত দিতে পারেন, ইচ্ছা করলে নাও পারেন। তবে এ ক্ষেত্রে উত্তম হলো প্রয়োজনে কষ্ট স্বীকার করে নিয়ে হলেও দ্বীনের দাওয়াত পৌঁছিয়ে দেয়া।

নিয়ত শুদ্ধ হওয়া চাই

দ্বিতীয় কথা হলো, ইসলামের কথা বলার সময় নিয়ত বিশুদ্ধ করে নেয়া চাই। এটা মনে করা যাবে না যে, আমি বুযুর্গ কিংবা মহান বনে গেছি। দ্বীনদার-মুত্তাকী বনে গেছি এবং অন্যরা সব পাপিষ্ঠ রয়ে গেছে। এদেরকে শুদ্ধ করার জন্য আমি কোমর বেঁধে নেমেছি। খোদায়ী সৈন্য বা দারোগা হয়েই এদেরকে শায়েস্তা করতে হবে। এরূপ মনে করলে আপনার কথার মাঝে কোনো নূর থাকবে না। আপনারও ফায়দা হবে না, শ্রোতারও ফায়দা হবে না। কেননা, এরূপ মনে করার অর্থই হলো আপনার নিয়ত অহঙ্কার ও প্রদর্শনীর সঙ্গে তালগোল পাকিয়ে গেছে। সুতরাং আপনার এই আমল আল্লাহর দরবারে মূল্যহীন হয়ে পড়েছে।

বলার পদ্ধতি সঠিক হতে হবে

অনুরূপভাবে দ্বীনের কথা বলতে হলে সহীহ তরিকায় বলতে হবে। কথার মাঝে মহব্বত, দরদ ও কল্যাণকামিতার চিহ্ন ফুটে উঠতে হবে, যেন যাকে বলা হবে, তার অন্তর না ভাঙ্গে। পাশাপাশি এমন পদ্ধতিতে বলতে হবে, যেন তার ইজ্জতের উপর আঘাত না আসে। শাইখুল ইসলাম হযরত মাওলানা শিব্বীর আহমদ উসমানী (রহ.) একটা কথা বলতেন, যা আব্বাজান মুফতী শফী (রহ.)-এর মুখে আমরা বহুবার শুনেছি। তাহলো, হক কথা যদি হক তরিকায় ও হক নিয়তে বলা হয়, তাহলে কোনো ঝগড়া-ফ্যাসাদ সৃষ্টি হতে পারে না। সুতরাং কোথাও যদি হক কথার কারণে ঝগড়া সৃষ্টি হতে দেখ, তাহলে বুঝে নেবে যে, হয়ত তার কথাই হক ছিলো না বা তরিকা হক ছিলো না কিংবা নিয়ত হক ছিলো না; বরং নিয়ত ছিলো অন্যকে শরম দেবে, যার কারণে ঝগড়া-বিবাদ সৃষ্টি হয়েছে।

কোমলতার সঙ্গে বোঝাতে হবে

আমার আব্বাজান বলতেন, আল্লাহ তাআলা হযরত মূসা ও হারূন (আ.)-কে পাঠিয়েছেন ফেরাউনকে সঠিক পথে আনার জন্য। ফেরাউন তো ফেরাউনই, যে খোদায়ী দাবী করেছিলো। সে বলতো– أَنَا رَبُّكُمُ الأَعْلَى 'আমিই বড় প্রভু'। এমন জঘন্যতম কাফের ছিলো এ ফেরাউন। মূসা ও হারূন (আ.)-কে নির্দেশ দেয়া হয়েছিলো এ জঘন্য কাফেরের কাছে দ্বীনের কথা পৌঁছিয়ে দেয়ার জন্য।

আল্লাহ্‌র নির্দেশ পালনার্থে যখন তারা ফেরাউনের মহলের দিকে রওনা হলেন, তখন আল্লাহ তাআলা বললেন :

قُوْلاَ لَهُ قَوْلاً لَّيِّنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى -

অর্থাৎ– তোমরা ফেরাউনের কাছে গিয়ে নরম ভাষায় কথা বলবে। হয়ত সে উপদেশ গ্রহণ করবে অথবা ভয় পাবে। –(সূরা ত্বাহা : ৪৪)

এ ঘটনা শুনানোর পর আব্বাজান (রহ.) বলতেন, বর্তমানে তোমরা মূসা (আ.) থেকে বড় মুবাল্লিগ হতে পারবে না। আর তোমাদের সামনে ফেরাউনের চেয়ে বড় গোমরাহ ব্যক্তিকেও পাবে না। এতদসত্ত্বেও হযরত মূসা ও হারুন (আ.)-কে বলা হচ্ছে, যখন তোমরা ফেরাউনের কাছে যাবে, কোমলভাবে কথা বলবে– কর্কশভাবে কথা বলবে না। এই ঘটনার মাধ্যমে শুধু আমাদের জন্য নয়, বরং কেয়ামত পর্যন্ত আগত সকল দাঈর জন্যও শিক্ষা রয়েছে যে, দ্বীনের কথা নরমভাবে বলতে হবে।

রাসূলুল্লাহ (সা.) যেভাবে বোঝাতেন

একবারের ঘটনা। রাসূলুল্লাহ (সা.) মসজিদে নববীতে তাশরীফ আনলেন। সাহাবায়ে কেরামও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। ইত্যবসরে এক গ্রাম্য লোক প্রবেশ করলো। এসেই তড়িঘড়ি করে নামায পড়ে নিলো। নামাযের পর বিরল ও বিস্ময়কর একটি দু'আ করলো–

اَللّٰهُمَّ ارْحَمْنِىْ وَمُحَمَّدًا وَلاَ تَرْحَمْ مَعَنَااَحَدًا -

'হে আল্লাহ্! আমার উপর আর মুহাম্মদ (সা.)-এর উপর রহম করুন। এ ছাড়া কারো উপর রহম করবেন না।'

রাসূলুল্লাহ (সা.) দু'আটি শুনে বললেন, তুমি শুধু দুজনের উপরে আল্লাহ্‌র রহমতের দু'আ করেছ। এভাবে তো তুমি আল্লাহ্‌র রহমতকে সংকীর্ণ করে তুলেছ। অথচ আল্লাহ্‌র রহমত তো অনেক প্রশস্ত।

এর একটু পরেই লোকটি মসজিদের বারান্দায় বসে পেশাব করে দিলো। একাণ্ড দেখে সাহাবায়ে কেরাম লোকটির দিকে দৌড়ে গেলেন এবং বকাঝকা শুরু করলেন, যা দেখে রাসূলুল্লাহ (সা.) সাহাবায়ে কেরামের উদ্দেশ্যে বললেন–

لاَتُزْرِمُوْهُ (صحيح مسلم ، كتاب الطهارة ، باب وجوب غسل البول)

অর্থাৎ– 'তাকে পেশাব করতে দাও। বাধা দিও না। তাকে তার কাজ করতে দাও। বকাঝকা করো না।' এরপর বললেন–

اِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِيْنَ وَلاَ تُبْعَثُوْامُعَسِّرِيْنَ -

অর্থাৎ– মানুষের কল্যাণকামিতা ও তাদের সঙ্গে সহজ আচরণের জন্য আল্লাহ্ তোমাদেরকে পাঠিয়েছেন। তোমরা কঠোরতা প্রদর্শনের জন্য প্রেরিত হওনি। সুতরাং যাও। পানি নিয়ে আস, পেশাব ধুয়ে দাও। মসজিদ পরিষ্কার করে দাও।

তারপর তিনি লোকটিকে ডাকলেন এবং বুঝিয়ে বললেন, মসজিদ আল্লাহ্‌র ঘর। এ জাতীয় কাজের জন্য মসজিদ নয়। সুতরাং তোমার কাজটি ঠিক হয়নি। ভবিষ্যতে আর এরূপ করো না। –(মুসলিম শরীফ, পবিত্রতা অধ্যায়)

যেভাবে দাওয়াত দিয়েছেন আম্বিয়ায়ে কেরাম

যদি আজ এমন কোনো কাণ্ড আমাদের সামনে ঘটতো, তাহলে পিটিয়ে হয়ত তার হাড় ভেঙ্গে দিতাম। কিন্তু আল্লাহ্‌র রাসূল (সা.) তা করলেন না; বরং তিনি মনে করলেন, লোকটি তো অজ্ঞ। কাণ্ডটি এজন্যই ঘটিয়েছে। কাজেই এটা তাকে বকাঝকা করার ক্ষেত্র নয়। বরং কোমলতা মিশিয়ে বোঝালেই সে লজ্জিত হবে। মূলত এটাই ছিলো আম্বিয়ায়ে কেরামের শিক্ষা। বিরুদ্ধবাদীরা গালি দিলেও তাঁরা জবাব দেননি। কুরআন মজীদে মুশরিকদের বক্তব্য বিবৃত হয়েছে যে, তারা নবীদেরকে সম্বোধন করে বলেছিলো–

إِنَّا لَنَرَاكَ فِيْ سَفَاهَةٍ وَّإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِيْنَ -

অর্থাৎ– আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, আপনারা বোকা এবং আমাদের ধারণামতে আপনারা মিথ্যুকও'। –(সূরা আল আ'রাফ : ৬৬)

আর যদি কেউ কোনো আলেম, খতীব বা বক্তাকে এ ধরনের কথা বলে, তাহলে নিশ্চয় উত্তর আসবে যে, আমি নই, বরং তুমি বোকা। তোমার বাপ বোকা। অথচ আম্বিয়ায়ে কেরামের উত্তর দেখুন, তারা বলেছিলেন–

يَا قَوْمِ لَيْسَ بِيْ سَفَاهَةٌ وَّلٰكِنِّيْ رَسُوْلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعَالَمِيْنَ -

'হে আমার জাতি! বোকামি আমার স্বভাব নয়, বরং আমি রাব্বুল আলামীনের রাসূল।' –(সূরা আল আ'রাফ : ৬৭)

দেখুন, তাঁরা গালির জবাব গালি দিয়ে দেননি। বরং তারা দরদ ও ভালোবাসাপূর্ণ ব্যবহার করেছেন।

অপর একটি জাতি তাদের কাছে প্রেরিত নবীকে বলেছিলো–

إِنَّا لَنَرَاكَ فِيْ ضَلاَلٍ مُّبِيْنٍ -

আমরা আপনাকে স্পষ্ট পথভ্রষ্টতার মধ্যে দেখতে পাচ্ছি।

-(সূরা আল-আ'রাফ : ৬০)

উত্তরে তিনি বলেছিলেন, 'হে আমার জাতি! আমি পথভ্রষ্ট নই। আমি আল্লাহ্র রাসূল।'

এটাই ছিলো নবীদের দাওয়াতের পদ্ধতি। এজন্যই বলি, আমাদের কথায় কাজ হয় না কেন? এর কারণ হলো, হয়ত কথা হক ছিলো না বা বলার পদ্ধতি হক ছিলো না কিংবা নিয়ত হক ছিলো না।

হযরত ইসমাঈল শহীদ (রহ.)-এর ঘটনা

হযরত শাহ ইসমাঈল শহীদ (রহ.) ওইসব বুযুর্গদের একজন, যাঁরা এ তরিকার উপর আমল করে দেখিয়েছেন। তাঁর ঘটনা, একবার তিনি দিল্লির জামে মসজিদে ওয়াজ করছিলেন। ইত্যবসরে এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বললো, আমার একটি প্রশ্ন আছে। ইসমাঈল শহীদ (রহ.) জিজ্ঞেস করলেন, 'কী প্রশ্ন?' লোকটি বললো, আমি শুনেছি, আপনি জারজ সন্তান।'

লোকটি এমন জঘন্যতম কথা এমন এক ব্যক্তিকে বলেছে, যিনি শুধু একজন বড় আলেমই নন, বরং শাহী খান্দানের একজন শাহজাদাও। তাঁর স্থানে যদি আমরা হতাম, না জানি কী কেয়ামত ঘটাতাম। আমরা না করলেও আমাদের ভক্তবৃন্দ তো অবশ্যই মহাকাণ্ড ঘটিয়ে ছাড়তো। কিন্তু মাওলানা ইসমাঈল শহীদ (রহ.)-কে দেখুন, তিনি উত্তর দিলেন, 'ভাই! আপনি ভুল শুনেছেন। আমার আব্বাজানের বিবাহের সাক্ষী তো দিল্লিতে এখনও আছেন।' লোকটির গালির জবাব তিনি এভাবেই দিলেন।

কথায় কাজ হবে কীভাবে?

এভাবে নিজেকে মিটিয়ে দিয়ে আল্লাহ্র কোনো বান্দা যদি আল্লাহ্র জন্যই কথা বলেন, তাহলে মানুষ বুঝে নেয় যে, আমাদের কাছে লোকটির কোনো স্বার্থ নেই। সে যা বলছে, আল্লাহ্র জন্যই বলছে। আর তখনই কথা বললে কাজ হয়। যেমন হযরত ইসমাঈল শহীদ (রহ.)-এর একেকটি ওয়াজ মাহফিলে হাজার-হাজার মানুষ তাঁর হাতে তাওবা করতো। বর্তমানে তো আমরা দাওয়াতের কাজ ছেড়েই দিয়েছি। আর যারা এ কাজ করি, তারাও সহীহ তরীকার সঙ্গে জুড়ে থাকি না। ফলে ফায়দাও খুব একটা হয় না। এজন্যই উক্ত তিনটি কথা মনে রাখতে হবে। অর্থাৎ- কথা হক হতে হবে, নিয়ত হক হতে হবে, তরিকা হক হতে হবে।

ইজতিমাঈ তাবলীগ করার হক কার?

তাবলীগের দ্বিতীয় প্রকার ইজতিমাঈ তাবলীগ। যেমন মানুষকে জমায়েত করে ওয়াজ-নসীহত করা। এটা ফরযে আইন নয়; বরং ফরযে কিফায়াহ। সুতরাং কিছু মানুষ এ কাজটি করলে অবশিষ্টরাও দায়িত্বমুক্ত হয়ে যাবে। কিন্তু সকলেই এই ইজতিমাঈ তাবলীগ করার উপযুক্ত নয়। যার মনে চাইবে, সেই দাঁড়িয়ে ওয়াজ শুরু করে দিবে এমনটি নয়। বরং ওয়াজ করার জন্য প্রয়োজন পরিমাণ ইলম থাকতে হবে। ওই পরিমাণ ইল্ম না থাকলে সে ইজতিমাঈ তাবলীগের উপযুক্ত বলে বিবেচিত হবে না। কমপক্ষে ভুলের আশংকামুক্ত থাকা যায় এ পরিমাণের ইল্ম লাগবে।

মূলত ওয়াজ ও তাবলীগের মাসআলা অত্যন্ত স্পর্শকাতর। যখন একজন মানুষের ওয়াজ অনেক লোক শোনে, তখন তার দেল-দেমাগে অহঙ্কার চেপে বসে। এবার সে ওয়াজ ও বক্তব্যের মাধ্যমে নিজেই মানুষকে ধোঁকা দেয়া শুরু করে। ফলে মানুষ নির্দ্বিধায় তার ধোঁকায় পড়ে যায়। মানুষ তাকে বড় আলেম ও নেককার ভাবতে শুরু করে। তাতে সে নিজেও ধোঁকায় পড়ে যায়। সে ভাবে, এত মানুষ যেহেতু মনে করে যে, আমি একজন বড় আলেম ও নেককার, সুতরাং আমি কিছু একটা তো অবশ্যই। এত মানুষ তো একসঙ্গে পাগল হয়ে যায়নি।

এজন্যই সকলের ওয়াজ না করা উচিত। হ্যাঁ, যদি বড় কেউ ওয়াজ করার জন্য কোথাও বসিয়ে দেন, তখন বড়দের আওতাধীন থাকার বরকতে এবং আল্লাহ্র কাছে সাহায্য প্রার্থনার বরকতে আত্মগরিমার এ ব্যাধি থেকে নিজেকে রক্ষা করা সহজ হয়।

কুরআন ও হাদীসের দরস দেয়া

ওয়াজ-নসীহত তো সাধারণ ব্যাপার। বর্তমানে সাধারণ মানুষও কুরআন-হাদীসের দরস দেয়ার মত দুঃসাহস দেখাচ্ছে। মন চেয়েছে, তো কুরআনের দরস দেওয়া শুরু করেছে। অথচ এই কুরআন মজীদ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন-

مَنْ قَالَ فِى الْقُرْاٰنِ بِغَيْرِ عِلْمٍ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ -

অর্থাৎ- যে ব্যক্তি না জেনে কুরআনের তাফসীর সম্পর্কীয় কোনো কিছু বলল, সে যেন জাহান্নামকে নিজের ঠিকানা বানিয়ে নিল।

অপর হাদীসে তিনি বলেছেন–

مَنْ قَالَ فِىْ كِتَابِ اللهِ عَزَّوَجَلَّ بِرَأْيِه فَأَصَابَ فَقَدْأَخْطَأَ – (ابو دود كتاب العلم ، باب الكلام فى كتاب الله بغير علم)

'যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র কিতাবের মাঝে নিজের অভিমত ঢোকালো, তা সঠিক হলেও ভুল।'

এত কঠোর সতর্কবাণী রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, এরপরেও আমাদের অবস্থা হলো, দু-চার-দশটি বই পড়ে দরস ও তাফসীর শুরু করি। অথচ কুরআন ও হাদীসের দরসের বিষয়টি এতটাই গুরুত্বপূর্ণ যে, এ আমল করতে গেলে বড়-বড় আলেমদেরও হৃদয়স্পন্দন শুরু হয়। সেখানে সাধারণ মানুষ এগুলো নিয়ে মাতামাতি করার তো প্রশ্নই আসে না।

হযরত মুফতী সাহেব ও কুরআনের তাফসীর

আব্বাজান মুফতী শফী (রহ.) সত্তর-পঁচাত্তর বছর দ্বীনী ইল্‌মের শিক্ষকতায় কাটিয়েছেন। শেষ বয়সে এসে তিনি 'মাআরিফুল কুরআন' নামক একটি তাফসীর সংকলন করেছেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বারবার বলতেন, জানি না আমি এর উপযুক্ত কি-না! তাফসীর বিষয়ে কলম ধরার যোগ্যতা আসলেই আমার নেই। আমি শুধু হাকীমুল উম্মত হযরত আশরাফ আলী থানভী (রহ.)-এর তাফসীরকে সহজ ভাষায় ব্যক্ত করেছি।

ইমাম মুসলিম ও হাদীসের ব্যাখ্যা

সহীহ হাদীসসমূহের এক বিশাল সংকলনের নাম 'সহীহ মুসলিম'। সংকলন করেছেন ইমাম মুসলিম (রহ.)। যদিও তিনি সহীহ হাদীসগুলো সংকলন করেছেন; কিন্তু একটিরও ব্যাখ্য তিনি প্রদান করেননি। এমনকি অধ্যায়ের বিন্যাস ও সূচনা পর্যন্ত তিনি উক্ত গ্রন্থটিতে করেননি। যেমনটি করেছেন অন্যান্য মুহাদ্দিস। বরং তিনি শুধু হাদীসগুলো সংকলন করেছেন। তিনি বলেছেন, আমি শুধু সহীহ হাদীসগুলোকে গ্রন্থবদ্ধ করেছি। এবার এগুলো থেকে মাসআলা বের করা উলামায়ে কেরামের কাজ।

উক্ত ঘটনা থেকে অনুমান করুন যে, বিষয়টি কতটা স্পর্শকাতর। অথচ বর্তমানে যার মন চায় তিনি কুরআনের দরস শুরু করে দেন, হাদীসের দরস শুরু করে দেন। যার কারণে সমাজে আজ নানা জাতের ফেতনা ছড়াচ্ছে। ফেতনার বাজার এজন্যই তো দিন-দিন গরম হচ্ছে।

এজন্যই যারা কুরআনের তাফসীর ও হাদীসের দরসে অংশগ্রহণ করতে চান, তারা তা বুঝে-শুনেই করবেন। প্রথমেই দেখবেন যে, যিনি তাফসীর করেন বা দরস দেন, বাস্তবে তিনি এর যোগ্য কি-না? তার ইল্‌ম কি সত্যিই পর্যাপ্ত? অযোগ্য ব্যক্তি তাফসীর ও দরস দিতে পারবেন না এবং তার দরস-তাফসীরেও কেউ বসতে পারবে না।

আমলবিহীন ব্যক্তি কি ওয়াজ-নসীহত করতে পারবে না?

আমাদের মাঝে একটি কথা খুব প্রসিদ্ধ। তা হলো, যে ব্যক্তি নিজে ভুলে লিপ্ত, অপরের ভুল শোধরানোর অধিকার তা নেই। যেমন এক ব্যক্তি জামাতে নামায পড়ার পুরোপুরি পাবন্দি করে না, সুতরাং সে অন্যকে জামাতের গুরুত্বের বয়ান করবে না। মূলত এ কথাটি সঠিক নয়। বরং বাস্তবতা এর বিপরীত। অর্থাৎ– যিনি নামায জামাতের সঙ্গে পড়ার গুরুত্ব দেন না, তার উচিত এর প্রতি গুরুত্ব দিয়ে জামাতে শরীক হওয়া। এটা নয় যে, সে জামাতের গুরুত্ব সম্পর্কে ওয়াজ করতে পারবে না।

এ সম্পর্কে মানুষের মাঝে সাধারণত নিম্নের আয়াতটি প্রসিদ্ধ–

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لِمَ تَقُوْلُوْنَ مَا لاَ تَفْعَلُوْنَ –

অর্থাৎ– হে ঈমানদারগণ, তোমরা যা কর না তা বল কেন? –(সূরা সফ : ২)

অনেকেই এ আয়াতের মর্মার্থ বর্ণনা করেন এভাবে যে, যে ব্যক্তি যে কাজ করে না, ওই কাজ করার জন্য সে অন্যকে বলতে পারবে না। যেমন এক ব্যক্তি দান-খয়রাত করে না। তাই সে দান করার উপদেশ অন্যকে দিতে পারবে না। এক ব্যক্তি সত্য কথা বলে না, সুতরাং সে সত্য বলার উপদেশ অন্যকেও দিতে পারবে না। মূলত আয়াতের উক্ত মর্মার্থ সঠিক নয়। বরং আয়াতের সঠিক মর্মার্থ হলো, যে জিনিস তোমার কাছে নেই, তুমি তা আছে বলে দাবী করো না। যেমন তুমি মুত্তাকী না হলে বলো না যে, আমি মুত্তাকী। হজ্ব না করলে বলো না যে, আমি হাজী। অর্থাৎ– যা তোমার মাঝে নেই, তা আছে বলে দাবী কেন করো? আয়াতের মর্মার্থ এটা নয় যে, যা মানুষ করে না, তা বলতে যাবে না। বরং অনেক সময় অপরের উদ্দেশ্যে ওয়াজ করলে নিজেরও ফায়দা হয়। নিজে আমল করতে না পারলেও তখন শরম লাগে। আর এই লজ্জাবোধের কারণেই 'ইনশাআল্লাহ্' এক সময় আমল করতে বাধ্য হয়।

নিজেও আমল করবে

ইহুদীদেরকে সম্বোধন করে কুরআন মজীদের এক আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেছেন–

أَتَأْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ –

অর্থাৎ– "তোমরা কি অপরকে নেক কাজের শিক্ষা দিয়ে নিজেরা আমল করতে ভুলে যাও?" –(সূরা বাকারা : ৪৪)

সুতরাং অপরকে যে আমল করার নির্দেশ দেবেন, ওই আমল নিজেও করবেন। এটা নয় যে, নিজে যেহেতু আমল করেন না, তাই অন্যকেও উপদেশ দেবেন না। বুযুর্গানে দ্বীন তো মাঝে-মাঝে এভাবেও বলতেন যে–

من نکردم شما حذر بکنید

'আমি বাঁচতে পারিনি, কিন্তু তোমরা বেঁচে থাক।'

হযরত আশরাফ আলী থানভী (রহ.) বলতেন, 'মাঝে-মাঝে আমার ভেতর কোনো দোষ-ত্রুটি অনুভূত হলে আমি সেটি সম্পর্কে ওয়াজ করে দিই। তার ফলে আল্লাহ্ আমাকে 'ইসলাহ' করে দেন।' অবশ্য আমলকারীর ওয়াজ এবং যে আমল করে না তার ওয়াজের মাঝে বিস্তর তফাৎ রয়েছে। আমলকারীর ওয়াজের প্রভাব-প্রতিক্রিয়া বেশি হয়। তাঁর ওয়াজ অন্তরে লাগে। মানুষের জীবনে বিপ্লব আসার ক্ষেত্রে তাঁর ওয়াজের ভূমিকা অনেক।

মুস্তাহাব ছাড়লে কিছু বলো না

মোটকথা, ফরয-ওয়াজিবে ত্রুটি দেখলে কিংবা গুনাহর মাঝে লিপ্ত দেখলে তাকে ফরয ও ওয়াজিব পালন করতে বলা এবং গুনাহ ছেড়ে দেয়ার কথা বলা ফরযে আইন। ইতোপূর্বে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোকপাত করেছি। কিন্তু এ ছাড়াও শরীয়তের কিছু আহকাম রয়েছে, যেগুলো ফরয-ওয়াজিব নয়। বরং মুস্তাহাব। মুস্তাহাব অর্থ, করলে সাওয়াব আছে, না করলে গুনাহ নেই। অনুরূপভাবে 'আদব' স্তরের কিছু আমল আছে।

'মুস্তাহাব' কিংবা 'আদব' স্তরের আমল কেউ ছেড়ে দিলে তাকে আপনি একথা বলতে পারবেন না যে, কাজটি কেন করেননি? তবে হ্যাঁ, লোকটি যদি আপনার শাগরিদ, সন্তান বা মুরিদ হয়, তাহলে তাকে এরূপ বলা যাবে। এ ছাড়া অন্য কাউকে বলা যাবে না।

আযানের পর দু'আ পড়া

যেমন আযানের পর এ দু'আ পড়া মুস্তাহাব–

اَللّٰهُمَّ رَبَّ هٰذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ – اٰتِ مُحَمَّدَ الْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَّحْمُوْدًا الَّذِىْ وَعَدْتَّهُ ، اِنَّكَ لَاتُخْلِفُ الْمِيْعَادَ –

রাসূলুল্লাহ (সা.) দু'আটি পড়ার জন্য উম্মতকে উৎসাহ দিয়েছেন। অত্যন্ত বরকতময় দু'আ এটি। তাই নিজের সন্তান-সন্ততি ও ঘরওয়ালাদেরকে দু'আটি শেখানো উচিত। অনুরূপভাবে অন্যান্য মুসলমানকে দু'আটি পড়ার প্রতি উৎসাহ দেয়া উচিত। কিন্তু কেউ না পড়লে এ নিয়ে জবরদস্তি করা যাবে না।

আদব ছেড়ে দিলে তাকে কিছু বলা

আদব– যা মুস্তাহাব স্তরেরও নয়। বরং আরও নিচু স্তরের। যেমন– উলামায়ে কেরাম বলেছেন, খাওয়ার শেষে হাত ধোয়ার পর গামছা-তোয়ালিয়াতে হাত না মোছা উচিত। অনুরূপভাবে দস্তরখানের সামনে প্রথমে তুমি বসো, তারপর খাবার আনো। এগুলো খানার আদব। কুরআন-হাদীসে এসব আদবের আলোচনা নেই। তাই এগুলোকে মুস্তাহাবও বলা যায় না। সুতরাং এগুলো কেউ না করলে তাকে 'সুন্নাত কেন ছেড়েছ?' বলা যাবে না। অথচ এসব ব্যাপারে আমরা একটু বাড়াবাড়ি করে ফেলি। তাই খুব সতর্ক হওয়া উচিত।

আসন করে বসে খাওয়া জায়েয

আসন করে বসে খাওয়াও জায়েয। এতে কোনো গুনাহ নেই। কিন্তু দো'জানু হয়ে বসা বিনয়ের যতটা কাছাকাছি, আসন করে বসা বিনয়ের ততটা কাছাকাছি নয়। অনুরূপ এক হাঁটু উঠিয়ে বসাও বিনয়ের কাছাকাছি। তাই বলে আসন করে বসলে তাকে তিরস্কার করা যাবে না। বরং কেউ এ পদ্ধতিতে বসে বেশি আরাম পেলে এবং অন্য পদ্ধতিতে বসা তার জন্য কষ্টকর হলে তার জন্য উত্তম হলো এ পদ্ধতিতেই বসা।

চেয়ার-টেবিলে বসে খাওয়াও জায়েয

চেয়ার-টেবিলে বসে খাওয়াও জায়েয। তবে ফ্লোরে বা মাটিতে বসে খেলে তা হয় সুন্নাতের অধিক নিকটবর্তী। আর একটা আমল যত বেশি সুন্নাতের নিকটবর্তী হবে, তত বেশি বরকত ও সাওয়াব পাওয়া যাবে। তবে বিষয়টি যেহেতু জায়েয, সুতরাং খাওয়ার সময় এভাবে কেউ বসলে তাকে তিরস্কার করা যাবে না।

সমতলে বসে খাওয়া সুন্নাত

দুই কারণে রাসূলুল্লাহ (সা.) জমিনের উপর বসে পানাহার করতেন। প্রথমত, ওই জমানায় মানুষের জীবনাচার ছিলো সাদামাটা। চেয়ার-টেবিলের প্রচলন ছিলো না। তাই সাধারণত সমতলে বসেই সকলেই খেতেন। দ্বিতীয়ত, সমতলে বসে খাওয়ার মাঝে বিনয় বেশি প্রকাশ পায়। খাবারের মর্যাদাও অধিক হয়। প্রয়োজনে পরীক্ষা করে দেখুন, দেখবেন যে, চেয়ার-টেবিলে বসে খেলে এবং মাটিতে বসে খেলে অন্তরের অবস্থা এক থাকে না। দুয়ের মাঝে রয়েছে আসমান-জমিন ব্যবধান। জমিনে বসে খেলে তবিয়তে বিনয় বেশি থাকবে। অন্তরে এক প্রকার প্রশান্তি অনুভূত হবে। আল্লাহ্র দরবারে গোলামী অধিক প্রকাশ পাবে। পক্ষান্তরে চেয়ার-টেবিলে বসে খেলে এসব অবস্থা অনুভূত হবে না। এজন্য যথাসম্ভব চেষ্টা করতে হবে মাটিতে বসে খাওয়ার। কিন্তু কোথাও যদি এ পরিবেশ না থাকে, তাহলে চেয়ার-টেবিলে বসে খাওয়াতে কোনো অসুবিধা নেই। এ ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করা উচিত নয়। যেমন অনেকে চেয়ার-টেবিলে বসে খাওয়াকে হারাম মনে করেন। এ ধারণা সঠিক নয়।

শর্ত হলো সুন্নত নিয়ে উপহাস করা যাবে না

জমিনে বসে খাওয়া সুন্নাতের অধিক কাছাকাছি। এটা উত্তম ও অধিক সাওয়াবের কারণও। তবে এক্ষেত্রে লক্ষ্য রাখতে হবে যে, জমিনে বসে খেলে যেন সুন্নাত নিয়ে উপহাস করার মত পরিস্থিতি সৃষ্টি না হয়। সুতরাং কোনো জায়গায় এ ধরনের আশংকা থাকলে সেখানে এ নিয়ে বাড়াবাড়ি না করাই ভালো।

হোটেলের ফ্লোরে বসে খাওয়া

আব্বাজান শফী (রহ.) একদিন সবক চলাকালে আমাদেরকে একটি ঘটনা শুনিয়েছেন। তিনি বলেন, একদিন আমি এবং আমার কয়েকজন সঙ্গী দেওবন্দ থেকে দিল্লিতে গিয়েছিলাম। সেখানে খাওয়ার প্রয়োজন হলো। কোথাও যেহেতু

খাওয়ার ব্যবস্থা ছিলো না, তাই সকলেই আমরা হোটেলে ঢুকলাম। আর হোটেলে তো চেয়ার-টেবিলে বসেই খেতে হয়। কিন্তু আমার সঙ্গীদ্বয় এতে বেঁকে বসলেন। তারা বললেন, যেহেতু মাটিতে বসে খাওয়া সুন্নাত, তাই মাটিতে রুমাল বিছাবো এবং হোটেলবয়কে বলবো যে, এখানে খানা এনে দাও। আমি তাদেরকে নিষেধ করলাম। বললাম, এরূপ না করে বরং আমরা আজ চেয়ার-টেবিলেই খাবো। তারা বললেন, যেহেতু মাটিতে বসে খাওয়া সুন্নাতের অধিক নিকটবর্তী, সুতরাং এখানে লজ্জা কিসের! আর আমরা চেয়ার-টেবিলেই বা বসবো কেন? আমি বললাম, লজ্জা বা ভয়ের প্রশ্ন নয়। বরং মূলত ব্যাপার হলো, আপনারা সুন্নাতের উপর আমল করতে গিয়ে মাটিতে বসতে চাচ্ছেন। কিন্তু সমস্যা হলো, আপনাদের এ আমল মানুষ ভালো চোখে দেখবে না, বরং তারা হয়ত এ সুন্নাত আমলটি নিয়ে উপহাস করবে। আর সুন্নাত নিয়ে উপহাস করা শুধু কবীরা গুনাহই নয়, বরং অনেক সময় মানুষ এর দ্বারা কাফের হয়ে যাওয়ারও আশংকা থাকে। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে হেফাজত করুন। আমীন।

একটি শিক্ষণীয় ঘটনা

তারপর আব্বাজান আমাদেরকে বিখ্যাত মুহাদ্দিস সুলাইমান আ'মাশ (রহ.) এর একটি গল্প শোনালেন। তিনি হলেন ইমাম আবু হানীফা (রহ.) এর ওস্তাদ। হাদীসের সকল কিতাবে তাঁর বর্ণনা রয়েছে। আ'মাশ আরবী শব্দ। ক্ষীণ দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিকে আ'মাশ বলা হয়। যেহেতু তিনি আলোর তীব্র ঝলকানি সহ্য করতে পারতেন না, চোখের পাতা মেলতে পারতেন না, তাই তাঁকে আ'মাশ বলা হতো।

একবার তাঁর নিকট তাঁর এক শাগরিদ এলো। সে ছিলো পঙ্গু। ছাত্রটি ওস্তাদের খুব ভক্ত ছিলো। সর্বদা পেছনে-পেছনে লেগে থাকতো। ওস্তাদ যেখানে, ছাত্রও সেখানে। তিনি বাজারে গেলে ছাত্রও বাজারে যেতো। লোকজন এ দৃশ্য দেখে মজা পেতো। প্রসিদ্ধ হয়ে গেলো, উস্তাদের চোখ নেই, ছাত্রের পা নেই। ইমাম আ'মাশ এতে খুব বিব্রত হলেন। ছাত্রকে বললেন, তুমি আমার সঙ্গে বাজারে যাবে না। ছাত্র জিজ্ঞেস করলো, কেন? আপনি আমাকে সঙ্গে নেবেন না কেন? ইমাম আ'মাশ (রহ.) বললেন, কারণ, মানুষ এ নিয়ে হাসাহাসি করে। ছাত্র বললো– مَالَنَا نُوْجَرُوَيَأْثَمُوْنَ অর্থাৎ– হযরত! তারা মজা পায়, পেতে দিন। এতে আমরা তো সাওয়াব পাবো, যদিও তারা গুনাহগার হবে। হযরত আ'মাশ উত্তর দিলেন–

نَسْلَمُ وَيَسْلَمُوْنَ خَيْرًامِنْ اَنْ نُوْجَرَ وَيَأْثَمُوْنَ -

অর্থাৎ– আমরা আর তারা উভয় পক্ষই গুনাহ থেকে বেঁচে যাওয়া আমাদের সাওয়াবপ্রাপ্তি ও তাদের গুনাহগার হওয়া থেকে অনেক উত্তম। আমার সঙ্গে বাজারে যাওয়া তো কোনো ফরয-ওয়াজিব নয়। না গেলে আমাদের কারো ক্ষতিও নেই। তবে একটা লাভ আছে। তা হলো, মানুষ গুনাহ থেকে বেঁচে যাবে। সুতরাং তুমি আমার সঙ্গে যেয়ো না।

হযরত আলী (রা.)-এর ইরশাদ

হৃদয়ে গেঁথে রাখার মতো একটি কথা বলেছেন হযরত আলী (রা.)। তিনি বলতেন–

كَلِّمُوْا النَّاسَ بِمَا يَعْرِفُوْنَ، اَتُحِبُّوْنَ اَنْ يُّكَذَّبَ اللهُ وَرَسُوْلُهٗ –

অর্থাৎ– মানুষের সামনে দ্বীনের কথা এমনভাবে বলবে, যেন দ্রোহ সৃষ্টি না হয়। মানুষ আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল (সা.)-কে মিথ্যা প্রতিপন্ন করুক তোমরা কী তা চাও? যেমন দ্বীনের কথা বলার কারণে যদি কেউ তা মিথ্যা প্রতিপন্ন করে বসে, তাহলে এমন ক্ষেত্রে দ্বীনের কথা বলা অনুচিত।

মাওলানা ইলয়াস (রহ.)-এর ঘটনা

আজ কে না চেনে মাওলানা ইলয়াস (রহ.)-এর মতো মহান ব্যক্তিকে? আল্লাহ তাআলা দাওয়াত ও তাবলীগের জযবা আগুনের মত তাঁর হৃদয়ে ভরে দিয়েছিলেন। যেখানেই যেতেন, দ্বীনের কথা বলতেন। যেখানেই বসতেন, দ্বীনের আলোচনা শুরু করে দিতেন।

তাঁরই ঘটনা। এক ভদ্রলোক তাঁর কাছে আসা-যাওয়া করতেন। এভাবে বেশ কিছুদিন কেটে গেলো। ভদ্রলোকের মুখে দাড়ি ছিলো না। মাওলানা ইলয়াস (রহ.) বললেন, লোকটির সঙ্গে তো আমার একটা সম্পর্ক তৈরি হয়ে গেছে। সুতরাং দাড়ি রাখার কথা বলা যায়। তাই একদিন লোকটিকে বললেন, ভাই সাহেব! আমার মন চায় যে, আপনি যেন দাড়ির সুন্নাতটির উপর আমল করেন। একথা শুনে বেচারা ভদ্রলোক একেবারে লজ্জায় পড়ে গেলেন এবং এর পরের দিন থেকে আসা বন্ধ করে দিলেন। এভাবে বেশ কয়েকদিন চলে গেলো। লোকটিকে আর দেখা গেলো না।

মাওলানা ইলয়াস (রহ.) লোকজনকে ওই লোকের কথা জিজ্ঞেস করলেন। লোকেরা জানালো যে, ভদ্রলোক তো আর আসেন না। তখন মাওলানা ইলয়াস (রহ.) খুব আফসোস করলেন। বললেন, আমার বড় ভুল হয়ে গেছে। আমি কাচা তাওয়ার উপর রুটি গরম করতে গিয়েছি। অর্থাৎ– তাওয়া এখনও এতটুকু গরম হয়নি যে, রুটি রাখা যাবে। অথচ এর পূর্বেই আমি রুটি রেখে দিয়েছি। ফলে বেচারা আসা-যাওয়াই বন্ধ করে দিল। যদি তাঁর আসা-যাওয়া অব্যাহত থাকতো, তাহলে অন্তত দ্বীনের কিছু কথা তাঁর কানে পৌঁছতো। এতে কিছু হলেও ফায়দা হতো।

মাওলানা ইলয়াস (রহ.) এর স্থলে যদি আমাদের মতো কেউ হতো, তাহলে তো বলতো অসৎ কাজে বাধা প্রদান হাত দ্বারা করতে হয়, না হয় মুখ দ্বারা, না হয় অন্তর দ্বারা ঘৃণা করতে হয়। আর মুখ দ্বারা বলে আমি তো এ ফরযই আঞ্জাম দিয়েছি। মাওলানা ইলয়াস (রহ.) আমাদের মত ভাবলেন না। তিনি ভাবলেন, আমার হেকমতে ভুল হয়ে গেছে। দ্বীনের কথা কখন বলতে হয়, কোন আন্দাজে বলতে হয় এবং কতটুকু বলতে হয়– এসবই হেকমতের সঙ্গে সম্পৃক্ত।

দ্বীনের কথা তো কোনো পাথর নয় যে, তা উঠিয়ে মেরে দেয়া হবে। অথবা এমন কোনো বিষয়ও নয় যে, অবহেলা করা হবে। বরং দেখতে হবে, কথা বললে এর প্রতিক্রিয়া কী হতে পারে? যদি প্রতিক্রিয়া খারাপ হওয়ার আশংকা থাকে, তাহলে দ্বীনের কথা বলা থেকে আপাতত বিরত থাকতে হবে। ওই সময় কথা বলা যাবে না। কেননা, তখন এটা তার শক্তি ও সামর্থের বহির্ভূত বিষয়।

সারকথা, কখন কোমলভাবে বলতে হবে আর কখনইবা কঠোরভাবে বলতে হবে এসব বিষয় বুযুর্গদের সংস্পর্শ ছাড়া কিতাব পড়ে অর্জন করা যায় না। দাওয়াত-তাবলীগ কখন ফরয আর কখন ফরয নয় এবং কখন দ্বীনের কথা বলা যাবে আর কোন সময় যাবে না– এসবের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে।

'আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে সঠিক বুঝ দান করুন। এ দ্বারা আমাদের সকল মুসলমান ভাই-বোনকে ইসলাহ করে দিন। আমীন।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ -

"“ধন–সম্পদের নাম ‘সুখ’ নয়। ‘সুখ’ অন্তরের একটা অবস্থা। এটা একান্তই আল্লাহর দান। ভবন তৈরি করুন, বাংলো বানান, চাকর–বাকর দিয়ে ভরে রাখুন, সবচে’ উন্নত মডেলের গাড়ির আয়োজনও করুন। এরপর শয়নকক্ষে যান, দেখবেন, রাতে ঘুম আসছে না। বিছানা কত শানদার, উন্নত তুলার গদি–বালিশ; অথচ চোখে ঘুম নেই। এ পাশ–ওপাশ করতে–করতে রাতটা শেষ। ঘুমের বড়িও আর কাজে আসে না।

ভাবুন তো! কিসের অভাব? এয়ারকন্ডিশন থেকে শুরু করে সবই আছে। অভাব শুধু সুখের, শান্তির! সম্পদের ভেতর ডুবে আছে, অথচ এক অব্যক্ত বেদনায় মাথা কুটে মরছে। কে পারবে সুখ দিতে? এ অস্থিরতা দূর করতে? বলুন, কে পারবে? আল্লাহ ছাড়া কেউ নেই, তিনিই পারেন সুখ দিতে, অস্থিরতা দূর করতে।”

اَلْحَمْدُ لِلّٰه نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْه، وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّاٰتِ اَعْمَالِنَا، مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلاَ هَادِىَ لَهُ، وَاَشْهَدُ اَنْ لاَّ إِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، وَاَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَسَنَدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلاَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ .... صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَأَصْحَابِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا — اَمَّا بَعْدُ :

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالْ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اُنْظُرُوْا اِلٰى مَنْ هُوَاَسْفَلَ مِنْكُمْ وَلاَ تَنْظُرُوْا اِلٰى مَنْ هُوَ فَوْقَكُمْ ، فَهُوَاَجْدَرُاَنْ لاَتَزْدَرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُم —

(صحيح مسلم ، كتا ب الزهد ، باب نمبر ١)

হাম্‌দ ও সালাতের পর!

সাহাবী হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন, পার্থিব ধন-সম্পদে যারা তোমাদের চেয়ে নিচে, তাদের প্রতি তাকাও। যারা তোমাদের উপরে, তাদের প্রতি তাকিয়ো না। তাহলে তোমাদের অন্তরে আল্লাহর মহত্ব ও গুরুত্ব হ্রাস পাবে না।'

কারণ, তোমরা যদি তোমাদের চেয়ে ধনীদের প্রতি তাকাও, সেদিকেই যদি সর্বদা তোমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকে, তাহলে আল্লাহ তা'আলার নেয়ামতের গুরুত্ব বুঝতে পারবে না। বরং তখন তোমাদের মধ্যে অনীহা সৃষ্টি হবে। আর সৃষ্টি হবে চরম হতাশা। দুর্ভাবনা তাড়া করে ফিরবে অনবরত। জীবন হয়ে পড়বে ক্লান্ত ও বিচলিত।

অন্তর হবে পার্থিব নেশামুক্ত

হাদীসটিতে রাসূল (সা.) অন্তরকে দুনিয়ার মোহ থেকে মুক্ত করতে আহ্বান করেছেন। পরন্তু তিনি সুখময় জীবনের সন্ধানও দিয়েছেন। অর্থাৎ– দুনিয়াবী ধন-সম্পদ তো মানুষের কাছে থাকবেই। থাকবে না শুধু দুনিয়ার নেশা ও অন্ধ ভালোবাসা। কারণ, এ জগতে চলতে গেলে সম্পদের প্রয়োজন হবে অবশ্যই। খাদ্যসামগ্রী, ঘরবাড়ি, বস্ত্র-পরিধেয় একজন মানুষের সব সময় জরুরি। সুতরাং এগুলোর প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করার অবকাশ কোথায়? আমরা তো এও বলি, এ ধন-সম্পদকে, এই ক্ষণস্থায়ী বস্তুসামগ্রীকে জীবনের লক্ষ্য বানানো বোকামি। কেবল এরই অন্বেষায় জীবন উৎসর্গ করে দেয়া পাগলামি। শুধু অর্থের নেশায় কেটে যায় সকাল ও সন্ধ্যা! ইসলাম এ অন্ধ ভালোবাসাকে সমর্থন করে না।

অল্পেতুষ্টি। এ গুণ অর্জনে মানুষ পায় সম্পদের মোহ থেকে মুক্তি। কেউ যখন এই গুণে, এই চরিত্রে উৎকর্ষ লাভ করে, দুনিয়া লুটোপুটি খায় তার পদতলে। তবুও সে দুনিয়ার প্রতি আকর্ষণ বোধ করে না, সম্পদের প্রতি তার মহব্বত থাকে না। অথচ এ মানুষই যখন সম্পদের নেশায় অন্ধ হয়ে যায়, তার তনুমন তখন সারাক্ষণ অস্থির থাকে, কি পেলাম আর কি পেলাম না। হৃদয় তার ভারী হয়ে ওঠে, এটা পায়নি, ওটা পায়নি। সে শুধু ভাবে, কাল যা লাভ করেছি, আজ তার দ্বিগুণ কামাতে হবে। অস্থি-মজ্জায় তখন দুনিয়া, চিন্তা-ভাবনায় তখন খাই-খাই। পরিণতিতে হয়ে যায় সে মহালোভী।

তুষ্টি অর্জনের উপায়

হাদীসে কুদসীতে আছে, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, যদি কোনো বনী আদমকে সোনার একটি উপত্যকা দান করা হয়, তাহলে সে আরেকটি আশা করবে। দ্বিতীয়টিও যদি পেয়ে যায়, তাহলে কামনা করে আরেকটি উপত্যকার।

তারপর বলেছেন :

لاَيَمْلأُ جَوْفَ ابْنَ أدَمَ اِلاَّ التُّرَابُ – (صحيح البخارى ، كتاب الرقاق ، باب مايتقى من فتنة المال)

'মাটি ছাড়া অন্যকিছু বনী আদমের পেট ভরতে পারবে না'।

যখন সে লাশ হয়ে যাবে, মাটির তলে দাফন করা হবে, তখনই তার ক্ষুধা মিটবে, ধন-সম্পদ অর্জনে তার চেষ্টা-তদবীর তখনই মুখ থুবড়ে পড়বে। সম্পদের পাহাড় রেখে খালি হাতে চলে যাবে পরপারে। অথচ তুষ্টিগুণ থাকলে মানুষের এ সীমাহীন ক্ষুধা সহজেই মিটে যেতে পারে।

আলোচ্য হাদীসটিতে রাসূল (সা.) একথাই বলেছেন। তুমি যদি উভয় জাহানে কামিয়াবী চাও, তাহলে এ দুটি গুণ অর্জনে সচেষ্ট হও। আর যদি কামিয়াবীর আশা না করো– সেটা তোমার ব্যাপার। তবে সারাটি জীবন তখন কাটবে অশান্তিতে, অস্থিরচিত্তে। রাসূল (সা.) এর ব্যবস্থাপত্র হলো, তুমি তোমার অপেক্ষা দুর্বলের প্রতি তাকাও! উপরের দিকে চোখ তুলো না! উপরওয়ালাদের দিকে তাকালেই তোমার হৃদয়চিরে বেরিয়ে আসবে–আহা! সে হিরো আর আমি জিরো! তাই তুমি বরং তাকাবে দুর্বলের দিকে।

দেখো, আল্লাহ তা'আলা তাকে কী দিয়েছেন আর তোমাকে কী দান করেছেন। তখন দেখবে, কৃতজ্ঞতায় তোমার হৃদয় ভরে ওঠবে। মনে হবে, সুখ ও শান্তির বিশাল সমাহার তোমাকে দেয়া হয়েছে– তাকে দেয়া হয়নি। পক্ষান্তরে উপরওয়ালাদের প্রতি তাকালে তোমার মাঝে লোভ জাগবে। প্রতিযোগিতার মনোভাব চলে আসবে, কাঙ্ক্ষিত সোনার হরিণ ধরার জন্য সৃষ্টি হবে হিংসার তুফান। 'সে আমার থেকেও বেড়ে গেলো!' এ ভাবনা থেকে সৃষ্টি হবে– বিদ্বেষ, জ্বলে উঠবে বিদ্বেষ থেকে শত্রুতার লেলিহান শিখা, ভেঙে পড়বে সামাজিক বন্ধন। বান্দা ও মাওলার হক্ব চোখের সামনে পদদলিত হবে। পক্ষান্তরে আল্পেতুষ্টি এনে দেয় হৃদয়জুড়ে কৃতজ্ঞতার শীতল হাওয়া। আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্টি ও কৃতজ্ঞতায় ভরে যায় এ জীবন।

পার্থিব কামনা কখনও শেষ হয় না

দুনিয়া নেহায়েত বিস্তৃত। পৃথিবীতে আজও এমন মানুষ জন্ম লাভ করেনি, যে বলেছে, আমার সব আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণ হয়েছে। কারুনের ভাণ্ডার হাতে এলেও কামনা শেষ হবে না। মানুষের স্বপ্ন একটি আরেকটির সাথে গ্রন্থিত। একটি শেষ তো অন্যটি হাজির। আরবী ভাষার পণ্ডিত কবি মুতানাব্বীর ভাষায় :

وَمَا قَضٰى اَحَدٌ مِنْهَا لُبَانَتَهُ

وَمَا انْتَهٰى اَرَبٌ اِلاَّ اِلٰى اَرَبِ

'এ জগতে আজও এমন মানুষ যায়নি, যে তার সকল সাধ ও স্বপ্ন পূরণ করেছে। এখানে একটি আশা মিটে যেতেই আরেকটি এসে হাজির হয়।'

স্বপ্নের শেষ নেই

একজন বেকার মানুষ। তারও স্বপ্ন আছে, আশা আছে, চাহিদা আছে। সে রোজগার চায়, কাজ চায়। এক সময় একটা কাজ ভাগ্যে জুটেও গেলো। তখন

যোগ হয় নতুন ভাবনা– অন্যদের বেতন তো আমার চেয়েও বেশি, আমাকেও পৌঁছুতে হবে সে পর্যন্ত। সে পর্যন্ত পৌঁছার পর সাধ জাগে, তারও উপরের জনকে ধরার। তখন তার সমপরিমাণ সম্পদ উপার্জনের নেশা পেয়ে বসে। এভাবে পুরো জীবনটাই কেটে যায় সম্পদের পেছনে ছোটাছুটিতে। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলার সুযোগ হয় না আর। আজ সকলকেই দেখা যায় স্বপ্নে বিভোর। অথচ জগতে কারো স্বপ্ন শেষ হয়নি। হ্যাঁ, কামনা ও স্বপ্নের আখেরী মঞ্জিলে পৌঁছুতে পেরেছে তাঁরা, যাঁরা এ দুনিয়ার হাকীকত বুঝতে পেরেছেন। অর্থাৎ– মহান নবীগণ এবং তাঁদের উত্তরসূরীগণ। তাঁরা বুঝেছেন এ দুনিয়ার যত আয়োজন সব ক্ষণস্থায়ী। এখানে প্রয়োজনের অধিক উপার্জন নিষ্প্রয়োজন। এখানে লাগামহীন ভোগ-বিলাসের ভাবনা উচিত নয়। আল্লাহ তা'আলা দয়া করে যা দান করেন, তা নেয়ামত। এছাড়া সম্পদের পেছনে দৌড়াতে নেই। মূলত তাঁরা নিচের দিকে তাকিয়েছেন– উপরের দিকে নয়।

দ্বীনের বিষয়ে তাকাবে উপরের দিকে

হাদীস শরীফে এসেছে, জাগতিক বিষয়ে যারা তোমার চেয়ে নীচু তাদের দিকে তাকাও। দেখো, অমুকের ভাগ্যে এ নেয়ামত জোটেনি আর তুমি পেয়েছো। এর উপর আল্লাহর শোকর আদায় করো। তোমার উপরওয়ালার প্রতি দৃষ্টি দেবে না কখনও। পক্ষান্তরে দ্বীনের ব্যাপারে তোমার চেয়ে উপরওয়ালার প্রতি তাকাও। দেখো আর ভাবো, অমুক তো দ্বীনের কত কাজ করেছে আর আমি তো গোল্লায় গিয়েছি। এমন করে ভাবতে শিখলে দ্বীনের কাজের প্রতি তোমার উৎসাহ জাগবে।

সারকথা, দ্বীনের বেলায় দৃষ্টি রাখবে উপরের জনের প্রতি আর দুনিয়ার বেলায় দৃষ্টি রাখবে নিচের জনের প্রতি। এটাই রাসূল (সা.)-এর মহান শিক্ষা।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারকের কাহিনী

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক (রহ.) ইতিহাসের এক বিরল ব্যক্তিত্ব। তাঁর যুগে তিনি ছিলেন শ্রেষ্ঠ ফিকাহবিদ, হাদীস বিশারদ, বুযুর্গ ও সাধক। হযরত ইমাম আ'যম আবু হানীফা (রহ.) তাঁর সমকালীন মনীষী এবং তাঁর শিষ্য। প্রাথমিক জীবনে খুব ধনী ছিলেন। স্বাধীনচেতা ছিলেন। অনেক জমি-জমাও ছিল। বাগ-বাগিচা ছিল। ধর্মশাস্ত্র ও দ্বীনদারির সাথে কোনো সম্পর্ক ও আন্তরিকতা ছিল না। তাঁর জীবন ছিলো খাও-দাও ফুর্তি কর। তাঁর একটি আপেল বাগান ছিল।

একবারের ঘটনা। ফল কাটার সময় যখন হলো। তিনি বাগানে বিনোদনঘর বানালেন, বন্ধু-বান্ধবসহ সেখানেই থাকতে শুরু করলেন। উদ্দেশ্য, তাজা-তাজা ফল খাওয়া যাবে, আনন্দ-উল্লাস করে হৈ-হুল্লোড় করা যাবে। আসর যথারীতি জমে ওঠল। খাবার পাকানো হচ্ছে, ফল পাড়া হচ্ছে, খাওয়া-দাওয়া চলছে, শরাব চলছে, কাবাব চলছে, আরো কত কী! একবার ভোগপর্বের পর গানবাজনার আয়োজন হল।

আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক নিজেও ভালো সেতারা বাজাতে জানতেন। ভোজপর্ব শেষে আসর বসলো। বাগিচার মৌ-মৌ সৌরভে গানের আসর। বন্ধুদের গল্প, আড্ডা, শরাবের গাঢ় মাদকতা, হাতে সেতারা। তিনি সুর তুললেন সেই সেতারায়। আসরের নেশা ধীরে ধীরে বিলুপ্ত করে দিলো তাঁর চৈতন্য, গভীর ঘুমে তলিয়ে গেলেন তিনি। যখন চোখ মেললেন, দেখলেন হাতে সেতারা। আবার বাজাতে শুরু করলেন। কিন্তু একি! সেতারা যে বাজছে না! তার সুর যে বোবা হয়ে গেছে। তারগুলো পরীক্ষা করলেন, নেড়ে-চেড়ে আবার শুরু করলেন। কিন্তু সেতারা বোবা হয়ে গেছে। তৃতীয়বার যখন ঠিকঠাক করে বাজাবার চেষ্টা করলেন, তখনই ঘটলো অবাক কাণ্ড! আশ্চর্য! বাদ্যের সুর তো নয়... সেতারা থেকে ধ্বনিত হচ্ছে কুরআনের বাণী। তিনি কুরআন মজীদের একটি আয়াত স্পষ্ট শুনতে পেলেন সেতারার তারে। আয়াতটি ছিলো :

أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِيْنَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللّٰهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ –

'যারা মুমিন, তাদের জন্য আল্লাহর স্মরণে এবং যে সত্য অবতীর্ণ হয়েছে, তার কারণে হৃদয় বিগলিত হওয়ার সময় আসেনি?' –(সূরা হাদীদ : ১৬)

আল্লাহ তাআলা নিজের দিকে যাকে টেনে নিতে চান, তার জন্য এভাবেই তৈরি করে দেন অদৃশ্য উপকরণ। সেতারার তারে এ আওয়াজ কর্ণকুহরে বেজেছে। সঙ্গে সঙ্গে তার হৃদয়রাজ্য বদলে গেছে। সাথে সাথে সরব হয়ে উঠলেন আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক। তিনি বলে উঠলেন–

بَلٰى يَارَبِّ قَدْ أٰنَ

'প্রভু হে! নিশ্চয় সময় এসেছে।'

সাথে সাথে ছেড়ে দিলেন গান-বাদ্য, শরাব-কাবাব, তাওবা করলেন– অন্তরে জেগে উঠলো ইল্‌মের পিপাসা, অর্জন করলেন ইমাম আবু হানীফা (রহ.)-

এর ছাত্র হওয়ার যোগ্যতা। তিনি এখন হাদীস জগতের সর্বস্বীকৃত সেতারা। ফিক্‌হ ও তাসাউফ জগতেরও একজন গ্রহণযোগ্য মনীষী।

আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারকের সমুজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারকের একটি ঘটনা। তিনি বাদশাহ হারুনুর রশীদের রাজমহলে বসা, পাশেই উপবিষ্ট রানী। সন্ধ্যাবেলা। হঠাৎ হৈ-হুল্লোড় শুনতে পেলেন বাদশাহ। চকিত হলেন। ভয় পেলেন। শহরে কোনো দুশমন হামলা করেনি তো! লোক পাঠালেন। খোঁজখবর নিলেন। কিছুক্ষণ পর জানতে পারলেন, আজ এখানে আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক আমন্ত্রিত ছিলেন। অভ্যর্থনার জন্য লোকজন শহরের বাইরে অপেক্ষা করছিলো। তিনি এখানে পৌছুতেই তাঁর একটি হাঁচি এলো, তাই 'আলহামদুলিল্লাহ' বললেন। তার উত্তরে 'ইয়ারহামুকাল্লাহ' বললো উপস্থিত লোকজন। আপনি যে শোরগোল শুনেছেন, এটা শুধু সে দু'আর প্রতিধ্বনি।

এতক্ষণ রানী ঘটনাটি শুনছিলেন। এরপর হারুনুর রশীদকে সম্বোধন করে বললেন, আপনার ধারণা, অর্ধ পৃথিবীব্যাপী চলছে আপনার শাসনক্ষমতা। আপনি একজন মহান বাদশাহ। কিন্তু বাস্তব কথা হলো, রাজত্ব এসব মনীষীর জন্যই বেশি মানায়। এঁরাই আসল রাজা। আপনারা শাসন করেন মানুষের দেশ আর তাঁরা শাসন করে মানুষের হৃদয়। কত বিশাল গণজমায়েত। অথচ কোনো পুলিশ তাদেরকে এখানে নিয়ে আসেনি। তাদের একত্রিত করেছে আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারকের গভীর ভালোবাসা। এ কৃতিত্ব আল্লাহর দান। এ দানের আলোতে উদ্ভাসিত ছিলো আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক (রহ.)-এর জীবন। তিনি সত্যিই মহান।

আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারকের প্রশান্তি

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক (রহ.) বলেন, একটা সময় ছিলো, তখন আমার ওঠাবসা ছিলো ধনবানদের সাথে। খানা-পিনা ছিলো তাদের সাথে। চলাফেরা করতাম তাদের সঙ্গে। অথচ তখন আমি ছিলাম দুঃখী। মনে হতো, আমার পেরেশানিই সবচে' বড় পেরেশানি। কারণ, তখন যে বন্ধুর বাড়িতে যেতাম, তার বাড়ি আমার বাড়ির চেয়েও সুন্দর পেতাম। নিজের সওয়ারি দেখে উৎফুল্ল হতাম। ভাবতাম, আমার সওয়ারিটি উত্তম। কিন্তু যখন অন্য বন্ধুর সঙ্গে মিলিত হতাম, দেখতাম, তার সওয়ারি তো আরো উত্তম। মার্কেট থেকে দামী পোশাক কিনতাম। ভাবতাম, খুব শানদার পোশাক। কিন্তু যখন বন্ধু-বান্ধবের

পোশাক দেখতাম, মনে হতো, তাদেরটা তো আরো ভালো। মোটকথা, যেখানেই যেতাম, মনে হতো, অন্যের সহায়-সম্বল, পোশাক-আশাক, বিষয়-আশয় আরো মূল্যবান। এ দেখে আমি দুঃখ ও হতাশায় মুহ্যমান হয়ে পড়তাম।

তারপর জীবনের গতি পাল্টালাম। বিত্তহীন মানুষদের সাথে চলাফেলা শুরু করলাম। এতে আমি সুখের ছোঁয়া অনুভব করতে লাগলাম। কারণ, আমার এখনকার বন্ধুরা সাধারণ। কিন্তু আমার মনে হতো অসাধারণ। তাদের অবস্থা দেখি আর আমার অবস্থার প্রতিও তাকাই। দেখি, আমার বাড়ি ভালো, আমার সওয়ারি উত্তম। আমার পোশাক বেশ সুন্দর। আর তাদের বাড়ি আমারটা থেকে মন্দ, সওয়ারি আমারটা থেকে নিম্নতর। পোশাক আমার পোশাক থেকেও অসুন্দর। হৃদয় থেকে তখন বেরিয়ে আসে আল্লাহ তা'আলার অশেষ শোকর। মূলত এটাই তো 'কানা'আত' বা অল্পেতুষ্টি। যদি কেউ এটা অর্জনে ব্যর্থ হয়, তাহলে সে সুখের নাগাল পাবে না। সমস্ত সম্পদ বিলিয়ে দিলেও না।

সুখ আল্লাহর দান

ধন-সম্পদ 'সুখ' নয়। 'সুখ' অন্তরের একটা অবস্থা। এটা একান্তই আল্লাহর দেওয়া। ভবন তৈরি করুন, বৈঠকখানা বানান, চাকর-বাকর দিয়ে ভরে রাখুন। বাড়ির সামনে কত গাড়ি। এরপর যান শয়নকক্ষে। দেখবেন, রাতে ঘুম আসে না। বিছানা কত শানদার, কত শাহী মশারি। উন্নত ফোম, উন্নত তুলার গদি, বালিশ। অথচ চোখে ঘুম নেই। এপাশ-ওপাশ করতে করতে রাতও শেষ। ঘুমের বড়িও আর কাজ করছে না।

একটু ভাবুন! কিসের অভাব? এয়ারকন্ডিশন থেকে শুরু করে সবই আছে। নেই শুধু শান্তি। সম্পদের ভেতর ডুবে আছে; কিন্তু অব্যক্ত এক বেদনায় মাথা কুটে মরছে। কে পারবেন স্বস্তি দিতে? আল্লাহই পারেন এই অস্থিরতা দূর করতে।

অন্যদিকে একজন সাধারণ দিনমজুর। তার ডাবল বেড নেই, নরম বিছানা নেই। অথচ যখন রাতের বেলায় ঘুমায়, সকাল পর্যন্ত টানা আটঘণ্টা ঘুমায়। এবার আপনিই বলুন, এ দুইজনের মধ্যে কে সুখী? দুর্বল দিনমজুর না ওই ধনকুবের? জেনে রাখুন, সুখ আল্লাহ তা'আলার দান। উপকরণ সুখ দিতে পারে না। সুখ আর সুখের উপকরণ কখনও এক হতে পারে না।

একটি শিক্ষণীয় ঘটনা

মনে পড়ে, আমি যখন আমার ঘরে এয়ারকন্ডিশন লাগানোর সিদ্ধান্ত নিলাম, তখন ওটা করতে অনেক টাকা খরচ হলো। কষ্ট করে ওটা যখন কিনলাম, দেখি

বিদ্যুতের বর্তমান ওয়ারিং ওভারলোড সামাল দিতে অক্ষম। এখন এয়ারকন্ডিশন চালাতে হলে নতুন ওয়ারিং এর প্রয়োজন। এরজন্য প্রচুর অর্থ লাগে। তাও করলাম। এবার দেখা গেল নতুন বিপত্তি। ভোল্টেজ কম, এয়ারকন্ডিশন চলবে না। স্টাবিলাইজার লাগবে। তাও কিনলাম। জানা গেল, তবুও চলছে না। এর জন্যে অমুক নাম্বারের স্টাবিলাইজার কিনতে হবে। এভাবে পাকা ছয়মাস চলে গেল। তখন কবি মুতানাব্বীর এই কবিতাটি বারবার মনে পড়ছিলো।

وَمَا انْتَهٰى اَرَبٌ اِلاَّ اِلٰى اَرَبٍ

'এক আশা শেষ না হতে উঁকি দিয়ে উঠে নতুন আশা।'

অর্থাৎ– পৃথিবীর বুকে শেষ প্রয়োজন বা আখেরী কামনা বলতে কোনো কিছু নেই। বরং এক প্রয়োজন বিদায় তো আরেক প্রয়োজন হাজির। দেখা গেল, টাকা-পয়সা শেষ হলো, দৌড়ঝাঁপও খুব হলো। কিন্তু সুখের খাতায় মিললো জিরো। কারণ, এটা তো আল্লাহর অনুগ্রহ, কেবল তাঁরই দান। সুখ টাকা-পয়সা দিয়ে কেনা যায় না।

মনে রাখতে হবে, যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষের হৃদয়ে অল্পেতুষ্টির মানসিকতা না আসবে এবং আল্লাহর শোকর আদায় করতে অভ্যস্ত না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত সুখ-শান্তির ঠিকানা খুঁজে পাবে না। চাই সে সুখের সন্ধানে যত অর্থই বিলাতে থাকুক না কেন। এর জন্য তার প্রোগ্রাম যত বর্ণাঢ্যই হোক না কেন। সুখ লাভের তরীকা তো সেটা-ই, যেটা রাসূল (সা.) বলেছেন। তিনি বলেছেন : সর্বদা দুর্বলদের প্রতি তাকাও। নিজের চাইতে ধনবান যারা, তাদের প্রতি দৃষ্টি দিও না। এরপর আল্লাহর শোকর আদায় করো।

যদি ধনীদের প্রতি তাকাও

অপেক্ষাকৃত অসহায়-গরীবদের প্রতি দৃষ্টি দেবে। তাহলে ধীরে-ধীরে অল্পেতুষ্টির চরিত্র সৃষ্টি হবে। যদি দৃষ্টি থাকে বিত্তবানদের প্রতি, তাহলে অব্যাহতভাবে বাড়তে থাকবে দুঃখ-বেদনা ও দুর্গতি। তখন হৃদয়ে সৃষ্টি হবে মোহ। অন্যকে দেখবে অধিক সমৃদ্ধ। জন্ম নেবে হিংসা ও বিদ্বেষ। কারণ, লোভের অনিবার্য ফল হিংসা। সব সময়ের ভাবনা হবে; সে আমার চেয়ে বড় হয়ে গেলো, আমি পেছনে রয়ে গেলাম। হিংসা থেকে জন্ম নেবে বিদ্বেষ, শত্রুতা ও বিচ্ছিন্নতার বিষবাষ্প। এ সময়ের সমাজকে দেখুন, কিভাবে এসব ব্যাধি গ্রাস করছে আমাদের সমাজের তনুমন। তাছাড়া সম্পদ উপার্জনের প্রতিযোগিতা দ্বারা হালাল-হারামের ভেদাভেদ চলে যায়। আমাকে পেতেই হবে– এ মানসিকতা সবকিছুকে পুড়িয়ে ছাই করে দেয়। বৈধ-অবৈধ একাকার হয়ে যায়। ঘুষ-ধোঁকা

তখন সাধারণ বিষয় হয়ে পড়ে। সত্য-মিথ্যা হাত ধরাধরি করে চলে। সব রকমের মন্দ পন্থাই তখন তার জন্য স্বাভাবিক হয়ে যায়। কারণ, কাঙ্ক্ষিত টার্গেটে তাকে পৌছতেই হবে। এসবই স্বল্পেতুষ্টি না থাকার অনিবার্য ফসল।

লোভ ও হিংসার চিকিৎসা

এ কথাটি অন্য হাদীসে এভাবে এসেছে :

اِذَانَظَرَ اَحَدُكُمْ اِلٰى مَنْ فُضِّلَ عَلَيْهِ فِى الْمَالِ وَالْخَلْقِ فَلْيَنْظُرْ اِلٰى مَنْ هُوَ اَسْفَلُ مِنْهُ مِمَّنْ فُضِّلَ عَلَيْهِ - (مسلم ، كتاب الزهد ، باب نمبر ١)

'সৌন্দর্য ও প্রাচুর্যে তোমার চেয়েও শ্রেষ্ঠ এমন ব্যক্তির প্রতি যদি তোমাদের কারও নজর পড়ে, তাহলে সে যেন তার চেয়ে অসহায় (কম সুন্দর, কম ধনী) ব্যক্তির প্রতি তাকায়।'

পূর্বের হাদীসে নিজের চাইতে অধিক ধনবানের প্রতি নজর দেয়া-ই নিষেধ ছিল। অর্থাৎ– নজর দিতে হলে চিন্তা-ফিকির করে দিতে হবে। কিন্তু এ জাগতিক জীবনে এভাবে চলা নিতান্তই কঠিন। যেহেতু সমাজে বসবাস করতে হলে ধনীদের সাথেও চলতে হয়, ওঠা-বসা করতে হয়, তাই এই হাদীসে বলা হয়েছে, এমন লোকের প্রতি যদি দৃষ্টি পড়ে যে শক্তি, সৌন্দর্য, সুস্থতা ও প্রাচুর্যের দিক থেকে তোমার থেকে উন্নত, তাহলে সঙ্গে সঙ্গে দৃষ্টিকে শাসন করো। দৃষ্টি ঘুরিয়ে দাও কুশ্রী, দুর্বল, রুগ্ন ও অসহায়ের প্রতি এবং এই অসহায় লোকটির কথা ভাবো। তাহলে মনে স্বস্তি পাবে, আরাম পাবে। ধনীদের প্রতি তাকানো মানে বিদ্বেষ ও হিংসা মনের মাঝে প্রবেশ করানো, আর গরীবের প্রতি নিবেদিত দৃষ্টি মনকে করে তুলবে স্বচ্ছ, পবিত্র।

সে ব্যক্তি ধ্বংস হয়ে গেছে

অন্য হাদীসে এসেছে :

تَعِسَ عَبْدُ الدِّيْنَارِ وَالدِّرْهَمِ وَالْقَطِيْفَةِ الْخَمِيْصَةِ، اِنْ اُعْطِىَ رَضِىَ وَإِنْ لَمْ يُعْطَ لَمْ يَرْضَ -

'ধ্বংস হয়ে গেছে দীনার-দিরহামের গোলাম। উন্নত কাপড় ও উত্তম চাদরের গোলাম, যে কিছু প্রাপ্ত হলে খুশি, না পেলে অখুশি।'

অর্থাৎ– তারা ধ্বংস হয়ে গেছে, যারা অর্থ ও সম্পদের গোলাম। 'দিনার' ও 'দিরহাম' অর্থ সোনা-রুপার মুদ্রাবিশেষ।

গোলাম অর্থ যে দিন-রাত সম্পদের পেছনে ছুটে বেড়ায়। চিন্তা-চেতনায় তার সব সময় একটাই ভাবনা, কীভাবে আমি এতসব অর্থের অধিকারী হব, কীভাবে মনজুড়ানো বস্ত্রের মালিক হব। এই ভাবনায় অবশেষে আল্লাহকেও ভুলে যায়। আল্লাহর বিধি-বিধানকে ভুলে যায়। রাসূল (সা.)-এর ভাষায়– এরা ধ্বংস হয়ে গেছে। এদের স্বভাব হলো, কিছু দিলে খুশিতে মাতোয়ারা হয়, না দিলে বেদনায় দিশেহারা হয়। আর যারা তুষ্টিপ্রিয়, তারা সব সময় আল্লাহর উপর সন্তুষ্ট। তাদের অবস্থা হলো, সর্বদা হালালের চৌহদ্দি থেকে জীবিকা উপার্জনের সাধনা করে। এরপর কিছু ভাগ্যে জুটলে আল্লাহর শোকর আদায় করে। না মিললে অভিযোগ নেই, ভাবনা নেই যে, কী পেলাম আর কী পেলাম না। কিংবা অমুক পেলো আর আমি পেলাম না।

সারকথা, উল্লিখিত হাদীসগুলোর বক্তব্য একটাই– অর্থ-সম্পদের সঙ্গে অন্তর দিতে নেই। টাকা-পয়সাকে মন দিতে নেই। এজন্যই দেখি, রাসূল (সা.) সাহাবায়ে কেরামের হৃদয়ে একথা একেবারে বদ্ধমূল করে দিয়েছেন যে, দুনিয়ার কোনো তাৎপর্য নেই, মূল্য নেই। দুনিয়া এমন কিছু নয়, যার জন্য মানুষ দিনরাত বেহুঁশ থাকবে। অর্থের জন্যই ব্যাকুল হয়ে ফিরবে। এমনটি উচিত নয়; বরং প্রয়োজনমাফিক অর্থ কামানোই যথেষ্ট।

আসহাবে সুফ্‌ফা কারা?

لَقَدْ رَأَيْتُ سَبْعِيْنَ مِنْ اَهْلَ الصُّفَّة ، مَا مِنْهُمْ رَجُلٌ عَلَيْهِ رِدَاءٌ ، اِمَّا اِزَارٌ - اِمَّا كِسَاءٌ ، قَدْ رَبَطُوْا فِىْ اَعْنَاقِهِمْ ، فَمِنْهَا مَا يَبْلُغُ نِصْفَ السَّاقَيْنِ ، وَمِنْهَا مَا يَبْلُغُ الْكَعْبَيْنِ ، فَيَجْمَعُهُ بِيَدِهِ كَرَاهِيَةَ اَنْ تُرَى عَوْرَتُهُ -

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বলেছেন : 'আমি সত্তরজন আসহাবে সুফ্‌ফাকে দেখেছি। তাদের একজনও এমন ছিল না, যাদের পুরো শরীর ঢাকার বস্ত্র আছে। হয়ত লুঙ্গি আছে, নয়তো চাদর আছে, যা গলার সঙ্গে বেঁধে রেখেছে (সেই একটি কাপড়) এর কোনোটি পায়ের অর্ধগোছা পর্যন্ত পৌঁছেছে। কোনটিবা

পায়ের গোড়ালি স্পর্শ করেছে। হাত দিয়ে কাপড় ধরে রেখেছে– গোপন অঙ্গ প্রকাশ হয়ে যাওয়ার ভয়ে।'

হাদীসটিতে হযরত আবু হুরায়রা (রা.) আসহাবে সুফ্‌ফার অবস্থা তুলে ধরেছেন। আসহাবে সুফ্‌ফা সাহাবায়ে কেরামের একটি জামাত, যাঁরা দুনিয়ার সকল কাজ ত্যাগ করেছিলেন ইল্‌ম অর্জনের জন্য। রাসূল (সা.)-এর দরবারের নিয়মিত বাসিন্দা তাঁরা। যাঁদের মদীনা শরীফে যাওয়ার সৌভাগ্য নসীব হয়েছে, তাঁরা দেখেছেন, মসজিদে নববীতে একটি চত্বর আছে, যার নাম সুফ্‌ফা। এখানেই দিন-রাত তাঁরা অবস্থান করতেন। এটাই তাঁদের মাদরাসা, এটাই তাঁদের শিক্ষালয়। এটাই তাঁদের বিশ্ববিদ্যালয়। রাসূল (সা.) এখানেই তাঁদেরকে পড়াতেন। কিতাবের আকারে তাঁদের কোনো সিলেবাস ছিল না। রাসূল (সা.) এসে কিছু ইরশাদ করতেন, তাঁরা সেটা হৃদয়ে বসিয়ে নিতেন। এ কাজের জন্যই তাঁরা উৎসর্গ করেছিলেন তাঁদের জীবন। এঁরাই ইসলামের প্রথমদিকের ছাত্র। সুফ্‌ফা ইসলামের ইতিহাসের প্রথম মাদরাসা, একটি চত্বরে যার অবস্থান ছিল।

আসহাবে সুফ্‌ফার অবস্থা

হযরত আবু হুরায়রা (রা.)ও আসহাবে সুফ্‌ফার একজন। হাদীসটিতে তিনি আসহাবে সুফ্‌ফার অবস্থার বর্ণনা দিয়েছেন। বলেছেন : আমি এঁদের সত্তরজন সাহাবীকে দেখেছি। তাঁদের কারো নিকটই দুটি কাপড় ছিল না। বরং কারো-কারো কাছে শুধু একটি চাদর ছিল। ওটাই গলায় বেঁধে পায়ের গোছা পর্যন্ত ঝুলিয়ে ইজ্জত ঢাকতেন। কারো কাছে একটিমাত্র লুঙ্গি ছিল, যার দ্বারা কেবল শরীরের নিচের অংশ ঢাকা সম্ভব হত। কখনও-কখনও দ্রুত চলার সময় কাপড় চেপে রাখতেন সতর খুলে যাবে এই আশঙ্কায়। নবীজি (সা.)-এর দরবারে তাঁরা ইল্‌ম হাসিল করেছেন এ অবস্থাতেই। প্রশ্ন হলো, তাঁরা ইচ্ছা করলে কি সম্পদ উপার্জন করতে পারতেন না? আল্লাহ তো তাঁদেরকে প্রচুর মেধা ও দৃঢ়চেতা সন্ধি দিয়েছেন, যা কাজে লাগিয়ে নিশ্চয় সম্পদের পাহাড় গড়তে পারতেন। কিন্তু তাঁরা সেদিকে মনেযোগ নিবদ্ধ করেননি। প্রয়োজন মিটে গেছে তো এ-ই যথেষ্ট হয়ে গেছে।

আসহাবে সুফ্‌ফার চত্বরে তখন একটি পিলার ছিল। বর্তমানেও যার নিদর্শন রয়েছে। লোকজন তাতে খেজুরের ছড়া ঝুলিয়ে দিত। এটাই ছিল তাঁদের আহার। ক্ষুধা পেলে খেজুর ছিঁড়ে নিয়ে দু-একটি খেয়ে নিতো। এই ছিল তাঁদের জীবন।

হযরত আবু হুরায়রা (রা.)-এর ক্ষুধার তাড়না

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) নিজেই নিজের অবস্থা বর্ণনা করেছেন। বলেছেন : আমি থাকতাম মসজিদে নববীতে, রাসূল (সা.)-এর খেদমতে। কখনও ক্ষুধার জ্বালায় মসজিদের দরজায় বেহুঁশ হয়ে পড়ে থাকতাম। লোকেরা মনে করতো, আমি মৃগী রোগের রোগী। তাই তারা আমার গ্রীবায় পা মাড়িয়ে চলে যেত। এরপর তিনি কসম খেয়ে বলেন :

وَاللهِ مَا بِىْ الاَّ الْجُوْعِ -

'আল্লাহর কসম! আমি রোগে আক্রান্ত ছিলাম না; বরং আমি ক্ষুধার্ত ছিলাম।' এভাবেই আবু হুরায়রা (রা.)-এর সময় কেটেছে। আমাদেরকে ৫৩৬৪টি (পাঁচহাজার তিনশত চৌষট্টি) হাদীস উপহার দিয়েছেন সরাসরি রাসূল (সা.)-এর সান্নিধ্যে থেকে। শুধু এই ত্যাগের বিনিময়ে। গৌরবের আসরে আসীন হয়েছেন হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ মর্যাদায়।

সারকথা, হযরত সাহাবায়ে কেরাম নিজেরা মোটা ও সস্তা কাপড় পরতেন। সাধারণ খাবার খেতেন। অবর্ণনীয় কষ্ট স্বীকার করেই আল্লাহর দ্বীনকে হেফাজত করেছেন। এটা আমাদের প্রতি তাঁদের অনুগ্রহ। আল্লাহ তা'আলা তাঁদেরকে জান্নাতে সুউচ্চ মাকাম দান করুন। আমীন।

রাসূল (সা.)-এর প্রশিক্ষণ

রাসূল (সা.) সাহাবায়ে কেরামকে একটি স্বভাবের উপর গড়ে তুলেছেন, যেখানে দুনিয়ার লালসা, সম্পদের কামনা ও মোহ ছিল না। বরং প্রত্যেকেরই চিন্তা-চেতনায় ছিল আখেরাতের সফলতা ও উন্নতির কথা। দুনিয়াতে চলতে যতটুকু না হলেই নয়, ততটুকু হয়ে গেলেই হয়।

রাসূল (সা.) সাহাবায়ে কেরামকে কিভাবে প্রশিক্ষণ দিতেন, এ সুবাদে কিছু শুনুন।

সাহাবী আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন যে, একদিন কাঠফাটা দুপুরে আমি ঘর ছেড়ে বাইরে এলাম। দেখলাম, হযরত আবু বকর এবং হযরত উমর (রা.) বাইরে হাঁটাহাঁটি করছেন। ভাবলাম, এ প্রচণ্ড রোদে তাঁরা এভাবে কেন হাঁটাহাঁটি করছেন! এগিয়ে গেলাম, বিনয়ের সঙ্গে জিজ্ঞেস করলাম, এ ভরদুপুরে আপনারা...। উভয়ে উত্তর দিলেন, ঘরে কিছু নেই। ভাবলাম, একটা কাজ জুটে গেলে খাবারের ব্যবস্থা হতো। ইত্যবসরে রাসূল (সা.)ও তাশরীফ আনলেন। এসেই জিজ্ঞেস করলেন, আপনারা এখন বাইরে? সকলেই তখন বলে উঠলেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ! ক্ষুধার জ্বালায় বেরিয়ে এসেছি। রাসূল (সা.) বললেন, আমারও তো একই দশা।

রাসূল (সা.) বললেন : চলো, আমার এক বন্ধু আছে, তাঁর বাগানে চলো। বন্ধু এক আনসারী সাহাবী। সকলেই তাঁর বাগানে হাজির। কিন্তু সাহাবী গরহাজির। তিনি বাইরে গেছেন। আছে তাঁর স্ত্রী। সে তো মহাখুশি! এ আকাশের নিচে তিনিই যেন সবচেয়ে ভাগ্যবতী। নবীজি (সা.) তার মেহমান! রাসূল (সা.) যখন বাগানে প্রবেশ করলেন, মহিলা আরয করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ (সা.)! একটু সুযোগ দিলে একটা বকরী জবাই করতাম। নবীজি (সা.) বললেন, করতে পারো। তবে দুধের বকরি জবাই করো না। মহিলা বললো, ঠিক আছে, তা-ই হবে।

সে বকরী জবাই করলো। গোশত পাকালো। তারপর বাগানের তাজা খেজুর, ঠাণ্ডা পানি এবং বকরির গোশত নবীজীর খেদমতে নিয়ে এলো। নবীজী (সা.) সঙ্গীদেরকে নিয়ে তৃপ্তি সহকারে খেলেন। তারপর বললেন, আজ আমরা তাজা খেজুর, শীতল পানি, উন্নত গোশত আহার করলাম। এখানে ছায়াদার গাছের নিচে আরাম করলাম। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন :

لَتُسْئَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيْمِ -

'কেয়ামত দিবসে তোমরা জিজ্ঞাসিত হবে তোমাদের নেয়ামত সম্পর্কে।' আল্লাহর নেয়ামত কীভাবে ভোগ করছ– এটা কেয়ামত দিবসের এক বিরাট জিজ্ঞাসা।

নেয়ামত সম্পর্কে জবাবদিহিতা

এই শিক্ষাই ছিল মহানবী (সা.)-এর। তীব্র ক্ষুধার মুহূর্তে একবেলা খাবারের ব্যবস্থা হয়েছে। আর ঠিক তখনই তাদের হৃদয়ে বদ্ধমূল করে দিলেন, সম্পদের ভালোবাসা যেন হৃদয়ে না বসে। আল্লাহর ভয়ে তটস্থ থাকবে। এটা আল্লাহর নেয়ামত। কেয়ামতের দিন এগুলোর অবশ্যই হিসাব চাওয়া হবে। রাসূল (সা.) সকল সাহাবায়ে কেরামের অন্তরে এটা প্রবেশ করিয়ে দিয়েছেন।

মৃত্যু আরো নিকটে

একদিনের ঘটনা। রাসূল (সা.) কোথাও যাচ্ছেন। দেখলেন, এক লোক তার ঝুপড়িখানা মেরামত করছে। নবীজি (সা.) এগিয়ে গেলেন। একেবারে তার কাছে এসে দাঁড়ালেন। জিজ্ঞেস করলেন, কী করছো? বললো : ঝুপড়িটা ভেঙ্গে

যাচ্ছিল; একটু মেরামত করছি। রাসূল (সা.) বাধা দিলেন না, চলে গেলেন। যাওয়ার সময়ে শুধু বলে গেলেন–

مَا اَرَى الاَمْرَ اِلاَّ اَعْجَلَ مِنْ ذَالِكَ -

'আমার মনে হয়, মৃত্যু আরো নিকটবর্তী'।

আল্লাহর সম্মুখে হাজিরা দিতে হবে। হতে পারে, ঝুপড়িটা পড়ে যাবার আগেই। মানুষের অন্তরে যদি এই ভাবনা সতেজ থাকে, তাহলে তার একথা ভাবার অবকাশ কোথায় যে, ঝুপড়ি দুর্বল না মজবুত। কারণ, এ ঝুপড়িঘর ঠিক করতে গিয়ে যদি মনে আসে, এটাই আসল ঘর, এখানেই ঠিকানা আমার, তাহলে তো সবই ছারখার। বরং সব সময় ভাবতে হবে, আমাকে যেতে হবে আরো সম্মুখে। আরো অনেক দূরে। এটা আসল ঘর নয়; বরং চলার পথের একটি বিশ্রামঘর। এটা কোনোরকম হলেই চলে। এরচেয়ে বেশি আর দরকার কি! এটাই ছিল রাসূল (সা.)-এর শিক্ষা।

দ্বীনের উপর চলা কি খুব কঠিন?

মাঝে-মাঝে হাদীস শরীফ পড়তে গিয়ে আমাদের মতো দুর্বল লোকেরা মনে করে, দ্বীনের উপর চলা খুব কঠিন। আমল করে এর দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন হযরত আবু হুরায়রা, হযরত আবু বকর ও হযরত উমর (রা.)। 'আল্লাহ তাঁদের উপর খুশি হোন'। দীর্ঘদিন অনাহার যাপন, একটি লুঙ্গি অথবা একটি জামা পরে দিন গুজরান, তারপর ঝুপড়ি ঠিক করতে গিয়ে 'কেয়ামত আরো নিকটে' এ জাতীয় ভাবনায় মগ্ন হয়ে যাওয়া– আমাদের পক্ষে অসম্ভব।

মূলত হতাশা সৃষ্টি করা, নিরাশা জাগ্রত করা আমার উদ্দেশ্য নয়। বলার উদ্দেশ্য, তাঁদের নমুনা তুলে ধরা। তাঁদের অস্থি-মজ্জায় শুধু দুনিয়া বিমুখতা– এটা তো রাসূল (সা.)-এরই শিক্ষা। সকলেই এ স্তরে পৌঁছুতে পারবে, এমনটা জরুরি নয়। এখানে উন্নীত না হতে পারলে নাজাতই পাওয়া যাবে না– বিষয়টা এমন নয়। বরং প্রত্যেকের যোগ্যতা ও সামর্থ এক নয়। সামর্থের বাইরে কোনো কিছু আল্লাহ তা'আলা দেন না। কবির ভাষায় :

دیتے ہیں ظرف قدح خوار دیکھ کر

'পাত্র যার যতটুকু, আল্লাহ দানও করেন ততটুকু'।

আহ! আমরা যদি রাসূল (সা.)-এর যুগে আসতাম!

মাঝে-মধ্যে আমাদের মনে জাগে, হায়! যদি আমরা রাসূল (সা.)-এর জমানায় আসতাম! সাহাবাগণের সঙ্গে থাকতে পারতাম! রাসূল (সা.)-এর সাক্ষাতলাভে ধন্য হতাম এবং যুদ্ধ-জিহাদে নবী (সা.)-এর সাথী হতাম!

আসলে আল্লাহর হেকমত কে বোঝে! তিনি সে যুগে আমাদেরকে সৃষ্টি করেননি। কারণ, যদি এই যোগ্যতা ও সামর্থ্য নিয়ে সৃষ্টি হতাম, তাহলে অসম্ভব নয়, আবু জাহেল আর আবু লাহাবের দলে শামিল হতাম। এটা সাহাবায়ে কেরামের মর্যাদা যে, তাঁদের বিশাল আঁজলা ছিল। অনেক সামর্থ্য ও যোগ্যতা ছিল। তাই সঙ্গীনতম মুহূর্তেও রাসূল (সা.)-এর সাথে ছিলেন।

মূলত রাসূল (সা.) একটি পথ ও আদর্শ তৈরি করে গেছেন, যেন আমি-আপনিসহ কেয়ামত অবধি অনাগত সকল মানুষ সঠিক পথে চলতে পারে এবং প্রত্যেকে নিজ-নিজ যোগ্যতা অনুসারে হেদায়াত লাভ করতে পারে। পথটি হলো, দুনিয়ার প্রতি উদাসীনতা ও সম্পদের প্রতি অনীহার পথ। আকর্ষণ ছাড়া, লালসা ছাড়া দুনিয়া গ্রহণ করলে করতে পার। প্রয়োজন মতো দুনিয়াকে কাজে লাগাতে পার। বৈধ ও হালাল তরীকা তোমার তরীকা। হারাম উপায় মোটেও গ্রহণ করতে পারবে না। দুনিয়াবিমুখতার জন্য কেবল এতটুকু লক্ষ্য রাখবে।

যুগের মুজাদ্দিদ হযরত থানভী (রহ.)

চলতি শতাব্দীর একজন প্রকৃত ওয়ারিসে নবী হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহ.)। রাসূল (সা.)-এর নির্ভেজাল উত্তরসূরী। যুগের সংস্কারক। সামর্থ্য অনুযায়ী করণীয় ও বর্জনীয় বিষয়গুলো তিনি আমাদেরকে দেখিয়ে দিয়েছেন। মনে হয় এসব কথা সবচে সুন্দর করে সমকালে তিনিই বলেছেন। আমরা দুনিয়া কতটুকু গ্রহণ করবো, কোন মানের গ্রহণ করবো, কীভাবে গ্রহণ করবো– এসবই তিনি ব্যাখ্যা দিয়েছেন। যদিও নির্দেশনাটি ঘর-বাড়ির সাথে সংশ্লিষ্ট, তবুও জীবনের অবশিষ্ট ক্ষেত্রে এটা আমাদের জন্য এক অনুপম হেদায়েত।

ঘর তৈরি হয় চার উদ্দেশ্যে

হযরত থানভী (রহ.) বলেছেন : ঘর চার উদ্দেশ্যে বানানো হয়।

১. বসবাস : অর্থাৎ– যেখানে রাতযাপন করা যায়, রোদ-বৃষ্টি, গরম-শীত থেকে নিরাপদে থাকা যায়। ঘরের এই উদ্দেশ্য একটি কুঁড়েঘরের মাধ্যমেও পূরণ হতে পারে। এ উদ্দেশ্যে ঘর বানানো জায়েয।

২. আরাম : অর্থাৎ– বসবাসের প্রয়োজনটা যেন একটু আরামের সাথে পূরণ হয়। যথা : কুঁড়েঘরে মানুষ বাস করতে পারে; কিন্তু আরাম হয় না। বৃষ্টির সময় পানি পড়তে পারে। রোদের সময় রোদ ঢুকে কষ্ট দিতে পারে। একটু পাকা করে নিলে আরাম হবে। তাহলে এ উদ্দেশ্যেও ঘর তৈরি করা জায়েয। এতে কোনো গুনাহ নেই।

৩. সৌন্দর্য্য : এটা ঘর বানানোর তৃতীয় উদ্দেশ্য। অর্থাৎ– ঘরটাকে পরিপাটি ও সুন্দর করে তৈরি করা। ঘর বানালেন। সেখানে বসবাস করা যাবে। কিন্তু দেয়ালে প্লাস্টার নেই, রংও নেই। তবে আরামের সাথে থাকা যায়। কিন্তু ঘরে ঢুকলে তৃপ্তিবোধ হয় না। মনকে খুশি করার জন্য একটু প্লাস্টার ও রং হলে ভালো হতো। তাহলে এটা কোনো গুনাহের কাজ নয়। ইসলাম এরও অনুমতি দেয়। তবে লক্ষ্য রাখতে হবে, এই অনুমতি শুধুই নিজের মনকে খুশি করার জন্য।

৪. সাজসজ্জা : অর্থাৎ– ঘরটি বসবাসেরও উপযুক্ত, আরামেরও ব্যাঘাত হচ্ছে না। কিন্তু মনে চায় ঘরটাকে ভালো ভাবে সাজাবো, যেন যে কোনো দর্শক দেখে বলতে বাধ্য হয় অমুকের ঘরটা দেখে তার উন্নত রুচির প্রশংসা না করে পারলাম না। ঘর দেখেই বোঝা যায়, ঘরওয়ালা পয়সাওয়ালা, এখন সে যদি ঘরের কারুকাজ এ উদ্দেশ্যে করে যে, ঘর দেখে যেন তাকে পয়সাওয়ালা মনে করে, নিজেকে বড় হিসেবে যাহির করা, দৌলতমন্দ হিসেবে ফুটিয়ে তোলা তার একমাত্র উদ্দেশ্য, তাহলে এটা হারাম, সম্পূর্ণ অবৈধ।

সারকথা হলো, বাস করা, আরাম করা এবং নিজে একটু তৃপ্তিবোধ করা– এ তিন উদ্দেশ্যে ঘর তৈরি করা যেতে পারে। ইসলামে কোনো বাধা নেই। কিন্তু অন্যের চোখে নিজেকে বড় করে যাহির করার মতলবে ঘর বানানো হারাম। শুধু ঘর কেন, এ উদ্দেশ্যে যাই করা হবে, তা-ই হারাম।

অল্পেতুষ্টির মর্মার্থ

ঘর-বাড়ি সম্পর্কে একটু সবিস্তারে আলোচনা করা হলো, যেন অল্পেতুষ্টির প্রকৃত মর্ম সহজে বুঝে আসে। 'কানা'আত' তথা অল্পেতুষ্ট হওয়ার অর্থ হলো, আল্লাহ যতটুকু নেয়ামত দান করেছেন, ততটুকুর উপর রাজি-খুশি থাকা। অন্তরের সন্তুষ্টির সঙ্গে বান্দা যদি মনে করে, আমার ঘরে বিষয়টা প্রয়োজন। সে যদি বৈধ উপায়ে প্রয়োজন পূরণ করার চেষ্টা করে, তাহলে এটা 'আরাম' লাভের প্রচেষ্টা হিসেবে ধর্তব্য হবে। এটা হারাম নয়, এটাকে লোভও বলা যাবে না।

কেউ যদি মনে করে, আল্লাহর শোকর, আমার ঘরটি ভালো বটে; তবে দেখতে তেমন সুন্দর লাগে না। একটু চুনকাম করলে আরো ভালো লাগতো। অন্তরের তৃপ্তিবোধের জন্য ঘরকে সুন্দর করছে। এতে কোনো অসুবিধা নেই। তবে শর্ত হলো, সবই করতে হবে বৈধ উপায়ে। কিন্তু যদি অন্যের চোখে দৌলতমন্দ সাজবার মতলবে কিংবা মহল্লার অন্যান্য লোকের সঙ্গে তাল মেলানোর উদ্দেশ্যে ঘর-বাড়ি সাজায়, তাহলে এটা বৈধ নয়। কারণ, এখানে তখন উদ্দেশ্য হয়, কেবল অন্যের চোখে নিজের বড়ত্ব যাহির করা, অন্যের প্রশংসা কুড়ানো। এটাই লালসা। এটা অল্পেতুষ্টির পরিপন্থী। পাশাপাশি নিজের আরামের জন্য ঘুষ খাওয়া কিংবা ধোঁকা দেয়া ও প্রতারণা করা, এভাবে অপরের অধিকার খর্ব করা সম্পূর্ণ হারাম।

সাহাবায়ে কেরামের যে অবস্থা আমরা একটু পূর্বে আলোচনা করেছি, সেটা হলো সর্বোচ্চ স্তর। যে স্তরে পৌছার চেষ্টা অন্তত আমরা করতে পারি, সেটা ছিলো জীবনযাপনের সাধারণ ও সর্বনিম্ন স্তর। হযরত থানভী (রহ.) আমাদেরকে এটার কথা বলেছেন। এ স্তরে পৌছুতে দুনিয়ার অল্পেতুষ্টি, আখেরাতের ফিকির এবং মৃত্যুর যিকির প্রথমে অন্তরে সৃষ্টি করতে হবে।

আজ মানুষ বসে হাজার বছরের রোডম্যাপ তৈরি করে। খবর নেই সে তো কালই পৃথিবীকে বিদায় জানাতে পারে। বিনা আমলে দুনিয়া ছেড়ে চলে যাবে। তাই দীর্ঘ পরিকল্পনা না করে প্রয়োজন পরিমাণ সম্পদ নিয়ে সন্তুষ্ট থাকা উচিত। তাহলে এর মাধ্যমে দুনিয়া ও আখেরাতের প্রশান্তি ভাগ্যে জুটবে। আর এর তরীকা সেটাই, যা রাসূল (সা.) বলেছেন : নিজের অপেক্ষা দুর্বল যারা, তাদের প্রতি তাকাও আর আল্লাহর শুকরিয়া আদায় কর। কারণ, উপর দিকের সীমা নেই।

এক ইহুদীর শিক্ষামূলক ঘটনা

ঘটনাটি হযরত থানভী (রহ.) লিখেছেন। ইহুদীর নিকট প্রচুর ধন-দৌলত ছিলো। বিশাল ধনভাণ্ডার ছিলো তার। একদিনের কথা। তার সাধ জাগলো সম্পদের ভাণ্ডারটি ঘুরে দেখার। বের হলো ঘর থেকে। ভাণ্ডারে পাহারাদার আছে। তার মনে সন্দেহ জাগলো, পাহারাদার হয়ত খেয়ানত করছে। তাই পাহারাদারকে না জানিয়ে গোপনে ঢুকে পড়লো ভাণ্ডারের অন্দরে। পাহারাদারের জানা নেই ভেতরে তার মনিব আছে। সে যখন ভাণ্ডারের দরজা খোলা দেখল, খুব চিন্তিত হল এবং দ্রুত দরজা বন্ধ করে দিল। ওদিকে ইহুদী ভেতরে মনের সুখে নিজের সম্পদের ভাণ্ডার পরিদর্শন করতে লাগলো। পরিদর্শন শেষে যখন

বের হওয়ার জন্য দরজার সামনে এলো দেখল দরজা বন্ধ। বিচলিত হলো, কী করবে এখন! সে ভেতর থেকে খুব চিল্লাচিল্লি করলো, সবটুকু শক্তি দিয়ে চিৎকার করলো। কিন্তু আওয়াজ বাইরে এলো না।

ক্রমশ সময় পার হচ্ছে, পুরো দেহে দুর্বলতা চলে আসছে। পিপাসা পেয়েছে, ক্ষুধা লেগেছে। সোনা-রুপার ভাণ্ডার পাশেই পড়ে আছে; কিন্তু এতে কি ক্ষুধা-তৃষ্ণা মেটানো যাবে? অবশেষে সে ক্ষুৎপিপাসায় মারা গেল। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন :

إِنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُم بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا –

'আল্লাহ তা'আলা এ জগতে কিছু দুনিয়াদারকে দুনিয়া দ্বারাই শাস্তি প্রদান করেন। -(সূরা তাওবা : ৫৫)

এ শাস্তি থেকে মুক্তি পাওয়ার উপায় একটাই। নিচের দিকে দেখ– উপরের দিকে নয়। আর সকল নেয়ামতে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় কর। হালাল গণ্ডিতে থেকে হালাল প্রয়োজনগুলো পূরণ কর। সকাল-সন্ধ্যা, রাতদিন সম্পদের মোহে আবিষ্ট থাকার পথ পরিত্যাগ কর।

এক ব্যবসায়ীর বিস্ময়কর কাহিনী

শেখ সাদী (রহ.) বিশ্ব ইতিহাসের একজন প্রসিদ্ধ কবি ছিলেন। কাহিনীটি লিখেছেন তিনি। কাহিনীট হলো, আমি সফরে ছিলাম। সে সময়ে এক রাতে এক ব্যবসায়ীর বাড়িতে মেহমান হলাম। রাত কাটাবো এই ছিলো উদ্দেশ্য। কিন্তু ব্যবসায়ী তার ব্যবসাজীবনের লব্ধ কাহিনীর পসরা খুলে বসলো। সারারাত বকবক করলো, অমুক দেশে আমার ব্যবসা আছে, অমুক জায়গায় আমার ব্যবসা আছে, অমুক দেশ থেকে এটা আমদানি করেছি, অমুক দেশে ওটা রফতানি করেছি ইত্যাদি ইত্যাদি।

গল্প বলতে-বলতে ভোর হল। এবার বলল, এখন আমার ব্যবসা জমে ওঠেছে। আমার স্বপ্নরাও ধরা দিয়েছে। এখন সবশেষে আরেকটা সফর করার ইচ্ছে আছে। এটা আমার জীবনের শেষ ব্যবসায়ী সফর হবে। দুআ করবেন, যেন কামিয়াব হই। এই সফরটা শেষ হলে অল্পেতুষ্টির জীবন গ্রহণ করবো। বাকি জিন্দেগি দোকানে বসে কাটিয়ে দেব।

শেখ সাদী জিজ্ঞেস করলেন : আখেরী সফরটা কি উদ্দেশ্যে করবেন? ব্যবসায়ী উত্তর দিল, আমি এখান থেকে পারস্যের গন্ধক নিয়ে চীন যাব। শুনেছি, চীনে এগুলোর খুব কদর আছে। এগুলো বিক্রি করে সেখান থেকে চীনা বাসনপত্র খরিদ করবো। রোমে চীনা বাসনপত্র বিক্রি করবো এবং সেখান থেকে রুমী কাপড় খরিদ করবো। সেগুলো ভারতে নিয়ে যাব। ভারতে চড়া দামে বিক্রি করবো। তারপর সেখান থেকে 'সিসা' কিনবো। সিসা নিয়ে যাবো সিরিয়ায়। সিরিয়ায় এগুলো বিক্রি করে কাচ ক্রয় করবো। সিরিয়ার কাচ ইয়েমেনে নিয়ে যাব। ইয়েমেনে বিক্রি করে সেখান থেকে চাদর কিনে নেব। ইয়েমেনের চাদর অবশেষে পারস্যে নিয়ে আসবো। এ ছিলো ভ্রমণসূচি। সবকিছু পরিকল্পিত। সাদী (রহ.)-কে বললো, জনাব! এটা আমার সর্বশেষ সফর। দু'আ করবেন, যেন সহী-সালামতে ফিরে আসতে পারি। তারপর থেকে বাকি জীবন 'কানাআত' তথা অল্পেতুষ্টির মধ্য দিয়ে এ দোকানে বসে বসে কাটিয়ে দেব। শেখ সাদী বলেন, আমি তার এ স্বপ্ন ও কল্পনা শুনে বললাম–

ان شنیدستی کہ در صحرائے غور
بار سالارے بیفتاد از ستور
گفت چشم تنگ دنیا دار را
یا قناعت پرکند یا خاک گور

'তুমি কি গৌর সাহারার সেই ব্যবসায়ীর দাস্তান শুনেছো, যার সামানপত্র আর উটের মরদেহ একদিকে পড়ে ছিল, অন্যদিকে পড়ে ছিলো ব্যবসায়ী নিজে? তার সেই ব্যবসায়িক সামানপত্র যেন তাকে বলছিলো, দুনিয়াদারদের সঙ্কীর্ণ নজর পূরণ করতে পারে অল্পেতুষ্টি অথবা কবরের মাটি।' (গুলিস্তা, হেকায়াত : ২২)

ধন-দৌলত হতে পারে আখেরাতের পাথেয়

ঘটনা উল্লেখ করার পর শেখ সাদী (রহ.) লিখেছেন; মানুষ যখন দুনিয়ার প্রেমে মাতোয়ারা হয়, তখন অন্যকিছু আর মনে থাকে না। এটাই দুনিয়ার প্রতি ভালোবাসা, এটাই নিষিদ্ধ। যদি দুনিয়ার প্রতি এই নেশা ও ভালোবাসা না থাকে, আর যদি আল্লাহ রহম করে মাল-সম্পদ দিয়ে দেন, তাহলে সে সম্পদ আল্লাহর গোলামীর পথে অন্তরায় হতে পারে না। সে সম্পদ বন্দেগীর পথে বাধার প্রাচীর হয় না। সে সম্পদ আল্লাহর জন্য উৎসর্গিত হয়, জান্নাতের পথে খরচ হয়। তখন এটা আর দুনিয়া থাকে না। এটা হয়ে যায় আখেরাতের পাথেয়। আখেরাতের পথে অন্তরায় হলেই তা দুনিয়া, ইসলামে যার অনুমতি নেই।

হৃদয় থেকে দুনিয়ার প্রেম কমানোর পদ্ধতি

অন্তর থেকে দুনিয়ার ভালোবাসা হটানো এবং আখেরাতের মহব্বত সৃষ্টি করার পথ হলো, দিনের সামান্য সময় বের করে একাকী ধ্যান করতে হবে। আর নিজের হিসাব নিজে নিতে হবে। 'আমি তো গাফলতির জালে আটকা পড়ে আছি। মৃত্যুর ভাবনা ভুলে গেছি। আল্লাহর সামনে হাজির হতে হবে–এটাও ভুলে গেছি। আমার হিসাব-নিকাশের কথাও ভুলে বসেছি। ভালো-মন্দের প্রতিদান আছে তাও মনে নেই। আখেরাতের কথা স্মরণ নেই। মৃত্যুর চেতনা আমার মাঝে নেই।'

সামান্য সময় বের করে এসব ধ্যান করতে হবে। ভাবতে হবে, 'আমাকে একদিন মরে যেতে হবে। তখন আমার অবস্থা কেমন হবে? আমার সওয়াল-জওয়াব কেমন হবে? কী জবাব দেব আল্লাহর কাছে?' একথাগুলো গভীরভাবে প্রতিদিন ভাবতে হবে। হযরত থানভী (রহ.) বলেছেন : যদি কেউ কথাগুলো নিয়মিত প্রতিদিন স্মরণ করতে থাকে, তাহলে 'ইনশাল্লাহ' কয়েক সপ্তাহর মধ্যেই সে বুঝতে পারবে, অন্তর থেকে দুনিয়ার মহব্বত চলে গেছে।

পুরো দুনিয়া পেয়েছে সে

এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন :

مَنْ اَصْبَحَ مِنْكُمْ آمِنًا فِىْ سِرْبِهِ مُعَافًا فِىْ جَسَدِهِ عِنْدَهُ قُوْتُ يَوْمِهِ فَكَاَنَّمَا حِيْزَتْ لَهُ الدُّنْيَا – (ترمذى ، ابواب الزهد ، باب ماجاء فى الزهادة فى الدنيا)

'তোমাদের মাঝে যে ব্যক্তির মাথা গোঁজার নিরাপদ ব্যবস্থা আছে, শরীর সুস্থ আছে, নিজের কাছে একদিনের খাবার আছে, তাহলে বুঝতে হবে গোটা পৃথিবী তার কাছে জমা হয়ে আছে।'

এ তিনটি জিনিস যার কাছে আছে– নিরাপদ বাসস্থান, শারীরিক সুস্থতা এবং একদিনের আহার, তাহলে মনে করবে দুনিয়ার সব নেয়ামতই সে পেয়েছে। কারণ, এগুলো তার মৌলিক প্রয়োজন। প্রয়োজন পূরণ হলে আল্লাহর দরবারে কৃতজ্ঞতা আদায় করা উচিত।

নেয়ামতের শুকরিয়া আদায় কর

উল্লিখিত হাদীসে রাসূল (সা.) দু'টি বিষয়ের শিক্ষা দিয়েছেন।

এক. প্রত্যেকেরই কৃতজ্ঞতার মেজাজ গড়ে তোলা উচিত। অকৃতজ্ঞ হওয়া উচিত নয়। নেয়ামতের অসংখ্য আয়োজন দ্বারা আল্লাহ আমাদেরকে লালন-পালন করছেন। অথচ আমরা সকাল-সন্ধ্যা অকৃতজ্ঞতায় নিমজ্জিত। মত ও স্বভাবের একটু ব্যতিক্রম হলেই আমরা সবকিছু ভুলে বসি এবং অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ শুরু করি। হাজার হাজার নেয়ামতের মাঝে যেন একবিন্দু কষ্টই আসল। এটা খুবই মারাত্মক দোষ! এজন্য রাসূল (সা.) বলেছেন, তিনটি জিনিস পেলেই ভাববে দুনিয়া পেয়ে গেছ। এর অতিরিক্ত কিছু না পেলে অভিযোগ-আপত্তি ও অকৃতজ্ঞতা প্রকাশের সুযোগ নেই।

আজকাল যদি কাউকে জিজ্ঞেস করা হয়, কেমন আছেন ভাই? তখন অধিকাংশের মুখ থেকে যে কথাটি বের হয়, তা হলো, 'এই কোনো রকম সময় কাটাচ্ছি'। আল্লাহ মাফ করুন, এটা খুব না-শোকরির কথা। কথাটির মতলব হলো আল্লাহ আমাকে কোনো নেয়ামতই দেননি। বড় সমস্যায় আছি। নিজের শক্তি আছে, সাহস আছে। তাই সহ্য করে যাচ্ছি। অথচ কেউ 'কেমন আছেন ভাই'? জিজ্ঞেস করলে উচিত ছিলো আল্লাহর নেয়ামতের কথা স্মরণ করা, আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করা যে, তিনি কত নেয়ামত দান করেছেন, এখন যদি একটু কষ্ট দেন, তাহলে বলবে, 'হে আল্লাহ! কত নেয়ামত আমাকে দান করেছেন, আর এই সামান্য যে কষ্ট দিয়েছেন, সেটাও মূলত আপনার নেয়ামত। কিন্তু আমি তো দুর্বল, আমাকে মাফ করে দিন।' এ জাতীয় কথাই বলা উচিত ছিলো। 'কষ্টে আছি' জাতীয় কথা বলা উচিত নয়।

বড়-বড় পরিকল্পনা কেন?

জীবন যাত্রা আজ কঠিন হয়ে পড়েছে। যেহেতু আমরা মনের মাঝে বিরাট পরিকল্পনা আঁকি। সিদ্ধান্ত নিয়ে রেখেছি, আমাকে হতে হবে প্রচুর ধন-সম্পদের অধিকারী। আমার আরো একটি মনোরম বাগানবাড়ী চাই। উন্নত মডেলের গাড়ি চাই। বাড়িতে এতজন চাকর-নওকর চাই। এতজন সন্তান চাই। এত বিরাট ব্যাংক-ব্যালেন্স চাই। এত বিশাল ব্যবসা চাই। এসব আমার অনেকদিনের স্বপ্ন, দীর্ঘদিনের পরিকল্পনা। পরিকল্পনায় একটু ঘাটতি এলেই হা-হুতাশ শুরু করে দিই। তখনই বলি, 'এই কোনো রকম আছি।'

এ হাদীসে রাসূল (সা.) আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন যে, এ বিশাল পরিকল্পনা সঠিক নয়। বরং যদি এ তিনটি নেয়ামত তুমি আয়ত্তে নিয়ে

আস– এক. তোমার আর তোমার পরিবারের একদিনের খাবারের ব্যবস্থা আছে, তাহলে মনে করবে, পুরো দুনিয়াটাই তোমার হাতে এসে গেছে।

যদি কারো মনে এ কথা বদ্ধমূল হয়ে যায় যে, এ তিনটি জিনিসেরই নাম দুনিয়া আর এগুলো তো আমার আওতায় এসে গেছে, তাহলে এ ব্যক্তি যদি এ তিনটির বাইরে কোনো নেয়ামত পেয়ে যায়, তাহলে সে শুকরিয়া আদায় করবে। চিন্তা করবে, আমি আরো কমের উপযুক্ত ছিলাম। আল্লাহ আমার উপর রহমত করেছেন। তিনি অনেক কিছু আমাকে দান করেছেন। এখন এ ব্যক্তি যদি এর চেয়ে বেশি নাও পায়, তবুও না-শোকরি করবে না, বরং ভাববে, দুনিয়া তো আমি পেয়েছি। আসলে বড় বড় পরিকল্পনা করা মস্তবড় ভুল। এই পরিকল্পনা আমাদেরকে হতাশ করে, অকৃতজ্ঞতার সাগরে ডুবিয়ে মারে।

আগামীকাল নিয়ে চিন্তা কিসের?

প্রশ্ন হতে পারে, রাসূল (সা.) তো মাত্র একদিনের আহারের কথা বললেন। একদিনের খাবারের ব্যবস্থা হলেই মনে করতে হবে দুনিয়া হাতের নাগালে এসে গেছে। তাহলে আগামীকালের অবস্থা কী হবে? পরশুর কী গতি হবে? মূলত রাসূল (সা.) বলতে চেয়েছেন, তোমার যে আগামীকালের ব্যবস্থা হবে না, তো জানলে কী করে? আর এটাই বা কিভাবে বুঝলে, আজ যিনি ব্যবস্থা করেছেন, কালও তিনি ব্যবস্থা করবেন না, তিনি তো স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন–

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الأَرْضِ إِلاَّ عَلَى اللّٰهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا –

'পৃথিবীর সকল প্রাণীর রিযিকের দায়িত্ব আল্লাহর। তিনি সকলের স্থায়ী ও অস্থায়ী নিবাস সম্পর্কে সম্যক অবগত। –(সূরা হূদ : ৬)

সকলের রিযিকদাতাও তিনি। সকলের আবাসস্থল সম্পর্কেও অবগত তিনি। তোমার কাজ কেবল পরিশ্রম করা। আজ পরিশ্রম করছো কালও করবে। আল্লাহর উপর ভরসা আর শ্রমের পথ ধরে তোমার রিযিক চলে আসবে। তাই আজ যা ভাগ্যে জুটেছে, তার জন্য শুকরিয়া আদায় করো। আল্লাহ ওয়াদা করেছেন, "মানুষ যদি শুকরিয়া আদায় করে, তাহলে নেয়ামত আরও বাড়িয়ে দেবো।"

তুষ্টপূর্ণ অন্তর শান্তির উৎস

হাদীস শরীফের দ্বিতীয় শিক্ষা হলো– শান্তি, নিরাপত্তা ও সুখের উৎস হলো তুষ্টপূর্ণ অন্তর। অর্থাৎ– বৈধ উপায়ে ইজ্জতের সঙ্গে যা হাতে আসবে, তা-ই নিয়ে খুশি থাকা। এরচে' বেশি কামনা না করা। এ জগতে সুখী থাকার এটাই একমাত্র উপায়। সম্পদের পাহাড়, ব্যাংক-ব্যালেন্সের সমাহার, ঘর-বাড়ির কিংবা নারী-গাড়ির বাহার গড়ে তুলো। কিন্তু জীবনের যদি তুষ্টপূর্ণ হৃদয় না থাকে, তাহলে আকাশছোঁয়া ভবনে বসেও শান্তি পাবে না।

সম্পদের পাহাড়ে বসেও সুখ পাওয়া যাবে না। আর যদি তুষ্টপূর্ণ অন্তরের মালিক হতে পার, তা হলে রুটি-সিরকায় সেই শান্তি লাভ করা যাবে, যা ওই চমকদার বাড়ি-গাড়ি আর চটকদার খাবার-দাবারে নেই। বিশ্বাস না হলে অভিজ্ঞতার ছোঁয়ায় নিজেকে রাঙিয়ে দেখুন।

বিত্তবানদের জীবন

এখনকার সমাজের মাপকাঠি হলো সম্পদের প্রাচুর্য। একজন অসহায়-গরীব যখন একজন বিত্তশালীকে দেখে, তার বাড়ি-গাড়ি, বিত্ত-বৈভবের প্রতি লক্ষ্য করে, দেখে তার তো কোনো অভাব নেই, এই বিত্তশালী কত সুখী, কত সৌভাগ্যের অধিকারী! জীবন তার কত সুন্দর! তখন কামনা করে, আহ্ আমিও যদি এমন হতাম! আমিও যদি এতসব অর্থের অধিকারী হতাম!

অথচ সে জানে না, সম্পদের পাহাড়ে ক্লান্ত-ক্লিষ্ট ধনী লোকটি আসলেই কি সুখী? না অশান্তির মর্মজ্বালায় সে ছারখার হয়ে যাচ্ছে?

অনেক লোক ব্যক্তিগতভাবে আমার গরীবালয়ে আসে। তাদের অন্তরের কথা খুলে বলে। এরকম কত বিত্তশালীর সুখের আগুন (?) আমি দেখেছি। সাধারণ মানুষের ধারণা তারা খুব সুখী। ভাবে, এরা পৃথিবীর বিখ্যাত ধনী। আমি যদি এমন হতাম! সাধারণ মানুষ জানে না, কঠিন জীবন চালাচ্ছে এ ধনকুবের গোষ্ঠী। তাদের অন্তর্জ্বালা বাইরের লোকেরা দেখে না। বড়-বড় আমীরও সম্পদের কুমির আমার কাছে চোখের পানি ছেড়ে দিয়ে বলেছে : আফসোস, আমরা যদি গরীব হতাম, হায়! যদি সম্পদহীন হতাম! সম্পদের দেয়ালে যদি বন্দি না হতাম। সম্পদের ভারমুক্ত একটু সুখ, একটু শান্তি, একটু তুষ্টি উপভোগ করতে পারতাম! সামান্য সময়ও যদি সুখের নাগাল পেতাম!

টাকা দিয়ে সুখ কেনা যায় না

সারকথা হলো, সুখ-শান্তি টাকা দ্বারা কেনা যায় না। এটা আল্লাহর দান। তিনি চাইলে সিরকা-রুটির মধ্যেও সুখ দিয়ে দেন। তার মর্জি না হলে অট্টালিকা আর বাগানবাড়িতে বসেও সুখের ছোঁয়া মেলে না। সুতরাং এর পেছনে কোন পর্যন্ত দৌড়াবে? কত পরিকল্পনা আঁটবে? এজন্য নবী করীম (সা.) বলেছেন, দুনিয়ার হাকীকত জানো? এ দুনিয়া সব সময় থাকার জায়গা নয়। এখানে সামান্য কিছু জুটলে তা-ই গনীমত। আল্লাহ যতটুকু দেন, ততটুকুতেই খুশি। এ অল্পেতুষ্টি সুখের নীড়ে নিয়ে যাবে। অল্পেতুষ্টির জীবন না হলে সম্পদের চক্করে পড়ে যাবে, যে চক্কর অতিক্রম করে শান্তি কখনো প্রবেশ করে না।

এমন বহু মানুষ আছে, কত টাকার মালিক সে নিজেও জানে না। পুরো জীবন বসে বসে ভোগ করলেও শেষ হবে না। অথচ অর্থের ধান্ধায় তার কেটে যায় পুরোটা সময়। হালাল-হারামের কোনো বালাই নেই। অথচ কোটি টাকার মালিক। তাই বলি, অন্তত একবার চিন্তা করে দেখ, এ অর্থ কোথায় বিলাবে? কোথায় ঢালবে এত সম্পদ?

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ -

মানুষকে কষ্ট না দেয়া

"মুসলিম-অমুসলিম পার্থক্য নির্ণয়ের আগে মানুষকে 'মানুষ' হিসাবে বিচার করুন। দরবেশ ও সাধারণ মানুষের পার্থক্য এরও পরে করুন। সর্বপ্রথম মানুষ বনে যান। আর মানুষ হতে হলে ইসলামের সামাজিক শিষ্টাচার মেনে চলতে হবে। অপরের ক্ষতি না করা, ভাষা দ্বারা অন্যকে আঘাত না করা, হাত দ্বারা কষ্ট না দেয়া এবং কর্ম দ্বারা মনে কষ্ট না দেয়া হলো ইসলামের শিক্ষা। এ শিক্ষাকে জীবনঘনিষ্ঠ করে নিন।"

মানুষকে কষ্ট না দেয়া

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ، وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّاٰتِ اَعْمَالِنَا، مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلاَ هَادِىَ لَهٗ، وَاَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهٗ لاَ شَرِيْكَ لَهٗ، وَاَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَسَنَدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلاَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ .... صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى آلِهٖ وَأَصْحَابِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا — اَمَّا بَعْدُ :

عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى الْاَشْعَرِىُّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اَلْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ لِسَانِهٖ وَيَدِهٖ – (ترمذى ، كتاب الايمان ، باب ١٢)

হাম্‌দ ও সালাতের পর!

সাহাবী হযরত আবু মূসা আসআরী (রা.) বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, যার মুখ ও হাত থেকে অপর মুসলমান ভাই নিরাপদ থাকে, সে-ই মুসলমান।

অর্থাৎ– যে ব্যক্তি অপর মুসলমান ভাইকে মুখ দ্বারা কিংবা হাত দ্বারা কষ্ট দেয় না, সে-ই প্রকৃত মুসলমান।

আলোচ্য হাদীসে একজন মুসলমানের বৈশিষ্ট্যের বিবরণ দেয়া হয়েছে। সুতরাং যে মুসলমানের ভাষা ও হাতের অনিষ্টতা থেকে অন্য মুসলমান নিরাপদ নয়, মূলত সে মুসলমান পরিচিতির যোগ্য নয়। কোনো মুসলমান নামায না

পড়লে তাকে 'অমুসলিম' ফতওয়া দেয়া যায় না বটে; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সে মুসলমান হওয়ার উপযুক্ত নয়। কেননা, সে ইসলামের সবচে' গুরুত্বপূর্ণ বিধান লঙ্ঘন করেছে। অনুরূপভাবে যে অপরকে মুখ অথবা হাত দ্বারা কষ্ট দেয়, সে যদিও 'কাফের' হয়ে যায় না; কিন্তু সে মুসলমান হওয়ারও উপযুক্ত থাকে না।

সামাজিকতার অর্থ

ইসলাম পাঁচ অধ্যায়ে বিভক্ত। (১) আকাঈদ বা ধর্মীয় বিশ্বাস, (২) ইবাদাত, (৩) মুআমালাত বা লেনদেন, (৪) আখলাক বা নীতি-চরিত্র, (৫) মু'আশারাত তথা সামাজিকতা।

আলোচ্য হাদীসটি মূলত ইসলামের এ পাঁচটি অধ্যায়ের মধ্য থেকে একটি অধ্যায় তথা সামাজিকতার ভিত্তিমূল। সামাজিকতার মর্মার্থ হলো, এ পৃথিবীতে কেউ একা নয়। একা থাকার নির্দেশও কাউকে দেয়া হয়নি। দুনিয়াতে বাস করতে হলে অপর মানুষের সঙ্গে তাকে সম্পর্ক রেখে চলতে হয়। বাসা-বাড়ি, বন্ধু-বান্ধব, পাড়া-প্রতিবেশী, দোকান-পাট ও কর্মস্থলের প্রয়োজনীয়তা প্রত্যেক মানুষের জীবনেই রয়েছে। কিন্তু প্রশ্ন হলো, অপরের সঙ্গে চলতে গেলে সে কিভাবে চলবে? কী ধরনের কর্মকৌশল সে গ্রহণ করবে? এর উত্তর যেখানে রয়েছে, তারই নাম সামাজিক বিধান। এটা ইসলামের এক পঞ্চমাংশ। অথচ আমাদের অজ্ঞতার কারণে ইসলামের এ গুরুত্বপূর্ণ অংশটি বর্তমানে অবহেলিত। একে ইসলামের অংশই মনে করা হয় না। এ ব্যাপারে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সা.) কর্তৃক বিধি-বিধানের কোনো মূল্য দেয়া হয় না।

সামাজিকতার বিধি-বিধানের গুরুত্ব

আল্লাহ তা'আলা সামাজিকতার বিধি-বিধানের বিবরণ দিয়েছেন অত্যন্ত গুরুত্বসহকারে। হযরত আশরাফ আলী থানভী (রহ.) বলতেন, আত্মশুদ্ধির লক্ষ্যে যারা আমার এখানে আসে, আমি যখন তাদেরকে কোনো আমলের কথা বলি, যেমন তাদেরকে যখন তাসবীহর আমলের নির্দেশ দিই, তখন যদি দেখি যে, এ আমলের বেলায় কেউ উদাসীনতা দেখাচ্ছে, যেমন দশ তাসবীহর স্থলে পাঁচ তাসবীহ পড়ছে, তখন তার জন্য আমি বিচলিত হই। কিন্তু যে লোকটির ব্যাপারে আমি জানতে পারি যে, সে সামাজিকতার বিষয়ে যত্নবান নয়, তখন তার প্রতি আমার ঘৃণা চলে আসে।

আগে মানুষ হও

তিনি আগে বলতেন, যদি তোমরা সূফী, আবেদ বা দরবেশ হতে চাও, তাহলে এখানে নয় বরং এর জন্য অন্যত্র চলে যাও। এগুলো বানানোর খানকাহর অভাব নেই। কিন্তু যদি মানুষ হতে চাও, তাহলে এখানে চলে আসো। কেননা, এখানে মানুষ বানানো হয়। মুসলমান, আলেম বা দরবেশ হওয়ার সাধনা তো অত্যন্ত উঁচু সাধনা। এর আগে মানুষ হও। জীব-জন্তুর কাতার থেকে বের হয়ে আগে নিজেকে মানুষ হিসেবে গড়ে তোলো। আর মানুষ ততক্ষণ পর্যন্ত 'মানুষ' হতে পারে না, যতক্ষণ না সে ইসলামের সামাজিক বিধি-বিধানের উপর আমল করে। এ সম্পর্কীয় শিষ্টাচার মেনে চললেই মানুষ 'মানুষ' হতে পারবে।

জন্তু তিন প্রকার

ইমাম গাযালী (রহ.) এহইয়াউ উলূম নামক গ্রন্থে লিখেছেন, জন্তু তিন প্রকার। প্রথমত যেগুলো মানুষকে শুধু উপকৃত করে, ক্ষতির ঘটনা তাদের দ্বারা ঘটে না। ঘটলেও একেবারে হাতেগোনা। যেমন– গরু, ছাগল ইত্যাদি। এগুলো মানুষকে দুধ দেয়। দুধ বন্ধ হয়ে গেলে মানুষ এগুলো জবাই করে খায়। সুতরাং নিজেদের প্রাণ দিয়ে হলেও এরা মানুষের উপকার করে। দ্বিতীয়ত, ওই সকল জন্তু, যেগুলো মানুষের শুধুই ক্ষতি করে। উপকার সাধারণত তারা করে না। যেমন, সাপ, বিচ্ছু ইত্যাদি। এগুলো মানুষ দেখলেই ছোবল মারে। তৃতীয়ত, ওই সকল জন্তু যেগুলো মানুষের উপকার করে না, ক্ষতিও করে না। যেমন বনশিয়াল, বাগডাশা ইত্যাদি। এগুলো মানুষের উপকার করে না, আবার ক্ষতিও করে না।

তারপর তিনি বলেন, হে মানুষ! তুমি পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। সকল জন্তুর চেয়ে তোমার মর্যাদা বেশি। তুমি যদি 'মানুষ' হতে না পার, তাহলে কমপক্ষে প্রথম শ্রেণীর জন্তু হও। অর্থাৎ গরু-ছাগলের মত মানুষের উপকারী হও। কারো ক্ষতি করো না। এও যদি না পার, তাহলে তৃতীয় শ্রেণীর জন্তু হও। কারো উপকার করো না, ক্ষতিও করো না। যদি তুমি দ্বিতীয় শ্রেণীর জন্তুর মত মানুষকে কষ্ট দাও, তাহলে তোমার মাঝে আর সাপ-বিচ্ছুর মাঝে কোনো পার্থক্য নেই।

আমি মানুষ দেখেছি

মুসলিম-অমুসলিমের পার্থক্য নির্ণয়ের আগে মানুষকে 'মানুষ' হিসাবে বিচার করো। দরবেশ ও সাধারণ মানুষের পার্থক্য এরও পরে করো। সর্বপ্রথম মানুষ বনে যাও। আর 'মানুষ' হতে হলে ইসলামের সামাজিক শিষ্টাচারকে আপন করে নিতে হবে। অপরের ক্ষতি না করা, ভাষা দ্বারা অপরকে আঘাত না করা, হাত দ্বারা কষ্ট না দেয়া এবং কর্মকাণ্ড দ্বারা অন্যের মনে কষ্ট না দেয়াই হলো ইসলামের শিক্ষা। এ শিক্ষা গ্রহণ কর।

একবার হযরত আশরাফ আলী থানভী (রহ.) অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে বললেন, নিজে তো খাঁটি মানুষ হতে পারিনি, তবে আলহামদুলিল্লাহ 'মানুষ' দেখার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। মানুষ কাকে বলে, আমি দেখেছি। কাজেই কোনো ষাঁড় এসে মানুষ দাবি করে আমাকে ধোঁকা দিয়ে বোকা বানাতে পারবে না। সুতরাং এখানে এসে মানুষ হতে চাইলে মানুষ হতে পারবে। অন্তত মানুষরূপী ষাঁড়ের ধোঁকা থেকে বেঁচে থাকতে পারবে।

অন্যকে বাঁচাও

নফল-মুসতাহাব আমল, যিকর ও তাসবীহ-তাহলীল আদায় করলে সাওয়াব পাবে, না করলে এগুলোর জন্য আখেরাতে জবাবদিহি করতে হবে না। হ্যাঁ, আখেরাতের মর্যাদা লাভের আশায় এগুলো অবশ্যই করতে হয়। তবে যদি অন্যকে কষ্ট দাও, তাহলে কবিরা গুনাহর ভাগী হবে। এর জন্য আখেরাতে তোমাকে জিজ্ঞেস করা হবে। এ কারণে কোনো সময় যদি নফল ইবাদত ও সামাজিক কোনো বিষয় একই সঙ্গে সামনে চলে আসে, তাহলে মাসআলা হলো, ওই মুহূর্তে নফল ছেড়ে দিতে হয় এবং অন্যকে অনিষ্টতা থেকে বাঁচানোর লক্ষ্যে সামাজিক কাজটি করে দিতে হয়।

জামাতে নামায পড়ার গুরুত্ব

মসজিদে গিয়ে নামাযের জামাতে শরীক হওয়ার প্রতি অশেষ গুরুত্ব পুরুষদেরকে দেয়া হয়েছে। এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, আমার মন চায়, অন্য কাউকে ইমাম বানিয়ে আমি প্রতিটি ঘরে গিয়ে খোঁজ নিই। তখন এ অভিযানে যাদেরকে দেখবো, জামাতে শরীক না হয়ে তারা ঘরে বসে আছে, তাদের ঘরগুলো আগুনে পুড়িয়ে দেব। এটা আমার মনের চাওয়া। কারণ, এরা আল্লাহর ফরয বিধান আদায়ে অলসতা দেখাচ্ছে।

এ হাদীস থেকেই নামাযের জামাতের গুরুত্ব কতটুকু, তা কিছুটা অনুমান করা যায়। কিছু কিছু ফকীহ নামাযের জামাতকে সুন্নাতে মুআক্কাদাহ বলেন। এছাড়া অবশিষ্ট সকল ফকিহই বলেছেন, জামাতে নামায পড়া ওয়াজিব। রাসূলুল্লাহ (সা.) নিজ আমলের মাধ্যমেও এর গুরুত্ব বুঝিয়েছেন। যখন তিনি

মৃত্যুশয্যায় শায়িত ছিলেন, তখনও তিনি অন্যের কাঁধে ভর করে জামাতে শরীক হয়েছেন। ওই সময় তিনি হযরত আবু বকর (রা.)-কে ইমামত করার নির্দেশ দিয়েছিলেন।

এমন ব্যক্তি মসজিদে আসতে পারে না

অথচ ফুকাহায়ে কেরামের সর্বসম্মত আরেকটি মাসআলা দেখুন। তাঁরা বলেছেন, কোনো ব্যক্তি যদি এমন কোনো অসুস্থতায় ভোগে, যার কারণে তার শরীর থেকে দুর্গন্ধ ছড়ায় এবং এতে অপর ব্যক্তির মাঝে ঘৃণার উদ্রেক হয়, তাহলে সে ব্যক্তির জন্য মসজিদে এসে জামাতের সঙ্গে নামায পড়া নাজায়েয। এ ব্যক্তির ক্ষেত্রে জামাতে নামায পড়ার বিধানটি কার্যকর নয়। এ ব্যক্তি জামাতে নামায পড়লে গুনাহগার হবে। এর কারণ হলো, এ ব্যক্তি জামাতে শরীক হওয়ার উদ্দেশ্যে মসজিদে গেলে অন্যরা কষ্ট পাবে।

দেখুন, জামাতের মত গুরুত্বপূর্ণ বিধান শুধু অন্যে কষ্ট পাবে দেখে এ ব্যক্তির রহিত হয়ে গেছে।

হাজ্‌রে আসওয়াদ চুমো দেয়ার সময় কষ্ট দেয়া

হাজ্‌রে আসওয়াদ একটি ফযীলতপূর্ণ পাথর। একে চুমো দেয়ার অনেক গুরুত্ব রয়েছে। বলা হয়েছে, হাজ্‌রে আসওয়াদকে চুমো দেয়া মানে আল্লাহর সঙ্গে মুসাফাহা করা। একে চুমো দিলে গুনাহগুলো ঝরে যায়। স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সা.) একে চুমো দিয়েছেন। সাহাবায়ে কেরামও দিয়েছেন। কিন্তু অপরদিকে এই হাজ্‌রে আসওয়াদকে চুমো দিতে গিয়ে যদি অপরকে কষ্ট দেয়ার আশঙ্কা থাকে, যেমন যদি ধাক্কাধাক্কির আশঙ্কা থাকে, তখন এ ফযীলতপূর্ণ কাজটিও গুনাহর কাজ হয়ে যায়। কারণ, এমন আশঙ্কা থাকলে একে চুমো দেয়ার চেষ্টা করা শুধু নাজায়েযই নয়, বরং গুনাহও।

দেখুন, ইসলামী শরীয়ত অপরকে কষ্ট না দেয়ার প্রতি কত গুরুত্ব দিয়েছে। সুতরাং নফল কিংবা মুসতাহাব আমল করতে গিয়ে অপরকে কষ্ট দেয়া কিভাবে জায়েয হতে পারে?

উচ্চৈঃস্বরে তেলাওয়াত করা

যেমন কুরআন মজীদ তেলাওয়াত করা একটি ইবাদত। প্রতি হরফে দশ নেকি পাওয়া যায়, এটি এমনই একটি ফযীলতপূর্ণ আমল। এ যেন শুধু আমল

নয়; বরং নেকির ভাণ্ডার জমা করার জন্য এক প্রকার উত্তম পন্থা। হাদীস শরীফে এসেছে, সর্বোত্তম যিকির হলো কুরআন তেলাওয়াত করা। আর উত্তম হলো, উচ্চৈঃস্বরে তেলাওয়াত করা। নিম্নস্বরে তেলাওয়াত করার চেয়ে উচ্চৈঃস্বরে তেলাওয়াতের মধ্যে সাওয়াব বেশি রয়েছে। কিন্তু তেলাওয়াতের কারণে যদি অন্যের ঘুমের ব্যাঘাত ঘটে কিংবা অসুস্থ ব্যক্তি বা অন্য কোনো ব্যক্তি কষ্ট পায়, তাহলে উচ্চৈঃস্বরে তেলাওয়াত করা নাজায়েয।

তাহাজ্জুদের সময় রাসূলুল্লাহ (সা.) যেভাবে জাগ্রত হতেন

রাসূলুল্লাহ (সা.) গোটা জীবন তাহাজ্জুদ নামায পড়েছেন। আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সা.) আমাদের জন্য সহজ পথ পেশ করেছেন। আমাদের জন্য তাহাজ্জুদের নামাযকে ওয়াজিব করা হয়নি। অন্যথায় রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর জন্য তাহাজ্জুদ নামায ওয়াজিব ছিল। তাই তিনি জীবনে কখনও তাহাজ্জুদ নামায কাযা করেননি। হাদীস শরীফে এসেছে, যখন তিনি তাহাজ্জুদের নামাযের জন্য জাগ্রত হতেন, তখন অত্যন্ত সন্তর্পণে উঠতেন। ধীরে-ধীরে দরজা খুলতেন, যেন তাঁর এ আমলটির কারণে তাঁর স্ত্রী কষ্ট না পান। এর কারণে যেন স্ত্রীর ঘুম না ভাঙ্গে। এজন্য এত সতর্কতা।

মানুষের চলার পথে নামায পড়া

যে স্থান দিয়ে মানুষ আসা-যাওয়া করে, এমন স্থানে নামায পড়ার উদ্দেশ্যে দাঁড়ানো জায়েয নেই। অনেকে এ বিষয়টির প্রতি মোটেও খেয়াল করে না। পুরো মসজিদ খালি, অথচ সে পেছনের কাতারে গিয়ে নামাযের জন্য দাঁড়িয়ে যায়। ফলে কেউ যেতে চাইলে হয়ত তার সামনে দিয়ে যেতে হয় এবং এর কারণে গুনাহের ভাগী হতে হয়। অন্যথায় অনেকটুকু ঘুরে তারপর তাকে যেতে হয়। এমন জায়গাতে নামায পড়া নাজায়ে ও গুনাহ।

মুসলিম ও শান্তি

মুসলিম শব্দটির মধ্যেই 'শান্তি'র অর্থ রয়েছে। কেননা, শব্দটির ধাতুমূল হলো, সীন, লাম, মীম। 'সালামাত' শব্দও মূলধাতু এ থেকে উদ্ভূত। মূলত এর মাধ্যমে এ দিকে ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে যে, মুসলিম' শব্দটির মাঝেই শান্তির কথা রয়েছে।

আসসালামু আলাইকুম এর মর্মার্থ

প্রত্যেক জাতি-ই সাক্ষাতের শিষ্টাচার মেনে চলে। একে অপরের সঙ্গে দেখা হলে হ্যালো, গুডমর্নিং, নমস্কার, আদাব ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করে। ইসলামেও এ বিষয়ে নির্দিষ্ট শিক্ষা ও শিষ্টাচার রয়েছে। অপরাপর জাতির মত এক-দু'টা শব্দ ছুঁড়ে দেয়ার শিক্ষা ইসলাম দেয়নি। বরং এক্ষেত্রে ইসলামের শিক্ষা মূলত অন্যান্য জাতির সংস্কৃতি থেকে আরও অনেক উন্নত, প্রাণসম্পন্ন, অর্থবহ, সমৃদ্ধ ও স্বতন্ত্র। এ ক্ষেত্রে ইসলামের শিক্ষা হলো, এক মুসলমান অপর মুসলমানের সঙ্গে দেখা হলে বলবে- আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। যার মর্মার্থ হলো, তোমার উপর শান্তি, রহমত ও বরকত বর্ষিত হোক। সুতরাং এরই মাধ্যমে মূলত এক মুসলমান অপর মুসলমানের জন্য তিনটি দুআ করে। এক. শান্তির দু'আ, দুই. রহমতের দুআ, তিন. বরকতের দু'আ। একবার যদি এ দু'আগুলো কবুল হয়, তাহলে সমূহ কলুষতা আমাদের অন্তর থেকে দূর হয়ে যাবে এবং দুনিয়া ও আখেরাতের মুক্তি ও সফলতা পদচুম্বন করবে।

মূলত সালামের এ শিক্ষার মাঝে আরেকটি তাৎপর্যও রয়েছে। তাহলো, এর মাধ্যমে একজন মুসলমান অপর মুসলমানকে শান্তির বার্তা শোনায়। আমার পক্ষ থেকে তুমি নিরাপদ ও শঙ্কামুক্ত। তোমাকে আমি কোনো প্রকার কষ্ট দেব না- এটাই হলো শান্তির বার্তা।

যবান দ্বারা কষ্ট না দেয়ার অর্থ

আলোচ্য হাদীসে শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে দু'টি- এক. مِنْ لِسَانِه দুই. وَيَدِه অর্থাৎ- অপর মুসলমান দু'টি জিনিস থেকে নিরাপদে থাকবে। প্রথমত যবান থেকে , দ্বিতীয়ত, হাত থেকে। যবান থেকে নিরাপদ থাকার অর্থ হলো, অপর মুসলমানকে এমন কথা বলা যাবে না, যার কারণে সে কষ্ট পাবে। একান্ত প্রয়োজনে কারো মনের বিরুদ্ধে কথা বলতে হলে এমনভাবে বলতে হবে, যেন সে কষ্ট না পায়। যেমন এভাবে বলা যেতে পারে- আপনার কথাটা আমার ভালো লাগেনি। বিষয়টা আরেকটু বিবেচনা করে দেখুন। আপনার কথাটি শরীয়তের পরিপন্থী। ইত্যাদি।

মূলত মুখের আঘাতই বড় আঘাত। আরব কবির ভাষায়-

جَرَاحَاتُ السِّنَانِ لَهَا الْتِيَامُ
وَلاَ يَلْتَامُ مَاجَرَحَ اللِّسَانُ

তীরের আঘাতের উপশম আছে, কিন্তু যবানের আঘাতের কোনো উপশম নেই।

এ মর্মে কুরআন মজীদে ইরশাদ হয়েছে-

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَقُوْلُوْا قَوْلاً سَدِيْدًا -

হে ঈমানদারগণ! আল্লাহকে ভয় করো এবং সঠিক কথা বলো।

-(সূরা আহযাব : ৭০)

রসিকতা করেও কাউকে কষ্ট দেয়া যাবে না। অথচ বর্তমানে এটাকে একপ্রকার শিল্প মনে করা হয়। রসিকতার নামে অপরকে কষ্ট দেয়াকে কিছুই মনে করা হয় না। বরং এ জাতীয় লোককে মানুষ বলে থাকে যে, অমুক বড় রসিক মানুষ।

শাইখুল হিন্দ (রহ.)-এর একটি ঘটনা

শাইখুল হিন্দ মাহমূদ হাসান দেওবন্দী (রহ.)-এর রচিত একটি কিতাবের জবাব লিখেছিল জনৈক ব্যক্তি। লোকটি তার জবাবী কিতাবে হযরত শাইখুল হিন্দ (রহ.)-কে 'কাফের' ফতওয়া দিলো। এতে হযরত শাইখুল হিন্দ (রহ.)-এর এক ভক্ত খুব ক্ষিপ্ত হলেন এবং তাঁর পক্ষ থেকে লোকটিকে উদ্দেশ্য করে ফারসী দু'টি শে'র লিখলেন। সাহিত্যের মানদণ্ডে শে'র দু'টি ছিলো খুবই উন্নত। শে'র দুটি এই-

مرا کافر گر گفتی غمے نیست
چراغ کذب را نبود فروغے
مسلمانت بخوانم در جوابش
دروغے را جزا باشد دروغے

তুমি আমাকে 'কাফের' বলেছ, আমি তাতে চিন্তিত নই। কারণ, মিথ্যার চেরাগ কখনও জ্বলে না।

আমি এর জবাবে তোমাকে 'মুসলমান' বলছি। কেননা, মিথ্যার প্রতিদান মিথ্যা দিয়েই হয়।

অর্থাৎ- তুমি আমাকে 'কাফের' বলে মিথ্যা বলেছ। এর জবাবে আমি তোমাকে 'মুসলমান' বলে মিথ্যা বললাম। কারণ, তুমি তো মুসলমান নও।

সাহিত্যের প্রতি যার আকর্ষণ আছে, তাকে শে'র দুটি শোনান, দেখবেন, সে বলবে, বড় চমৎকার হয়েছে। কারণ, দ্বিতীয় শে'রের প্রথম লাইনে লোকটিকে মুসলমান বলা হলেও দ্বিতীয় লাইনে তা সম্পূর্ণ উল্টে দেয়া হয়েছে।

কিন্তু শে'র দু'টি যখন শাইখুল হিন্দ (রহ.) এর কাছে উপস্থাপন করা হলো, তিনি মন্তব্য করলেন, এটা ঠিক হয়নি। এর মধ্যে অপরকে তিরস্কার করা হয়েছে এবং তা করা হয়েছে অত্যন্ত কৌশলে। এটা আমাদের নীতির পরিপন্থী। তারপর তিনি নিজেই শে'র দুটি সম্পাদনা করে দিলেন এবং আরেকটি শে'র সংযোজন করে লিখলেন–

مرا کافر گر گفتی غمے نیست
چراغ کذب را نبود فروغے
مسلمانت بخوانم در جوابش
دهم شکر بجائے تلخ دوغے
اگر تو مؤمنی فبہا والا
دروغے را جزا باشد دروغے

তুমি আমাকে কাফের বলেছ, এতে আমি চিন্তিত নই। কেননা, মিথ্যার চেরাগ কখনও জ্বলে না। এর জবাবে আমি তোমাকে 'মুসলমান বলছি, তেতো অসুধের পরিবর্তে তোমাকে মিষ্টান্ন খাওয়াচ্ছি। যদি তুমি মুমিন হও, তাহলে তো ভালো। অন্যথায় মিথ্যার প্রতিদান মিথ্যাই হয়ে থাকে।

দেখুন, লোকটি শাইখুল হিন্দ (রহ.)-কে কাফের বললো, জাহান্নামী সাব্যস্ত করলো, কিন্তু এর প্রতিবাদ করতে গিয়ে তিনি সীমালঙ্ঘন করেননি। কারণ, তিনি জানতেন, আল্লাহর দরবারে প্রতিটি কথা রেকর্ড হয়ে যায়, কেয়ামতের দিন প্রতিটি কথার হিসাব তাঁর কাছে দিতেই হবে।

ভাষার ছোবল ও একটি ঘটনা

হযরত মুফতী শফী (রহ.) বলতেন, অনেকের কথায় 'বিষ' থাকে। এ জাতীয় লোক অপরকে ছোবল মারে ভাষার মাধ্যমে। তারপর তিনি একটি ঘটনা শোনান–

এক ব্যক্তি বাসায় গিয়ে দেখল, তার বউ ক্ষেপে আছে এবং শাশুড়িকে অকথ্য ভাষায় বকাঝকা করছে। আর শাশুড়ি চুপ করে বসে আছেন। লোকটি তার মাকে জিজ্ঞেস করলো, কি ব্যাপার, কী হয়েছে? মা উত্তর দিলেন, কিছু হয়নি। আমি তাকে শুধু দু'টি কথা বলেছিলাম। তাতেই সে আমার উপর ক্ষেপে গেল। এখন তার নাচ দেখে কে! লোকটি জিজ্ঞেস করলো, ওই দু'টি কথা কী বলেছিলেন? তার মা উত্তর দিলেন, আমি তাকে শুধু এটুকু বলেছিলাম যে, তোর বাপ গোলাম আর তোর মা বাঁদী। ব্যস! আর কিছুই বলিনি। আর এতেই এরকম তুলকালাম কাণ্ড শুরু করে দিল। মনে হয় বাড়িটা নামিয়ে ফেলবে।

দেখুন, দু'টি কথা! কিন্তু এ তো কথা নয়; বরং বিষ, যা বউয়ের শরীরে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। এরূপ বিষমিশ্রিত কথা না বলা উচিত। বর্তমানে এর কারণে কত পরিবার যে ভাঙ্গছে, তার হিসাব নেই।

আগে ভাবো, তারপর বলো

বলার আগে ভাবো যে, আমার কথাটার প্রতিক্রিয়া কেমন হবে? আমি যে কথাটি বলতে চাই, সে কথাটিই আমাকে বলা হলে আমার কাছে কেমন লাগবে? ভালো লাগবে, না খারাপ লাগবে? কারণ, রাসূলুল্লাহ (সা.) আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন যে–

اَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ – (ترمذی ، کتاب الزهد)

অর্থাৎ– নিজের কাছে যা ভালো লাগে, অপরের জন্যও তা-ই পছন্দ করো। মূলত এ শিক্ষার বাস্তবায়ন ঘটলে সমাজে কোনো ফ্যাসাদ থাকে না।

যবান এক মহা নেয়ামত

যবান আল্লাহর দান। ভাষা আল্লাহর অনেক বড় নেয়ামত। চাওয়া ছাড়াই তিনি কথা বলার এ মেশিন আমাদেরকে দান করেছেন। এ এক সরকারি মেশিন– অটোমেটিক মেশিন। মনে কিছু একটা জাগলেই সে বলতে শুরু করে। 'আল্লাহ না করুন' যদি যবান তার কাজ বন্ধ করে দেয়, বলার শত ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও যদি বাকশক্তি নিঃশেষ হয়ে যায়– তখন কী মারাত্মক অবস্থা দেখা দেবে? বলতে না পারার ব্যথা তাকে কুরে-কুরে খাবে। অথচ এ মহান নেয়ামতের কদর আমাদের কাছে নেই। যা মন চায়, তা-ই বলে ফেলি। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত শুধু বলতেই থাকি। কী বলছি, তা কখনও ভাবি না। এটা ঠিক নয়। বরং প্রথমে ভাবতে হবে, তারপর বলতে হবে। ভাবনা ছাড়া যবানের লাগামহীন ব্যবহার

মানুষকে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যায়। আর যবানের সঠিক ব্যবহার জান্নাতের পথ সুগম করে।

ভেবে-চিন্তে কথা বলার অভ্যাস গড়তে হবে

এক হাদীসে এসেছে, 'অনেক মানুষ যবানের কারণে জাহান্নামে যাবে।' কাজেই প্রথমে চিন্তা-ভাবনা করো। ভালো-মন্দ বিচার করো। ওজন করো–তারপর কথা বলো। এর দ্বারা উদ্দেশ্য এটা নয় যে, কোনো কথা মুখ থেকে বের করার পূর্বে অন্তত পাঁচ মিনিট ভাবতে হবে। এতে তো অনেক সময় ব্যয় হয়ে যাবে। আসলে প্রথম প্রথম ব্যাপারটা একটু কঠিন মনে হতে পারে। কিন্তু অভ্যাস হয়ে গেলে একেবারে সহজ হয়ে যাবে। একপর্যায়ে ভেবে-চিন্তে কথা বলতে গেলে বেশি সময় লাগবে না। এক মুহূর্তের মধ্যে সিদ্ধান্ত নিতে পারবে যে, কথাটি কী বলা উচিত। এভাবে এক সময় দেখা যাবে যে, আল্লাহ তাআলা যবানের মধ্যেই প্রয়োজনীয় কথা বলার এবং অপ্রয়োজনীয় কথা ছাড়ার চমৎকার যোগ্যতা দান করে দেবেন।

হযরত থানভী (রহ.)-এর একটি ঘটনা

নিয়াজ ভাই। হাকীমুল উম্মত হযরত আশরাফ আলী থানভী (রহ.)-এর দরবারে তাঁকে এ নামেই ডাকা হতো। খানকাহর সকলের জন্যই তিনি ছিলেন নিয়াজ ভাই। থানভী (রহ.)-এর খাদেম। থানভী (রহ.)-এর খানকার ব্যবস্থাপনার কাজটাও তিনি দেখতেন। খানকাহর নির্দিষ্ট নিয়ম-নীতি ছিলো। তাই অনেক সময় দেখা যেতো, কেউ কোনো নিয়ম লঙ্ঘন করলে তাকে তিনি বলতেন, ভাই! এমনটি নয়, বরং এমনটি করো। এতেই একবার এক ব্যক্তি মনে কষ্ট নিলো এবং সে হযরত থানভী (রহ.)-এর কাছে গিয়ে অভিযোগ করলো যে, নিয়াজ ভাই মানুষের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করে। থানভী (রহ.) নিয়াজ ভাইকে ডাকলেন এবং ধমকালেন। বললেন, নিয়াজ! তুমি মানুষের সঙ্গে দুর্ব্যবহার কর কেন? মানুষের সঙ্গে কেন ধমকের সুরে কথা বল?

উত্তরে নিয়াজ ভাই বললেন, "হযরত! মিথ্যা বলবেন না। আল্লাহকে ভয় করুন।' আসলে নিয়াজ ভাই কথাটা হযরতকে বলেননি; বরং তাঁর উদ্দেশ্য ছিল, যে বা যারা আপনার কাছে আমার বিরুদ্ধ অভিযোগ করেছে, তাদের উচিত আল্লাহকে ভয় করা এবং মিথ্যা না বলা।

হযরত থানভী (রহ.) নিয়াজ ভাই -এর মুখে একথা শুনে সঙ্গে-সঙ্গে মাথাটা নামিয়ে নিলেন এবং 'আসতাগফিরুল্লাহ' বলতে বলতে সেখান থেকে চলে গেলেন। উপস্থিত লোকজন তো একেবারে হতভম্ব হয়ে গেলো। একজন নগণ্য খাদেম হযরতকে এমন কথা বলতে পারল!

কিন্তু পরবর্তী সময়ে হযরত নিজেই এর ব্যাখ্যা দিলেন এভাবে যে, আসলে ভুলটা ছিল আমার। আমি এক পক্ষের কথা শুনে তাকে শাসানো শুরু করেছি। আমার উচিত ছিল, প্রথমে তাকে জিজ্ঞেস করা যে, তোমার বিরুদ্ধে মানুষ এ অভিযোগ করে, এটা সঠিক কি-না? আমার কাজটি শরীয়ত পরিপন্থী হয়ে গেল। নিয়াজ আমাকে সেই ভুলটি ধরিয়ে দিয়েছে, তাই আমি তাওবা করতে-করতে সেখান থেকে চলে এসেছি।

অমুসলিমকে কষ্ট দেয়া নাজায়েয

আলোচ্য হাদীসের বাহ্যিক শব্দমালা দেখে একথা বলা যাবে না যে, হাদীসটি তো শুধু মুসলমানকে কষ্ট না দেয়ার কথা বলা হয়েছে। অমুসলিমকে কষ্ট দেয়ার কথা এখানে বলা হয়নি। সুতরাং অমুসলিমকে কষ্ট দেয়া যাবে।

এ কথা সঠিক নয়। কেননা, হাদীসটিতে মুসলমানের কথা বিশেষভাবে এজন্য বলা হয়েছে যে, একজন মুসলমান সাধারণত মুসলিম অধ্যুষিত এলাকাতেই বসবাস করে। তাই তার ওঠা-বসাও সাধারণত মুসলমানদের সঙ্গেই হয়। এজন্য মুসলমানের কথা এসেছে। অন্যথায় বিধানটি মুসলিম-অমুসলিম সকলের জন্যই প্রযোজ্য। সাধারণ অবস্থায় একজন অমুসলিমকে কষ্ট দেয়া হারাম। তবে জিহাদের অবস্থার বিধান ভিন্ন। যেহেতু জিহাদের মুখ্য উদ্দেশ্য হলো, কাফেরদের শান-শওকত ভেঙ্গে দেয়া। তাই ওই সময়ে তাদেরকে কষ্ট দিতেই হয়। জিহাদের অবস্থার বিধান আর সাধারণ অবস্থার বিধান এক নয়। সাধারণ অবস্থায় অমুসলিমকে কষ্ট দেয়া হারাম। পক্ষান্তরে জিহাদের সময় তা জায়েয।

নাজায়েয হওয়ার প্রমাণ

এর প্রমাণ হল, হযরত মূসা (আ.)-এর ঘটনা। ঘটনাটি ঘটেছিল ফেরাউনের শাসনামলে। তখন তিনি মিসরে থাকতেন। গোটা জাতি তখন কুফর ও গোমরাহির মাঝে আকণ্ঠ ডুবে ছিল। সে সময় এক ইসরাঈলী ও কিবতির মাঝে ঝগড়া হলো। মূসা (আ.) কিবতিকে তখন একটি থাপ্পড় মেরেছিলেন। ফলে

কিবতি লোকটি মারা গেল। কিবতি ছিল কাফের। কিন্তু হযরত মূসা (আ.) নিজের এ ঘটনাটি একটি অপরাধ হিসেবে প্রকাশ করে বললেন–

وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُوْنِ –

অর্থাৎ– আমার পক্ষ থেকে তাদের উপর একটি 'অপরাধ' হয়ে গিয়েছে। ফলে আমি আশঙ্কা করছি যে, তাদের ওখানে গেলে তারা আমাকে হত্যা করে ফেলবে। –(সূরা আশ শো'আরা : ১৪)

হযরত মূসা (আ.) ওই কাফেরকে হত্যা করেছেন– এ বিষয়টি তিনি 'গুনাহ' শব্দ দিয়ে বর্ণনা করেছেন। এখন প্রশ্ন হতে পারে, সে তো ছিল কাফের। আর কাফেরকে হত্যা করা তো জিহাদের অংশ। এরপরও মূসা (আ.) কাজটিকে 'গুনাহ' বললেন কেন?

এর উত্তর হলো, কিবতি লোকটি যদিও কাফের ছিল, কিন্তু তখন ছিল নিরাপত্তার অবস্থা। আর মুসলমান ও কাফেররা যদি একসঙ্গে বসবাস করে, অবস্থাটা তখন যদি নিরাপত্তার অবস্থা হয়, তাহলে পার্থিব বিষয়ে মুসলমান ও কাফেরের অধিকার সমান হয়। তখন যেমনিভাবে একজন মুসলমানকে কষ্ট দেয়া নাজায়েয, অনুরূপভাবে একজন কাফেরকেও কষ্ট দেয়া হারাম। কারণ, এটা মানবাধিকার। আর মানুষের প্রথম কর্তব্য হলো, মানবাধিকারের প্রতি লক্ষ্য রাখা।

(উল্লেখ্য, কোনো নবী গুনাহ করেননি। কিন্তু হযরত মূসা (আ.) এখানে গুনাহ শব্দ উল্লেখ করার পেছনে মূলত নিজের বিনয় প্রকাশ করা উদ্দেশ্য ছিল)।

অঙ্গীকার ভঙ্গ করা ও যবান দ্বারা কষ্ট দেয়া

অনেক কাজ সম্পর্কে মানুষের ধারণা হলো, এটা যবান দ্বারা কষ্ট দেয়ার অন্তর্ভুক্ত নয়। অথচ এ ধারণা সঠিক নয়। যেমন– ওয়াদা খেলাফ করা। অমুক সময় আমি আসবো বা অমুক সময় আমি কাজটি করে দেবো– এ জাতীয় ওয়াদা আপনি কারো সঙ্গে করলেন, অথচ কাজটি সময় মতো করলেন না বা আপনি গেলেন না। ফলে ওই লোক কষ্ট পেল। তাহলে এর দ্বারা যেমনিভাবে ওয়াদা খেলাফ করার গুনাহ হয়েছে, তেমনিভাবে যবান দ্বারা অপরকে কষ্ট দেয়ার গুনাহও হয়েছে।

কুরআন তেলাওয়াতের সময় সালাম দেয়া

সালাম দেয়া একটি ফযীলতপূর্ণ আমল। কিন্তু ইসলাম অপরকে কষ্ট দেয়ার বিষয়টিকে এতই গুরুত্ব দিয়েছে যে, সালামের বিধানের মধ্যে বলা হয়েছে, সব

সময় সালাম দেয়া জায়েয নেই। বরং অনেক ক্ষেত্রে সাওয়াবের স্থলে গুনাহ হয়ে যায়। যেমন এক ব্যক্তি তেলাওয়াতরত অবস্থায় রয়েছে। তখন ওই ব্যক্তিকে সালাম দেয়া যাবে না। কারণ, তোমার সালামের ফলে একদিকে তার তেলাওয়াতে ব্যাঘাত ঘটবে। অপরদিকে তেলাওয়াত ছেড়ে তোমার সঙ্গে কথা বলার কষ্ট তাকে করতে হবে। কাজেই এ মুহূর্তে সালাম দেয়া মানে যবানের মাধ্যমে তাকে কষ্টে ফেলে দেয়া। তাই তেলাওয়াতরত ব্যক্তিকে সালাম দেয়া নাজায়েয। অনুরূপভাবে কেউ আল্লাহর যিকিরে থাকলে তাকেও সালাম দেয়া যাবে না।

মজলিস চলাকালে সালাম দেয়া

ফুকাহায়ে কেরাম লিখেছেন, যদি কেউ মজলিসে কথা বলার মাঝে ব্যস্ত থাকে, চাই তা দুনিয়াবী মজলিস হোক বা আখেরাতের মজলিস হোক, তখন তাকে সালাম দেয়া নাজায়েয। কারণ, তখন বক্তার কথার মাঝে ব্যাঘাত ঘটে আর তাতে সে কষ্ট পায়।

খাওয়ার সময় সালাম দেয়া

এক ব্যক্তি খাচ্ছে, তখন তাকেও সালাম দেয়া যাবে না। তখন সালাম দেয়া হারাম নয়, তবে মাকরূহ। কারণ, এতে সে কষ্ট পায়। অনুরূপভাবে কেউ হয়ত তাড়াহুড়ো করে কোথাও যাচ্ছে, তখন আপনি তাকে সালাম দিয়ে মুসাফাহার জন্য হাত বাড়িয়ে দিলেন, তাহলে মুসাফাহা যদিও সওয়াবের কাজ, কিন্তু এ ক্ষেত্রে অপর ব্যক্তি কষ্ট পাওয়ার কারণে গুনাহর কাজ হয়ে গেল।

মোটকথা, কেউ যদি কোনো কাজে ব্যস্ত থাকে, আর সালামের কারণে যদি সেই কাজে বিঘ্ন ঘটার আশঙ্কা থাকে, এমতাবস্থায় সালাম না দেয়া উচিত।

টেলিফোনে দীর্ঘ কথা বলা

আব্বাজান বলতেন, এখন তো মানুষকে কষ্ট দেয়ার একটা যন্ত্রও আবিষ্কার হয়েছে। টেলিফোন। 'যত পার কষ্ট দাও' মার্কা যন্ত্র এটি। যেমন আপনি কাউকে ফোন করে দীর্ঘ আলাপ শুরু করে দিলেন। একটুও খেয়াল করলেন না যে, লোকটা গুরুত্বপূর্ণ কোনো কাজে আছে কিনা?

এজন্য আব্বাজান তাফসীরে মাআরিফুল কুরআনে সূরা নূরের তাফসীরে বিষয়টি সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন। সেখানে তিনি টেলিফোনের আদব সম্পর্কে উল্লেখ করতে গিয়ে লিখেছেন, এ ক্ষেত্রে একটি আদব হল, আপনি

কারো সঙ্গে যদি ফোনের মাধ্যমে দীর্ঘ আলাপ করতে চান, তাহলে ফোন করে প্রথমেই অনুমতি নিয়ে নেবেন যে, আপনার সঙ্গে আমার চার-পাঁচ মিনিটের আলাপ আছে, এখন বলা সম্ভব হবে কিনা? যদি না হয়, তাহলে আপনার সুবিধামতো একটা সময় বলে দিন, আমি তখন ফোন করব। আব্বাজান নিজেও এর উপর আমল করতেন।

বাইরে মাইক লাগিয়ে ওয়াজ করা

অথবা যেমন আপনি মসজিদে কিছুসংখ্যক মানুষকে ওয়াজ করতে চাচ্ছেন। এরজন্য মসজিদের ভেতরে মাইক চালু রাখলেই যথেষ্ট। কিন্তু আপনি বাইরের মাইকও চালু করে দিলেন, যার ফলে গোটা এলাকায় আপনার আওয়াজ পৌঁছে যাচ্ছে। এমনও হতে পারে, কেউ হয়ত তেলাওয়াতে মত্ত, কেউ হয়ত যিকিরে মগ্ন, কেউ হয়ত ঘুমানোর প্রস্তুতি নিচ্ছে বা অসুস্থ ব্যক্তিও থাকতে পারে, যার আরাম প্রয়োজন। অথচ আপনি জবরদস্তিমূলক গোটা এলাকায় আওয়াজ পৌঁছে দিচ্ছেন। এটাও যবানের মাধ্যমে কষ্ট দেয়ার অন্তর্ভুক্ত।

হযরত উমর (রা.)-এর ঘটনা

হযরত উমর (রা.)-এর আমলের ঘটনা। একজন বক্তা হযরত আয়েশা (রা.)-এর গৃহের ঠিক সম্মুখে অত্যন্ত উঁচু আওয়াজে ওয়াজ করতেন। সে যুগে যে মাইক ছিলো না, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু তার আওয়াজ ছিল খুব উঁচু। ফলে হযরত আয়েশা (রা.)-এর একাগ্রতায় বিঘ্ন ঘটতো। হযরত আয়েশা (রা.) হযরত উমর (রা.)-এর নিকট অভিযোগ করেন যে, এ ব্যক্তি উচ্চৈঃস্বরে আমার ঘরের সম্মুখে ওয়াজ করে, এতে আমার কষ্ট হয়। আপনি তাকে বলুন, সে যেন অন্য কোথাও গিয়ে ওয়াজ করে অথবা নিম্নস্বরে ওয়াজ করে। হযরত উমর (রা.) লোকটিকে ডেকে পাঠালেন এবং বোঝালেন যে, তোমার ওয়াজে উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রা.)-এর কষ্ট হয়। ওয়াজ করবে তো এখানে নয়; বরং অন্য জায়গায় গিয়ে করো। কিন্তু কিছুদিন পর দেখা গেল, লোকটি পুনরায় সেখানে ওয়াজ করা শুরু করে দিল। হযরত উমর (রা.) জানতে পেরে তাকে পুনরায় ডেকে আনলেন এবং বললেন, আমি তোমাকে শেষবারের মতো বলে দিচ্ছি, ভবিষ্যতে যদি এখানে এসে ওয়াজ কর, তাহলে আমার এ ছড়ি তোমার উপর দিয়ে উড়াবো। অর্থাৎ তোমাকে কঠিন শাস্তি দেব।

–(আখবারুল মদীনা ৫/১৬)

আমাদের অবস্থা

অথচ আমাদের অবস্থা হলো, আমরা দ্বীনের নামে অন্যকে কষ্ট দিচ্ছি। ওয়াজ-মাহফিলে এত জোরে মাইক ব্যবহার করছি যে, অপরের কানে তালা লাগানোর মত অবস্থা সৃষ্টি করছি। অথচ একজন আলেমের শিষ্টাচার সম্পর্কে কিতাবে এসেছে যে–

يَنْبَغِىْ لِلْعَالِمِ اَنْ لاَ يَعْدُوْصَوْتَهُ مَجْلِسَهُ –

'আলেমের উচিত তার শব্দ যেন তার মজলিস অতিক্রম না করে।'

–(আদাবুল ইসলা ওয়াল ইসতিমলা' পৃ. ৫)

মূলত এটাই হলো ইসলামের শিষ্টাচার। যবান দ্বারা যিকির করবে, সত্য কথা বলবে, অপরের সঙ্গে কোমল আচরণ করবে। এজন্যই আল্লাহ যবান দিয়েছেন। অপরকে কষ্ট দেয়ার জন্য আল্লাহ যবান দান করেননি।

ওই নারী জাহান্নামী

হাদীস শরীফে এসেছে, একবার রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে এমন এক নারী সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলো, যে সারাদিন রোযা রাখতো এবং সারারাত ইবাদত করতো। কিন্তু প্রতিবেশীকে কষ্ট দিতো। রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, ওই নারী জাহান্নামী।

হাদীসটির ব্যাখ্যায় হযরত আশরাফ আলী থানভী (রহ.) বলেন, এ হাদীসে অপরকে অন্যায়ভাবে কষ্ট দেয়ার নিন্দাবাদ করা হয়েছে এবং এর মাধ্যমে ইসলামের লেনদেন ও সামাজিক শিষ্টাচারকে ইবাদতের উপর প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ– মানুষের সঙ্গে সুন্দর আচরণ করার বিষয়টি ইবাদতের চেয়ে অধিক গুরুত্বপূর্ণ। তারপর তিনি বললেন, অথচ এ বিষয়টি আজ আমাদের সমাজে অবহেলিত। মানুষ আজ এ বিষয় সম্পর্কে শিখেও না, শেখায়ও না। বরং একে দ্বীনের অংশই মনে করে না।

হাত দ্বারা কষ্ট দেয়া নিষেধ

আলোচ্য হাদীসে হাতের মাধ্যমে কষ্ট না দেয়ার কথাও বলা হয়েছে। অপরকে হাতের মাধ্যমে মারধর করাকে তো আমরা এ নিষেধের অন্তর্ভুক্ত মনে করি। কিন্তু এ ছাড়াও এমন কিছু বিষয় রয়েছে, যেগুলো এ নিষেধের অন্তর্ভুক্ত। অথচ আমরা সেগুলোকে এ নিষেধের অন্তর্ভুক্ত মনে করি না। হাদীস শরীফে 'হাত' শব্দ বলা হয়েছে, এর দ্বারা হাত থেকে প্রকাশিত সকল কাজই উক্ত নিষেধের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গিয়েছে। নিম্নে এর কয়েকটি উদাহরণ পেশ করা হলো।

কোনো জিনিসকে যথাস্থানে না রাখা

যেমন কয়েকজন একসঙ্গে এক জায়গায় থাকে। ওখানে অনেক জিনিস এমন রয়েছে, যেগুলো সকলেই ব্যবহার করতে হয় এবং যেগুলো রাখার জন্য স্থান নির্দিষ্ট রয়েছে। যেমন গামছা। মনে করুন, যৌথভাবে সকলেই একটি গামছা ব্যবহার করে, এটা রাখার একটি নির্দিষ্ট স্থান আছে। কিন্তু আপনি ব্যবহারের পর সেই স্থানে রাখলেন না; বরং অন্য কোথাও রাখলেন। ফলে আরেকজন এসে অযু করার পর গামছাটা পেল না। এজন্য সে এখানে সেখানে খোঁজাখুঁজি করল। এতে তার কষ্ট হল। তাহলে এটাও হাত দ্বারা কষ্ট দেওয়ার অন্তর্ভুক্ত হবে। সুতরাং কাজটি আপনার জন্য না-জায়েয হলো। অনুরূপভাবে যৌথ সাবান, যৌথ প্লেট, গ্লাস বা লোটা ইত্যাদির একই বিধান।

এটা কবীরা গোনাহ

আমরা যখন ছোট ছিলাম, তখন আমরাও এমন করতাম। জিনিস যেখানে রাখা দরকার সেখানে রাখতাম না। একদিন আব্বাজান আমাকে বললেন, তোমার এ জাতীয় কাজ নৈতিকতা পরিপন্থী। তাছাড়া এর কারণে অপর ব্যক্তি কষ্ট পায় বিধায় কবীরা গুনাহও। এভাবে আব্বাজান অনেক ক্ষুদ্র ও সূক্ষ্ম বিষয় আমাদেরকে শিখিয়েছেন। অথচ এর আগে এটা কল্পনাও করিনি। এগুলোও দ্বীনের অংশ।

নিজের বিবি-বাচ্চাকে কষ্ট দেয়া যাবে না

একই ছাদের নিচে একসঙ্গে যারা বসবাস করে, তারা সাধারণত নিকটাত্মীয় হয়। যেমন বিবি-বাচ্চা, ভাই-বোন। আমাদের ধারণা হলো, আমার কোনো কাজ দ্বারা যদি আমার স্ত্রী কষ্ট পায়, তাহলে এতে তেমন অসুবিধা কী! ভাই-বোন, ছেলে-সন্তান ও ঘরের অন্যান্যদের বেলায়ও আমরা এ ধারণাই পোষণ করি। আমাদের এ ধারণা সঠিক নয়। দেখুন, রাসূলুল্লাহ (সা.) তাহাজ্জুদের উদ্দেশ্যে যখন উঠতেন, তখন এত আস্তে-আস্তে কাজ সারতেন যে, যেন হযরত আয়েশা (রা.)-এর ঘুম না ভাঙ্গে। সুতরাং যেমনিভাবে অপরকে কষ্ট দেয়া হারাম, তেমনিভাবে ঘরওয়ালাদেরকেও কষ্ট দেয়া হারাম।

অবহিত না করে খাওয়ার সময় অনুপস্থিত থাকা

যেমন আপনি বাসায় বলে গেলেন, অমুক সময় এসে খানা খাবেন। তারপর আপনি চলে গেলেন অন্য জায়গায়। খানাও খেয়ে নিলেন। অথচ বাসায় কিছুই

জানাননি। এদিকে আপনার স্ত্রী আপনার অপেক্ষায় বসে আছে এবং টেনশন করছে। আপনার এ কাজটিও কবীরা গুনাহ হলো। কারণ, আপনার এ কাজটির কারণে এমন এক ব্যক্তি কষ্ট পেয়েছে, যে অন্য কেউ নয়, বরং আপনারই অর্ধাঙ্গিনী।

পথে-ঘাটে ময়লা ফেলা হারাম

অথবা যেমন পথে কোথাও আপনি ময়লা ফেললেন, যার কারণে মানুষের পা পিছলে যাওয়ার আশঙ্কা আছে। তাহলে কেয়ামতের দিন আপনাকে এর জন্য জবাবদিহি করতে হবে। এতে কেউ কষ্ট না পেলেও পথ-ঘাট তো ময়লা হলো। তাই এর জন্যও গুনাহ হবে।

হাদীস শরীফে এসেছে, রাসূলুল্লাহ (সা.) যখন সফরে থাকতেন, তখন পেশাব করার প্রয়োজন হলে উপযুক্ত স্থান এমনভাবে খুঁজতেন, যেমনিভাবে একজন বাড়ি বানানোর জন্য অনুকূল স্থান খুঁজে থাকে।

অপর হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, ঈমানের প্রধান শাখা হলো, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। আর সর্বনিম্ন শাখা হলো, রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক জিনিস সরিয়ে দেয়া।

মানসিক কষ্টে ফেলা হারাম

হযরত আশরাফ আলী থানভী (রহ.) বলেছেন, মানসিক কষ্ট দেয়ার বিষয়টিও আলোচ্য হাদীসের অন্তর্ভুক্ত হবে। যেমন– আপনি একজন থেকে ঋণ নেয়ার সময় প্রতিশ্রুতি দিলেন যে, এতদিনের মধ্যে তোমার টাকা পেয়ে যাবে। নির্দিষ্ট সময় আসার পূর্বে আপনি তার কাছে অপারগতা প্রকাশ করলেন এবং পুনরায় একটি তারিখ দিলেন। এভাবে একবার পেছালেন, দু'বার পেছালেন, তিনবার পেছালেন। এভাবে বেচারা ঋণদাতা মানসিক কনফিউশনে পড়ে গেল।

আপনি তাকে অনিশ্চয়তার মাঝে ফেলে দিলেন। এখন বেচারা আপনার দিকে তাকিয়ে আছে, যার ফলে তার প্ল্যান-প্রোগ্রামও হয়ত এলোমেলো হয়ে গেছে। আপনার এরূপ গড়িমসি করা শরীয়তের দৃষ্টিতে হারাম ও কবীরা গুনাহ।

চাকরের উপর মানসিক বোঝা চাপিয়ে দেয়া

হযরত আশরাফ আলী থানভী (রহ.) এও লিখেছেন যে, যেমন আপনার একজন চাকর আছে, আপনি তাকে একসঙ্গে চারটি কাজের কথা বললেন।

প্রথমে এটি, তারপর এটি, তারপর এটি, তারপর ওটি করবে। এর মাধ্যমে আপনি তার উপর একটা মানসিক ভার চাপিয়ে দিলেন। একান্ত প্রয়োজন না হলে এরূপ করা উচিত নয়। বরং একটি শেষ হলে তারপর দ্বিতীয়টি করার জন্য বলবে। এতে কাজও ভালো হবে। দেখুন, হযরতের চিন্তা কত সূক্ষ্ম ও জীবনঘনিষ্ঠ ছিলো।

নামাযরত ব্যক্তির জন্য কোথায় অপেক্ষা করবে?

এক ব্যক্তি নামাযে মগ্ন। আপনি কোনো প্রয়োজনে তার কাছে গেলেন এবং একেবারে কাছে গিয়ে বসলেন। তাহলে এটাও একপ্রকার চাপ। কারণ, তখন সে ভাববে, লোকটি আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে। অতএব আমাকে তাড়াতাড়ি নামায শেষ করতে হবে। এই বলে সে নামাযে তাড়াহুড়ো শুরু করে দেবে। এ মানসিক চাপটা কেন সৃষ্টি হলো? আপনি একেবারে তার কাছে গিয়ে বসার কারণেই তো হলো।

এজন্য নামাযরত ব্যক্তির সঙ্গে দেখা করতে চাইলে দূরে কোথাও অপেক্ষা করতে হবে। যখন সে নামায ও আনুসঙ্গিক অন্যান্য ইবাদত থেকে অবসর হবে, তখন তার সঙ্গে দেখা করতে হবে। এটাই আদব।

'আলহামদুলিল্লাহ' আমরা যেসব বুযুর্গের কাছ থেকে দ্বীন শিখেছি, তাঁদেরকে দেখেছি, তাঁরা দ্বীনের প্রতিটি অধ্যায়ের উপর আমল করেছেন। কুরআন মজীদে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا ادْخُلُوْا فِي السِّلْمِ كَافَّةً -

'হে মুমিনগণ! তোমরা ইসলামে পরিপূর্ণভাবে প্রবেশ কর।'

–(সূরা বাক্বারা : ২০৮)

ইবাদত, নামায, রোযা ইত্যাদি ঠিকমতো পালন করলাম আর মু'আশারাত, মু'আমালাত ও আখলাকের বিষয়গুলো উপেক্ষা করলাম, এমন যেন না হয়। এগুলোও দ্বীনের অংশ।

আদাবুল মু'আশারাত পড়ুন

'আদাবুল মুআশারাত' হযরত থানভী (রহ.) কর্তৃক রচিত একটি গ্রন্থ। সামাজিকতার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আদবগুলো তিনি সেখানে লিখেছেন। প্রত্যেক মুসলমানেরই পুস্তিকাটি পড়া উচিত। পুস্তিকাটির শুরুতে তিনি লিখেছেন, আমি এ পুস্তিকার মু'আশারাত সংশ্লিষ্ট সকল আদব যদিও লিখিনি, বরং আমার স্মৃতি

ও মেধাতে যে কটি এসেছে, শুধু সেগুলো লিখেছি। আমার এ বিক্ষিপ্ত রচনা আশা করি এ বিষয়ে আপনাদের জেহেনকে উন্মোচিত করবে এবং এ বিষয়ে আমল করা সহজ হবে।

যেমন নির্দিষ্ট স্থানে গাড়ি পার্কিং করা এ বিষয়ের একটি আদব। পথ বন্ধ করে বা অপরের কষ্ট হবে এ জাতীয় স্থানে গাড়ি পার্কিং নিষেধ। এ বিষয়টি দ্বীনের অংশ। অথচ আমরা মনে করি, এগুলো দ্বীনের কোনো অংশ নয়। যার কারণে শুধু গুনাহগার হচ্ছি না বরং দ্বীনের ভুল ব্যাখ্যাও করছি। ফলে আমাদের চলাফেরা দেখে কেউ বলতে পারে যে, লোকটি তো নামায পড়ে, কিন্তু অপরকেও কষ্ট দেয়। তখন মানুষ ইসলাম সম্পর্কে বিরূপ ধারণা পোষণ করে বসতে পারে। ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার পরিবর্তে বরং দূরে সরে যেতে পারে। আল্লাহ আমাদেরকে হেফাজত করুন, দ্বীনের সঠিক বুঝ দান করুন এবং দ্বীনের প্রতিটি অধ্যায়ের উপর আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ -

পাপমুক্তির উপায় ও আল্লাহভীতি

"আজকের সমাজে অপরাধ দমনের জন্য পুলিশ আছে। এমনকি পুলিশের অপরাধ দমনের জন্যও আছে পুলিশ। আদালতের উপর আদালত আছে। আইনের উপর আইন আছে। কিন্তু এসব আইন এখন নিতান্ত সস্তায় বেচাকেনা হয় প্রতিনিয়ত। আদালত সক্রিয়। পুলিশ তিউটিরত, দুর্নীতি দমন ব্যুরো সচল। এসবের পেছনে ব্যয় হচ্ছে রাষ্ট্রের কোটি-কোটি টাকা। কিন্তু বাস্তবতার চশমা পরে একটু চোখ বুলিয়ে দেখুন, অপরাধ কমছে না, বরং বাড়ছে। দুর্নীতি দমন বিভাগেই চলছে দুর্নীতি।

কাজেই আদালত আর কত! ফলাফল তো একেবারে জিরো। পৃথিবীতে এমন কোনো আইডিয়া আজ পর্যন্ত উদ্ভাবন হয়নি, যা অপরাধকে সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিহ্ন করে দিতে পারে। হ্যাঁ, একমাত্র আল্লাহর ভয়ই পারে সব অপরাধকে সম্পূর্ণ মিটিয়ে দিতে। পরকালের চিন্তা-ই পারে মানুষকে পাপমুক্ত করে পবিত্র করে তুলতে।"

পাপমুক্তির উপায় ও আল্লাহভীতি

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ، وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّاٰتِ اَعْمَالِنَا، مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِىَ لَهُ، وَاَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَاَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَسَنَدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ .... صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَأَصْحَابِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا كَثِيْرًا — اَمَّا بَعْدُ :

فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ — بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ جَنَّتَانِ — (سورة رحمن : ٤٦)

দুই বাগানের মালিক

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন :

وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ جَنَّتَانِ -

"এবং যে ব্যক্তি স্বীয় প্রভুর সম্মুখে উপস্থিত হওয়ার ভয় রাখে, তার জন্যে রয়েছে দু'টি উদ্যান- জান্নাতের দু'টি উদ্যান। -(সূরা আর রহমান : ৪৬)

আয়াতটির তাফসীরে বিখ্যাত তাবেঈ হযরত মুজাহিদ (রহ.) বলেছেন : আয়াতটিতে সেই ব্যক্তি সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে, যার হৃদয়ে গুনাহ করার প্রতি আকর্ষণ জাগে, গর্হিত কাজের খেয়াল জাগে, সাথে-সাথে একথাও মনে আসে যে, আমাকে আল্লাহর সম্মুখে দাঁড়াতে হবে এবং সকল কৃতকর্মের জবাব দিতে হবে। এসব মনে এলে গুনাহ করার আগ্রহ মন থেকে ঝেড়ে ফেলে। বর্জন করে পাপচিন্তা। এমন ব্যক্তির জন্য আল্লাহ তা'আলা দু'টি বাগানের ওয়াদা করেছেন।

এটাই তাকওয়া

এ সূঁবাদে তিনি আরো বলেন : একজন মানুষ নির্জন স্থানে বসে আছে। সঙ্গে কেউ নেই। চাইলে গুনাহ করতে পারে। বাহ্যত কোনো প্রতিবন্ধক নেই। তার নফসও তাকে উস্কানি দিচ্ছে, কুমন্ত্রণা দিচ্ছে। খুব আগ্রহ জেগেছে পাপ করার। সাথে-সাথে তার মনে জাগলো, আচ্ছা, এ পৃথিবীর কেউ না দেখলেও আল্লাহ তো দেখছেন। আর একদিন তো অবশ্যই তার সামনে দাঁড়াতে হবে। তার সামনে কৃতকর্মের জবাব দিতে হবে। এই ভেবে সে মনের পাপচিন্তাসমূহ মনেই দাফন করে রাখে। তার জন্যই এ দুই বাগানের ওয়াদা। আর একেই বলে তাকওয়া বা আল্লাহর ভয়। এই তাকওয়াই শরীয়ত ও তরিকতের মূলকথা।

আল্লাহর বড়ত্ব

আয়াতটিতে একথা বলা হয়নি যে, যে ব্যক্তি জাহান্নামকে ভয় করবে, আখিরাতকে ভয় করবে ইত্যাদি। বরং বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি স্বীয় প্রভুর সম্মুখে উপস্থিত হওয়ার ভয় করবে, এর সারমর্ম হলো, যার হৃদয়ে আল্লাহর বড়ত্ব আছে, আর সে চিন্তা করে, আমার এ কৃতকর্মের জন্য তিনি শাস্তি দেন বা না দেন, কিন্তু আমি তাঁর সামনে দাঁড়াবো কোন মুখে? কারণ, যার হৃদয়ে কারও প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধাবোধ থাকে, সে তার শাস্তিকে ভয় করে না। ভয় করে তার সামনে মুখ দেখানোকে। আর এই ভীতিকে বলা হয় তাকওয়া।

আমার হৃদয়ে আব্বাজানের বড়ত্ব

আমার আব্বাজান মুফতী শফী (রহ.)। যিনি সারাজীবনে আমাকে এক বার কি দু'বার মেরেছেন। এক-দু'বার চড় মারার কথা আমার মনে আছে। কিন্তু তাঁর প্রতি আমার শ্রদ্ধা, সম্মানবোধ ও তাঁর বড়ত্ব আমার হৃদয়ের গভীরে এমনভাবে

প্রোথিত হয়ে গিয়েছিলো যে, তাঁর রুমের সামনে দিয়ে যেতেও আমার অন্তরাত্মা কেঁপে উঠতো। কার সামনে দিয়ে যাচ্ছি, এ ভয়ে বুক কেঁপে উঠতো। এমনটি কেন হতো? কারণ, অন্তরে ভয় ছিলো, তার চোখে আবার এমন কিছু ধরা না পড়ে, যা তার অবস্থান ও আদবের পরিপন্থী। একজন মাখলুকের প্রতি যদি এরূপ শ্রদ্ধাবোধ ও মানসিক পরিস্থিতি সৃষ্টি হতে পারে, তাহলে সারা পৃথিবীর মালিক ও প্রভু মহান আল্লাহর প্রতি কীরূপ ধারণা থাকা উচিত? অবশ্যই তাঁর ভয় থাকা সকলের জন্যই উচিত।

ভয় পাওয়ার বিষয়

মুমিন-মুসলমানরা জাহান্নামকে ভয় পায়। যেহেতু জাহান্নাম মানে আল্লাহ তা'আলার ক্রোধ ও গজবের বহিঃপ্রকাশ। বস্তুত ভয় করা উচিত ছিলো আল্লাহ তা'আলার বড়ত্ব ও অসীম মর্যাদার। একটি আরবি কবিতা শুনুন :

لَاتَسْقِنِيْ مَاءَ الْحَيَاةِ بِذِلَّةٍ

بَلْ فَاسْقِنِيْ بِالْعِزِّ كَاْسَ الْحَنْظَلِ

"লাঞ্ছনার আবেহায়াত আমাকে পান করিও না। আমাকে বরং সম্মানের সাথে তিক্ত হানযালের সুধা পান করাও।"

অর্থাৎ– লাঞ্ছনার সঙ্গে আবেহায়াত পান করাও বৃথা। তার চেয়ে বরং সম্মান ও মর্যাদার সাথে তিক্ত হানযালের সুধাও অনেক উত্তম।

সারকথা, যারা আল্লাহর পরিচয় লাভ করেছে, তারা তো চায় শুধুই আল্লাহর সন্তুষ্টি। বেঁচে থাকতে চায় আল্লাহর ক্রোধ থেকে। যেহেতু জাহান্নামের কঠিন শাস্তি আল্লাহর ক্রোধেরই প্রকাশ, তাই তারা জাহান্নামকেও ভয় পায়। কাজেই এটাকেও আল্লাহকে ভয় পাওয়ার নামান্তর বলা যায়। বলা যায় তারই সন্তুষ্টি কামনার অন্য এক রূপ।

দুধে পানি মেশানোর ঘটনা

হযরত উমর (রা.)-এর খেলাফাতকালের ঘটনা। রাতের বেলা তিনি প্রজাদের অবস্থা পর্যবেক্ষণে বেরিয়েছেন। প্রায়ই তিনি এ কাজে টহল দিতেন। কাউকে অন্নহীন দেখলে অন্নের ব্যবস্থা করেন। পীড়িত পেলে সেবা করেন। কাউকে অন্যায় কাজে লিপ্ত দেখলে শাসন করেন।

একদিন তিনি অনুরূপ টহলে নেমেছেন। প্রজাদের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করছেন। ইতোমধ্যে একটি বাড়ি থেকে দু'টি নারীকণ্ঠ কানে এলো। কণ্ঠস্বর থেকে বোঝা যাচ্ছে, তাদের একজন বয়স্কা, অন্যজন যুবতী। বুড়ি তার যুবতী মেয়েকে বলছে, বেটি দুধে খানিকটা পানি মিশিয়ে দাও তারপর বাজারে নিয়ে বিক্রি করো। মেয়ে উত্তর দিচ্ছে : মা, তুমি কি শোননি খলীফা দুধে পানি মিশিয়ে বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন? তাই দুধে পানি মেশানো যাবে না। মা বললেন, আরে বেটি! খলীফা কি আর এখানে বসে আছেন? তিনি তো দেখবেন না। বাইরেও অন্ধকার। সুতরাং দেখার মতো কেউ নেই। মেয়ে বললো, মা! খলীফার চোখকে হয়ত ফাঁকি দেয়া যাবে, কিন্তু আল্লাহ তো দেখছেন। তাই অন্তত আমার দ্বারা এ কাজটি হবে না।

বাইরে দাঁড়িয়ে হযরত উমর (রা.) সব শুনছেন। ভোর হওয়ার পর তিনি বুড়ি ও যুবতীর খোঁজ নিলেন। তলব করলেন উভয়কে। আর নিজের ছেলেকে এই মেয়ে বিয়ে করালেন। আর এই বংশধারা থেকেই জন্ম নিলেন পৃথিবীর দ্বিতীয় উমর– উমর ইবনে আবদুল আযীয (রহ.), যিনি ছিলেন মুসলমানদের পঞ্চম খলীফা।

ঘটনাটি বলার কারণ হলো, এই গভীর তমসাচ্ছন্ন রাতে যখন সকলেই ঘুমে বিভোর, দেখার কেউ নেই কিন্তু আল্লাহ তো দেখছেন– এই যে অনুভূতি, এই যে বিশ্বাস, এরই নাম তাক্বওয়া।

আরেকটি শিক্ষণীয় ঘটনা

অন্যদিনের ঘটনা। হযরত উমর (রা.) সফরে বেরিয়েছেন। পথ চলার সব পাথেয় ফুরিয়ে গেছে। ইত্যবসরে তিনি লক্ষ্য করলেন, মাঠে অনেকগুলো ছাগল ঘুরে বেড়াচ্ছে। তিনি রাখালের কাছে গেলেন এবং বললেন : আমি একজন মুসাফির। আমার পাথেয় শেষ হয়ে গেছে। আমাকে একটু দুধ পান করাতে পারবে?

আরবরা এভাবে অসহায় মুসাফিরদেরকে দুধ পান করাতো এবং এটা তাদের মাঝে প্রসিদ্ধ রেওয়াজ ছিলো। তিনি সেই রেওয়াজ হিসেবেই দুধ চাইলেন।

রাখাল ছেলেটি বললো, আমি আপনাকে অবশ্যই দুধ পান করাতাম। কিন্তু সমস্যা হলো, এ বকরিগুলোর মালিক আমি নই। আমি এগুলোর রাখাল। এগুলো তো আমার নিকট আমানত। তাই আমি দুঃখিত যে, আপনাকে দুধ পান করাতে পারলাম না।

উমর (রা.) চিন্তা করলেন, ছেলেটিকে একটু বাজিয়ে দেখা যাক। তাই তিনি বললেন, আমি তোমাকে একটি উত্তম প্রস্তাব দিচ্ছি। এতে তোমারও লাভ হবে আর আমারও উপকার হবে। তুমি আমার নিকট একটি বকরি বিক্রি করে দাও। এতে তুমি মূল্য পাবে আর আমিও দুধ পান করতে পারবো। আর মালিকের কথা চিন্তা করো না, তাকে বুঝ দেবে একটি বকরি বাঘে খেয়ে ফেলেছে। সে অবশ্যই তোমাকে অবিশ্বাস করবে না। যেহেতু বাঘ তো মাঝে-মধ্যে এমন কাজ করেই থাকে। এতে তোমারও লাভ হলো, আর আমারও উপকার হলো। একথা শোনামাত্র রাখাল বলে উঠলো–

يَا هٰذَا ! فَأَيْنَ اللهُ ؟

'ও মিয়া! তাহলে আল্লাহ কোথায়?'

অর্থাৎ– আল্লাহ কি আমার এ অন্যায় কাজ দেখতে পাবেন না? শুধু মালিককে বুঝ দিয়ে দিলেই হলো? মালিকেরও তো মালিক আছেন, তার কাছে কীভাবে জবাব দেবো? ভাই, এটা আমার দ্বারা হবে না।

পরীক্ষা হয়ে গেল। উমর (রা.) বললেন, সত্যিই তোমার মত মানুষ যতদিন এ পৃথিবীর বুকে বিচরণ করবে, ততদিন কোনো অত্যাচারী কারও প্রতি চোখ তুলে তাকাতে পারবে না। বাস্তবেই যতদিন মানুষের হৃদয়ে আল্লাহর ভয় জাগ্রত থাকবে, পরকালের জবাবদিহিতার অনুভূতি জাগ্রত থাকবে, আল্লাহর সামনে উপস্থিতির চেতনা সজাগ থাকবে, ততদিন অন্যায়-অবিচার পৃথিবীর বুকে স্থান পাবে না। আর একেই বলে তাকওয়া।

অপরাধ দমনের উত্তম পন্থা

ভালোভাবে জেনে রাখুন, যতদিন পর্যন্ত মানুষের এই অনুভূতির সৃষ্টি না হবে, ততদিন পর্যন্ত এই পৃথিবী থেকে অপরাধ দূর হবে না। অন্যায়-অপরাধের তাণ্ডব বন্ধ হবে না। হাজারও আদালত বসানো হোক, পথে পথে পুলিশ নিয়োগ করা হোক, ফলাফল দাঁড়াবে শূন্য। পুলিশ হয়ত দিনের বেলা অপরাধ দমন করবে। কিন্তু রাতের আঁধারে নির্জন গলিতে পাপ-অন্যায় থেকে বাধা দেবে কে? লোকচক্ষুর আড়ালে অন্যায়-অপরাধ রোধের একমাত্র পথ তাকওয়া– আল্লাহর ভয়।

মানুষের হৃদয় থেকে যখন এই ভয় চলে গেছে, তখন সমাজের অবস্থা হয়েছে নিতান্তই নাজুক, খুবই দুর্বিষহ। লক্ষ্য করুন, আজকের সমাজে অপরাধ দমনের জন্য পুলিশ আছে। এমনকি পুলিশের অপরাধ দমনের জন্যও আছে

পুলিশ। আদালতের উপর আছে আদালত। আইনের উপর আইন আছে। কিন্তু সে আইন এখন নিতান্ত সস্তায় বেচাকেনা হয় প্রতিনিয়ত। আদালত সক্রিয়। পুলিশ ডিউটিতে। দুর্নীতি দমন ব্যুরো সচল। আর এসবের পেছনে ব্যয় হচ্ছে কোটি-কোটি টাকা। বাস্তবতার চশমা পরে একটু চোখ বুলিয়ে দেখুন! ঘুষের হাত বাড়ছে, খোদ দুর্নীতি দমন বিভাগেই চলছে দুর্নীতি।

অতএব, আদালত আর কত! ফলাফল তো একেবারে জিরো। পৃথিবীতে আজ পর্যন্ত এমন কোনো পন্থা উদ্ভাবন হয়নি, যা অপরাধকে সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় করতে পারে। হ্যাঁ, একমাত্র আল্লাহর ভয়ই পারে অপরাধকে সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন করে দিতে। পরকালের চিন্তাই পারে মানুষকে পাপমুক্ত করে পবিত্র করে তুলতে।

সাহাবায়ে কেরাম ও তাকওয়া

রাসূল (সা.) সাহাবায়ে কেরামের মাঝে এ চেতনা-ই সৃষ্টি করেছিলেন। তাদের অন্তরে আল্লাহর ভয় এবং পরকালের ভাবনাটাকেই জাগিয়ে দিয়েছিলেন। তাই তাঁদের কেউ কোনো অন্যায় করে ফেললে বিচলিত হতেন– অস্থির হতেন। ইসলামি শাস্তি গ্রহণ না করা পর্যন্ত, আল্লাহর দরবারে মন খুলে চোখের অশ্রু না ফেলা পর্যন্ত তাদের অন্তরে প্রশান্তি আসতো না।

যেমন– একজন অপরাধী রাসূল (সা.)-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে স্বীকার করল, আমি অপরাধ করেছি, আমাকে শাস্তি দিন, আমাকে পবিত্র করে তুলুন। যেহেতু তার হৃদয়ে আল্লাহর ভয় ছিলো, আখেরাতের ভাবনা ছিলো, আল্লাহর সামনে উপস্থিত হওয়ার বিশ্বাস ছিলো। তিনি ছিলেন পরিপূর্ণ মুত্তাকী। মানবহৃদয়ে যতক্ষণ পর্যন্ত এ তাকওয়া সৃষ্টি না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত অপরাধ দূর হবে না, অন্যায় নিশ্চিহ্ন হবে না, সমাজ পাপের অভিশাপ থেকে মুক্তি পাবে না।

আমাদের আদালত এবং....

বেশ কয়েক বছর যাবত আমি আদালতের সঙ্গে সম্পৃক্ত। সাধারণ নিয়ম মতে চুরি-ডাকাতির সব মামলাই শেষ পর্যন্ত আমাদের পর্যন্ত গড়াতে হয়। অথচ প্রথম তিন বছর আমার নিকট এ জাতীয় কোনো মামলাই এলো না। আমি তো তাজ্জব। এ কি! দেশে কি চুরি-ডাকাতি নেই! খোঁজ নিলাম, তিন বছরে কতটি চুরি-ডাকাতির মামলা আমাদের আদালতে এসেছে। জানতে পারলাম, শুধু তিন কি চারটে। আমি বললাম, কেউ যদি পরিসংখ্যানে দেখে, তিন বছরে পাকিস্তানের চুরি ও ডাকাতি উভয়টির মামলা মাত্র তিন চারটি, তাহলে তো

ভাববে, এখানে শুধু ফেরেশতা চরিত্রের মানুষ বাস করছে। শান্তি ও নিরাপত্তার সুবাতাস বইছে এই দেশের নাগরিকদের মাঝে।

অথচ এরই বিপরীতে পত্রিকা দেখুন। তাহলে ধরা পড়বে চুরি-ডাকাতির শত-শত মামলা হচ্ছে নিত্যদিন। খোঁজ নিয়ে জানতে পারলাম, এসব মোকদ্দমা নিচের ওয়ালারাই শেষ করে দেয়। এসব মোকদ্দমা উপরে গড়াবার সুযোগ পায় না। এই হলো আমাদের বিচারের অবস্থা!

অবশেষে মামলা এসেছে

অবশেষে দীর্ঘ তিন বছরে একটি মামলা আমার আদালতে এসেছে। মামলাটি ছিলো এই– এক ব্যক্তি চাকরি করতো কুয়েতে। এক ছুটিতে দেশে এসেছিলো। করাচি বিমানবন্দর থেকে একটি ট্যাক্সি ভাড়া করে বাড়িতে যাচ্ছিলো। পথে বাহাদুরাবাদ চৌরঙ্গি হয়ে অশ্বারোহী পুলিশদের একটি দল যাচ্ছিলো। রাত তখন তিনটা। পুলিশ ট্যাক্সি আটকালো। জিজ্ঞেস করলো, কোত্থেকে এসেছো? কোথায় যাচ্ছো? সে বলল, কুয়েত থেকে এসেছি, এখন বিমানবন্দর থেকে বাড়ি যাচ্ছি। তারপর জিজ্ঞেস করল, কুয়েত থেকে কী এনেছ? সে উত্তর দিল, যা এনেছি তার হিসাব কাস্টম অফিসারকে দিয়ে এসেছি। তাই এটা তোমাদের জানবার বিষয় নয়।

পরিশেষে এক পুলিশ বন্দুক তার করে বলল, যা আছে সব বের কর। আমাদের হাতে সব তুলে দে। আমার কাছে আসা মামলার বিবরণ ছিলো এটা। চুরি-ডাকাতি ঠেকাতে গিয়ে পুলিশ নিজেই ডাকাতি করছে।

বর্তমানে পৃথিবীতে যাদের হাতে নিরাপত্তা ও শান্তি প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব, তারা-ই সর্বপ্রথম শান্তি-নিরাপত্তাকে পদদলিত করে। কারণ, আজ মানুষের হৃদয়রাজ্য আল্লাহর ভয়শূন্য, মানুষ ভুলে বসেছে মৃত্যুর পর অসীম জীবনের কথা। ফলে পৃথিবী ত্রাসের রাজ্যে পরিণত হয়েছে। পরিণত হয়েছে হত্যা, লুণ্ঠন, ডাকাতি, সন্ত্রাসী, বিশৃঙ্খলা আর অশান্তির রাজত্বে।

শয়তানের কৌশল

অবশ্য মানুষের হৃদয় থেকে এই আল্লাহকেন্দ্রিক প্রত্যয় ও চেতনা একদিনে এক মুহূর্তেই শেষ হয়ে যায় না। বরং ধীরে-ধীরে এই অনুভূতির বিলুপ্তি ঘটে। শয়তান প্রথমবারেই মানুষকে বড় অন্যায় কাজের প্রতি উদ্বুদ্ধ করে না। প্রথমেই তাকে এই প্ররোচনা দেয় না যে, ডাকাতি করো। কারণ, এ ধরনের কথা শোনামাত্র সে আঁৎকে উঠবে। সে বলে উঠবে, আরে! ডাকাতি! এটা জঘন্য অপরাধ। আমি এটা পারব না।

শয়তান প্রথমে মানুষকে ছোট-ছোট গুনাহর প্রতি আকর্ষণ তৈরি করে। মন্দস্থানের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি করে। লোভ দেখায়, দেখো, ভাল লাগবে। তারপর আস্তে আস্তে এভাবে তার মাঝে ছোট-খাট পাপের অভ্যাস গড়ে ওঠে। অতঃপর আকর্ষণ সৃষ্টি হয় বড় ধরনের কোনো পাপের প্রতি। প্ররোচনা দেয়, বারবার তো ওই গুনাহটি করেছিলে, তখনও তো আল্লাহ ছিল। তখন তো ভাবনি আল্লাহর কথা, আখেরাতের কথা, হিসাব-কিতাবের কথা। তাহলে এখন কেন এতসব ভাবছ? এটাও করে ফেলো। অতঃপর তৃতীয় আরেকটি পাপের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে, তারপর চতুর্থ... । এভাবেই মানুষ অপরাধ জগতে পা বাড়ায়।

যুবকদেরকে শেষ করেছে টেলিভিশন

বর্তমানে রাস্তা-ঘাটে দেখা যায়, যুবকরা পিস্তল নাচাচ্ছে। পিস্তল ঠেকিয়ে সন্ত্রাস চালাচ্ছে, মানুষের জীবন কেড়ে নিচ্ছে। কারোও ইজ্জত লুটে নিচ্ছে। অথচ আগে তো মোটেই এমন ছিল না।

মূলত এর প্রাদুর্ভাব ঘটেছে এভাবে– যুবকদেরকে শয়তান প্ররোচিত করেছে যে, দেখো! সারা পৃথিবী টেলিভিশন দেখছে। তোমরা দেখবে না? দেখো! ফ্লিম দেখো, তারপর ধীরে-ধীরে ছবির সাথে একীভূত হয়ে গিয়েছে। তাদের চিন্তা-চেতনা, ছবির প্রভাবে প্রভাবিত হয়েছে তাদের মানস। তারপরেই শয়তান সবক দিয়েছে, ছবিতে যে বিষয়গুলো দেখেছ সেগুলো নিজেরা করে দেখ না, হিরো হতে পারবে। এভাবেই জড়িয়ে পড়ে অপরাধ থেকে জঘন্য অপরাধে।

ছোট অপরাধে অভ্যস্তরাই বড় অপরাধ করে

ভুলে গেলে চলবে না যে, সকল বড় পাপের সূচনা কিন্তু ছোট পাপের পথ ধরেই হয়। ছোট-খাট অপরাধ করে বুকের পাটা বড় হয়ে বড় অপরাধ করার হিম্মত পায়। অপরাধের অতলান্ত খাদে নিমজ্জিত যুবশক্তি এক সময় এতটাই আত্মভোলা হয়ে পড়ে যে, তারা মারা যাবে একথাটাও বেমালুম ভুলে বসে। পৃথিবীকে চিরকালের আবাসস্থল মনে করে। তখন যা খুশি তা-ই করে, তাদের সুকুমার বৃত্তিতে অঙ্কুরিত একেকটি পাপ এখন পাপের সাগরে পরিণত হয়েছে। আরবি একটি প্রবাদ আছে :

اَلشَّرُّ يَدُّ اَهُ فِى الْاَصْلِ اَصْغَرُهُ -

'সকল পাপের শুরুর দিকটা হয় ক্ষুদ্র।'

বাস্তবেই বিরাট ধ্বংসলীলার উৎস খুব ক্ষুদ্র হতে পারে। আগুনের এক টুকরা জ্বলন্ত অঙ্গার ভস্ম করে দিতে পারে বিরাট জনবসতি। তাই পাপ যত ছোটই হোক তাকে ছোট মনে করতে নেই। কারণ, এটা শয়তানের বীজ, শয়তানের টোপ। সে তোমাকে ফাঁদে ফেলতে চায়, ধ্বংস করতে চায়। তোমার হৃদয় থেকে আল্লাহভীতি, পরকালভাবনা নিশ্চিহ্ন করে দিতে চায় সে। তাই আল্লাহর ভয়ে সর্বদা পাপ থেকে বেঁচে থাকো। পাপ চাই ছোট হোক কিংবা বড়, পাপকে পাপই মনে করো।

এটা সগীরা গুনাহ, না কবীরা গুনাহ?

হযরত থানভী (রহ.) বলেন : অনেকে আগ্রহভরে জিজ্ঞেস করে, এটা সগীরা গুনাহ, না কবীরা গুনাহ? উদ্দেশ্য হল, সগীরা হলে করে ফেলব আর কবীরা হলে একটু ভয়-ভয় লাগে। তিনি বলেন : সগীরা গুনাহ ও কবীরা গুনাহর দৃষ্টান্ত হল, একটি আগুনের বড় অংগার, আরেকটি ছোট অংগার। এবার বলুন, আগুনের ছোট অংগার কি কখনো কেউ বাক্সে বা আলমারিতে হেফাযত করে রেখে দেয়? কোনো বুদ্ধিমান কি একথা ভাবে যে, আচ্ছা, আগুনের ছোট একটি কয়লা রেখে দিলে আর কি-ই বা হবে? এরূপ চিন্তা, কেউ করে না। কারণ, আগুনের এই ছোট্ট অংগার বাক্সে রাখলে সবকিছুই আগুন হয়ে যাবে এবং ভস্ম করে দেবে। হয়তবা শেষ পর্যন্ত ঘরও পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। গুনাহর দৃষ্টান্তও এরূপ। ছোট হোক বড় হোক, গুনাহ গুনাহই। ওটা আগুন। এই একটি ছোট্ট আগুনের কয়লাও তোমার জীবনকে পুড়ে শেষ করে দিতে পারে। তাই সগীরা-কবীরা বা ছোট-বড় নয়। দেখার বিষয় হল, ওটা গুনাহ কিনা। দেখতে হবে, এটা জায়েয, না নাজায়েয। আল্লাহ তা'আলা ওটা করতে বারণ করেছেন, নাকি করেননি। যদি বারণ করে থাকেন, তাহলে জবাবদিহিতার কথা ভেবে ছেড়ে দাও। চিন্তা কর যে, এ পাপ নিয়ে আল্লাহর সামনে কিভাবে দাঁড়াব? আলোচ্য আয়াতের বরকত লাভ করার পদ্ধতি এটাই। আল্লাহর সামনে উপস্থিত হওয়ার কথা ভেবে গুনাহকে ছেড়ে দিতে হবে।

গুনাহ করার আগ্রহ জাগলে একটু ভেবে নাও

হযরত ডা. আব্দুল হাই (রহ.) বলতেন, মানুষ যদি আল্লাহ তা'আলার কথা ভাবতে চায়, কল্পনা করতে চায়, তাহলে অনেক সময় তা পারে না। কারণ, কল্পনা করা যায় চোখে দেখা জিনিসের। আর মানুষ যেহেতু আল্লাহকে দেখেনি, তাই কল্পনা করা কঠিন মনে হয়। এইজন্য গুনাহ করার আগ্রহ সৃষ্টি হলে মানুষ

এতটুকু কল্পনা করে নিতে পারে যে, আচ্ছা, গুনাহটি করতে গেলে যদি আমার সন্তান আমাকে দেখে ফেলে, কিংবা আমার কোনো ওস্তাদ বা বন্ধু যদি দেখে ফেলেন, তাহলে কি আমি কাজটি করব?

যেমন মনে হারাম কোনো কিছুর প্রতি দৃষ্টি দেয়ার তাড়না জাগল, সঙ্গে-সঙ্গেই চিন্তা করো, যদি এ মুহূর্তে আমাকে আমার শায়খ দেখেন কিংবা আমার পিতা দেখেন অথবা আমার সন্তান দেখে, তাহলেও এ হারাম জিনিসটি দেখতে পারবো? অবশ্যই পারবো না। কারণ, মনে তখন ভয় থাকবে, তারা এই অবস্থায় আমাকে দেখলে খারাপ ভাববে।

মাখলুকের সামনে লজ্জিত হওয়ার ভয়ে যদি খাহেশকে ধরাশায়ী করা সম্ভব হয়, তাহলে যে সত্তা সকল বাদশাহর বাদশাহ, তাঁর ধ্যান কেন গুনাহর পথে বাধার প্রাচীর হতে পারবে না। তিনি তো সকলের স্রষ্টা। সবকিছুর দ্রষ্টা। সর্বাবস্থায় দেখছেন। এ ধরনের ভাবনা মানুষকে অবশ্যই গুনাহ থেকে ফেরাতে সক্ষম।

পাপের স্বাদ ক্ষণস্থায়ী

মানুষ গুনাহর কাজে অভ্যস্ত হয়ে পড়লে পরে মুক্তি পাওয়া খুবই কঠিন হয়ে পড়ে। সহজেই সে পাপের মায়াজালে জড়িয়ে পড়ে। কিন্তু গুনাহ বা পাপ থেকে বাঁচার একটি পথ আছে। তাহল, নিজেকে জোর করে কাবু করতে হবে। নফসের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে হবে। আল্লাহকে রাজি-খুশি করার নিমিত্তে গুনাহর কামনাগুলোকে পিষে ফেলতে হবে। আল্লাহকে খুশি করার জন্য এমনটি করতে পারলে ঈমানে তুলনাহীন স্বাদ আস্বাদন করতে পারবে এবং পাপের স্বাদ তখন মনে হবে নিতান্তই তুচ্ছ ও অর্থহীন। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে পাপবর্জনের স্বাদ আস্বাদন করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

হযরত থানভী (রহ.) বলেছেন, গুনাহের স্বাদের দৃষ্টান্ত হল খুজলির মত। খুজলি চুলকাতে খুব মজা লাগে। কিন্তু চুলকাতে-চুলকাতে যখন রক্ত বের হয়ে যায়, তখন স্বাদ বিস্বাদে পরিণত হয়। জন্ম নেয় কষ্ট ও যন্ত্রণা। তাই চুলকানোর স্বাদ কোনো সুস্থতার স্বাদ নয়, বরং অসুস্থতার বিকৃত স্বাদ। এর কোনো মূল্য নেই।

কিন্তু কেউ যদি প্রথমেই এ কথা চিন্তা করে যে, চুলকালে ক্ষত হবে, যন্ত্রণা হবে, কষ্ট বাড়বে; তাই চুলকাব না, অষুধ লাগাব। তিক্ত হলেও অষুধ খাব। যেহেতু চুলকানিতে ক্ষণিকের মজা থাকলেও ভীষণ যন্ত্রণাও আছে। এই ভেবে সে চুলকানির স্বাদকে বিসর্জন দিয়ে তিক্ত অষুধ গ্রহণ করেছে। তাহলে তার

রোগ ভালো হয়ে যাবে। সে সুস্থতার স্বাদ পাবে, খুজলির জ্বালা থেকে মুক্তি পাবে। তার এই সুস্থতার স্বাদ চুলকানির হাজার স্বাদের চাইতেও উত্তম।

গুনাহর স্বাদও অনুরূপ। সবটাই ধোঁকা। এইজন্য গুনাহর ধোঁকাকে পদদলিত করো, নফসের কুমন্ত্রণাকে ছুঁড়ে ফেলে দাও। গুনাহর প্রতি আকর্ষণ তো এই জন্যই সৃষ্টি করা হয়েছে যে, মানুষ এগুলোকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে মহান মর্যাদার অধিকারী হবে। গুনাহর পিচ্ছিল পথ পেরিয়েই মানুষ কল্যাণের ঠিকানা খুঁজে পায়।

যৌবনের ভয় আর বার্ধ্যকের আশা

সারকথা হল, মুমিনের কাজ হচ্ছে আল্লাহর প্রতি ভয়ও রাখা আবার আশাও রাখা। কিন্তু বুযুর্গানে দ্বীন বলেছেন, যৌবনে ভয় বেশি থাকা ভালো। কারণ, যৌবনে মানুষের শক্তি-সামর্থ্য থাকে। সকল কাজ করার সামর্থ্য থাকে। তখন অন্তরে গুনাহর প্রতি আকর্ষণও বেশি থাকে। কামনা-বাসনা থাকে সতেজ। তখন আল্লাহর ভয় অন্তরে থাকলে মানুষ গুনাহ থেকে বাঁচার উৎস পায়। আল্লাহ ভীতির প্রভাবে সে অনেকটা গুনাহমুক্ত থাকতে পারে। আর যখন বয়স বাড়ে, বার্ধক্য কাবু করে ফেলে– তখন আল্লাহর প্রতি আশা থাকা ভালো। আল্লাহর রহমত ও অনুগ্রহের প্রতি একনিষ্ঠ প্রত্যয়ই তখন তার শ্রেষ্ঠ সম্বল। এই আশাই তখন তাকে নৈরাশ্যের অন্ধকারে হারিয়ে যাওয়া থেকে বাঁচিয়ে রাখবে।

পৃথিবীর শৃঙ্খলাও ভীতির উপর নির্ভরশীল

বর্তমানে অনেকের ধারণা, আল্লাহভীতি কি আর অর্জনের জিনিস? অনেকে তো বলে ফেলে, আরে আল্লাহ তো আমাদেরই। আল্লাহকে আবার কিসের ভয় করব? কীভাবে ভয় করব? তিনিই তো আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, কুরআন মজীদে তিনি বারবার অভয় দিয়েছেন : 'গাফুরুর রাহীম' তিনি ক্ষমাশীল, দয়াময়। তারপরও আল্লাহকে ভয় করার কি আছে?

বলা বাহুল্য, এই যদি কারো ভাবনা হয়, তাহলে তার কি আল্লাহকে ভয় করার প্রয়োজন আছে? এরই ফলে আজকে মানুষ গুনাহর সাগরে আকণ্ঠ নিমজ্জিত।

জেনে রাখুন, আল্লাহর ভয় এক মহান সম্পদ। এক মহা মূল্যবান পুঁজি। এই পুঁজি না থাকলে পৃথিবীর সকল কাজ-কারবার থমকে দাঁড়াবে। ছাত্রের মধ্যে যদি পরীক্ষায় ফেল করার ভয় না থাকে, তাহলে সে মনোযোগী হবে না। ফেল

করার ভয়ই তাকে মনোযোগী ও মেহনতি করে তোলে। চাকরি চলে যাওয়ার ভয় না থাকলে কেউ কি দায়িত্বে সিরিয়াস হবে? তখন সে বসে-বসে সময় কাটাবে। কোনো কষ্ট বা পরিশ্রমই করবে না।

সন্তান যদি পিতাকে ভয় না পায়, কর্মচারী যদি বস্‌কে ভয় না করে, সাধারণ মানুষ যদি আইনকে ভয় না করে, তাহলে দেশব্যাপী শুরু হবে নৈরাজ্য, বিশৃঙ্খলা আর অরাজকতা। তখন মানুষ অনিশ্চয়তার মধ্যে হাবুডুবু খাবে। তাদের অধিকার ভূলুণ্ঠিত হবে। তাদের সম্পদের সংরক্ষণ করা কঠিন হয়ে দাঁড়াবে। ইযযত হয়ে পড়বে শঙ্কার সম্মুখীন। চুরি-ডাকাতি বৃদ্ধি পাবে ব্যাপকহারে। হবে না? অবশ্যই হবে। হয়েছেই তো। বিশ্বব্যাপী আজ এ চিত্রই তো পরিলক্ষিত হচ্ছে। আজকের বিশ্বে মানুষের মূল্য মশা-মাছির মতো হয়ে গেছে। বরং বাস্তবতা হলো, মানুষের মূল্য আজ কানাকড়িও নয়। এর কারণ, মানুষের মন থেকে আল্লাহভীতি উঠে গেছে। তারা আজ আইনকেও ভয় পায় না। আইন আজ কেনা যায়। দুই কড়ি পাঁচ কড়ি মূল্যে বিক্রি হয়। সুতরাং কড়ি থাকলে আইন তাকে আর পায় কোথায়। ফলে সমাজ আজ মারাত্মক হুমকির সম্মুখীন। কোথাও প্রশান্তি ও নিরাপত্তা নেই।

স্বাধীনতার সংগ্রাম

এক সময় ইংরেজরা এই ভারতবর্ষ শাসন করত। এক সময় তাদের বিরুদ্ধে শুরু হল সংগ্রাম। হিন্দু-মুসলিম মিলে তাদের বিরুদ্ধে মিছিল করেছে, মিটিং করেছে, বয়কট করেছে।

এই আন্দোলনে যেহেতু হিন্দু-মুসলিম উভয়ই অংশীদার ছিল, তাই মাঝে-মধ্যে মুসলমান হিন্দুর কাজও করত। মুসলমানরা মাঝে-মধ্যে হিন্দুদের রসম-রেওয়াজে শরীক হতো। তাদের মতো হিন্দুয়ানী পোশাক পরত। আন্দোলনের এই ধারাকে হযরত থানভী (রহ.) অপছন্দ করতেন। তাই তিনি একে সমর্থন করেননি। তাঁর ভক্ত-মুরীদরা এ আন্দোলনে যেতে চাইলে তিনি নিষেধ করতেন।

লাল টুপির ভয়

একবার এই আন্দোলনের নেতাদের একটি প্রতিনিধি দল হযরত থানভী (রহ.) এর দরবারে এসে হাজির হল। তারা আরজ করল, হযরত, আপনি যদি এই আন্দোলনে শরিক হন, তাহলে খুব সহজেই ইংরেজদের তাড়ানো সম্ভব হবে। আপনি আসছেন না বলেই তাদের শাসন এতদিন টিকে আছে, আপনি আসুন।

হযরত থানভী (রহ.) বললেন, আন্দোলনের কর্মকৌশলকে আমি সমর্থন দেই না। তাই আমি আসতে পারছি না। আচ্ছা, বলুন তো কত বছর যাবত চলছে আপনাদের এই আন্দোলন? কত বছর ধরে এভাবে মিটিং, মিছিল আর হরতাল করছেন? এ পর্যন্ত এতে কী ফায়দা হয়েছে?

প্রতিনিধিদলের একজন বলল, হযরত! স্বাধীনতা আমরা এখনও পাইনি ঠিক, তবে একটা লাভ হয়েছে। আন্দোলনের ফলে আমাদের অন্তর থেকে লাল টুপির ভয় চলে গেছে। লাল টুপি দ্বারা উদ্দেশ্য ছিল পুলিশ। অর্থাৎ– এখন আর কেউ পুলিশকে ভয় পায় না। এক মহল্লায় একজন পুলিশ এলে পুরো মহল্লাই আতঙ্কিত থাকত। এখন মানুষের মনে আর পুলিশভীতি নেই। এভাবে আমাদের আন্দোলন চলতে থাকলে আমরা ইংরেজদের তাড়াতে সক্ষম হব। আমরা স্বাধীনতার স্বাদ পাব।

একথার উত্তরে হযরত থানভী (রহ.) খুবই বিজ্ঞজনোচিত কথা বলেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, আপনারা মানুষের অন্তর থেকে পুলিশভীতি উঠিয়ে দিয়ে ভালো করেননি। কারণ, পুলিশের ভয় অন্তর থেকে চলে যাওয়ার অর্থ হলো, চোর-ডাকাতের মোক্ষম সময় এসেছে। তারা এখন চুরি-ডাকাতিসহ সবকিছুই নির্দ্বিধায় করবে। কারণ, লাল টুপির ভয় নেই। যদি লাল টুপির ভয় বের করে সবুজ টুপির ভয় ঢুকিয়ে দিতে পারতেন, তাহলে ভাল করতেন। তখন এটা হত একটা সফলতা। এখন তো তাদের অন্তরে কোনো টুপিভীতিই নেই। এখন সমাজ-কাঠামো ঠিক থাকবে না। সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলায় ব্যাঘাত ঘটবে। আপনাদের এ অবদান আমি প্রশংসার দৃষ্টিতে দেখছি না।

অন্তরে ভয় নেই

কথাটি হযরত থানভী (রহ.) বলেছিলেন আজ থেকে ষাট বছর পূর্বে। আজ সেকথার বাস্তব নমুনা আমরা প্রতিদিন দেখতে পাচ্ছি। মানুষের অন্তর আজ ভয়শূন্য। সমাজে নিরাপত্তার অভাব। প্রশান্তি নেই, শৃঙ্খলা নেই। সমাজের উপর ঝড় বয়ে চলছে। অন্যথায় ইংরেজ আমলের একজন লোক খুন হলে সমগ্র ভারতে হৈ চৈ শুরু হত। খোঁজখবর আরম্ভ হয়ে যেত। কিন্তু আজ মানুষের মূল্য আছে কি? মানবজীবনের আজ কী দাম?

আল্লাহর ভয় পয়দা করুন

মোটকথা, পৃথিবীর সম্পূর্ণ শৃঙ্খলা নির্ভর করছে ভীতিরই উপর। ভয় নেই তো শান্তি-শৃঙ্খলা নেই। এজন্যই কুরআন মজীদে বারবার গুরুত্বের সাথে বলা হয়েছে :

اِتَّقُوْا اللّٰهَ

আল্লাহকে ভয় করো।'

আর তাকওয়া তথা আল্লাহভীতির অর্থ হল, তাঁর ভয়ে অন্যায় কাজ থেকে বিরত থাকা। দুনিয়ার আইন-শৃঙ্খলা যেমনিভাবে ভয় ছাড়া অচল, অনুরূপভাবে ইসলামের ভিত্তি ভয় ছাড়া অর্থহীন। আল্লাহ না করুন, যদি মানুষের অন্তর থেকে আল্লাহর ভয় বিদায় নিয়ে যায়, তাহলে পৃথিবী আল্লাহর নাফরমানিতে ছেয়ে যাবে। যার বাস্তব চিত্র আমরা আজ প্রত্যক্ষ করছি। কুরআন মজীদে কোথাও আলোচনা করা হয়েছে জান্নাতের কথা, কোথাও বা জাহান্নামের কথা, কোথাও আলোচিত হয়েছে আল্লাহর মহান মর্যাদা ও অসীম শক্তির কথা। যেন মানুষ ভাবে এবং আল্লাহকে ভয় করে।

নিরাশায় আল্লাহর ভয়

পুলিশের ভয়, জেল ও শাস্তির ভয় মানুষকে লোকালয়ে অপরাধ করা থেকে বিরত রাখে। এগুলোর ভয়ে সে লোকালয়ে অপরাধ করে না। কিন্তু কারো হৃদয়ে যদি আল্লাহর ভয় সৃষ্টি হয়ে যায়, তাহলে সে রাতের অন্ধকারে নির্জন নিভৃতেও অপরাধ করবে না।

গহীন জঙ্গল, তমসাচ্ছন্ন রজনী। একাকি, সঙ্গে কেউ নেই। মোক্ষম সুযোগ। চাইলেই অপরাধ করতে পারবে, সেখানেও একজন মুমিন বান্দা অপরাধ করে না একমাত্র আল্লাহর ভয়ে।

রোযা অবস্থায় আল্লাহভীতি

আল্লাহভীতির দৃষ্টান্ত দেখুন। রমযান মাস, প্রচণ্ড গরম। তৃষ্ণায় জিহ্বা বেরিয়ে আসার উপক্রম। এদিকে দরজা বন্ধ। ঘরে আর কেউ নেই। ফ্রিজ আছে। ফ্রিজে শীতল পানি আছে। নফস তাড়া দিচ্ছে, একটু শীতল পানি দ্বারা কলিজা ঠাণ্ডা করে নাও।

কিন্তু বলুন তো, এই পাপপূর্ণ যুগের কি কোনো মুসলমান রোযা রাখা অবস্থায় গ্লাস ভরে পানি পান করছে? না, সে পানি পান করে না। তার ঈমানের দাবীতে করে না। অথচ তার অবস্থান নির্জন কক্ষে, দেখার কেউ নেই। সমালোচনা করারও কেউ নেই। ইচ্ছা করলে তখন তৃপ্তির সাথে পানি পান করে সন্ধ্যায় সকলের সাথে বেশ করে ইফতার করতে পারে। অথচ সে এরূপ করে না, তাকে নির্জন কক্ষে কে বাধা দিচ্ছে? একমাত্র আল্লাহর ভয়। রোজা রাখতে-

রাখতে আমাদের অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। অভ্যাসের সাথে-সাথে সৃষ্টি হয়েছে আল্লাহর ভয়। সে ভয়ই আমাদেরকে এভাবে নিয়ন্ত্রণ করে।

সকল অঙ্গনে প্রয়োজন আল্লাহভীতি

ইসলামের শিক্ষা হল, রোযার ক্ষেত্রে যেভাবে আল্লাহর ভয় মানুষকে নির্জন কক্ষেও নিয়ন্ত্রণ করে, এভাবে সকল ক্ষেত্রেই আল্লাহর ভয় অপরিহার্য। দৃষ্টি অন্যায় জায়গায় চলে গেলে সেখান থেকে আল্লাহর ভয়ে সেই কুদৃষ্টিকে ফিরিয়ে আনতে হবে। নফস প্ররোচনা দেয় গীবত করতে, মিথ্যা বলতে। এক্ষেত্রেও আল্লাহর ভয়ে জিহ্বাকে সংযত রাখা আবশ্যক। এটাই কাম্য। সকল অঙ্গনে যদি আল্লাহভীতি কার্যকর থাকে, তাহলে বান্দা তার সন্তুষ্টির পরিপন্থী কোনো কাজ করবে না।

জান্নাতে কে যাবে?

কুরআন মজীদে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন :

وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوٰى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوٰى -

"আর যে ব্যক্তি আপন প্রভুর সমীপে উপস্থিত হওয়াকে ভয় করে এবং স্বীয় প্রবৃত্তিকে কামনা থেকে বিরত রাখে, তার ঠিকানা হবে জান্নাত।"

-(সূরা নাযি'আত : ৪০-৪১)

অর্থাৎ– আল্লাহর ভয়ে যে ব্যক্তি হারাম ও নাজায়েয কাজ-কর্ম বর্জন করে চলে, সে-ই জান্নাতী।

জান্নাত : কষ্ট-পরিবেষ্টিত শান্তির ঠিকানা

এক হাদীসে নবীজী (সা.) বলেছেন :

اِنَّ الْجَنَّةَ حُفَّتْ بِالْمَكَارِهِ -

' জান্নাতকে এমনসব বস্তু দ্বারা পরিবেষ্টিত করে রাখা হয়েছে, যাকে মানুষ অপছন্দ করে, কষ্টকর মনে করে।'

অর্থাৎ– কষ্টের কাজ, নফসবিরোধী সমূহ কাজ দিয়ে ঘিরে রাখা হয়েছে জান্নাতকে। সুতরাং কাউকে জান্নাতে যেতে হলে এসব কামনা-বাসনাবিরোধী কাজ করে, প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে জয়ী হতে হবে। এ ছাড়া কোনো

বিকল্প নেই। এইজন্যই বলি, আল্লাহর ভয় অবশ্যই প্রয়োজন। এর দ্বারা মানুষ গুনাহ থেকে বাঁচতে পারে। চলতে পারে জান্নাতের কঠিন বন্ধুর পথে। আল্লাহর ভয় এত তীব্র হতে হবে, প্রতিটি কাজের পূর্বে যেন আমার মনে এই ভাবনা জাগে যে, কাজটি আমার প্রভু পছন্দ করবেন তো?

সাহাবায়ে কেরামের মাঝে এই ভয় ছিল। এ কারণেই তাঁরা নবীজীর দরবারে এসে কান্না জুড়ে দিতেন এই বলে : হে আল্লাহর রাসূল! আমি অন্যায় করে ফেলেছি। আপনি আমাকে শাস্তি দিন, আমাকে পবিত্র করে দিন।

মানুষের মাঝে এই ভয় ধীরে-ধীরে বাড়তে থাকে এবং সতেজ হয়। তখন সে কেবল গুনাহকেই ভয় পায় না, বরং তার কৃত ইবাদত আল্লাহর মনোঃপুত হচ্ছে কি-না তারও ভয় পায়। ভীতি-শঙ্কায় বুক দুরু-দুরু করে, আমার ইবাদত আল্লাহর দরবারে পৌছার উপযুক্ত হয়েছে তো? অর্থাৎ– সত্যিকার বান্দারা আল্লাহকে সন্তুষ্টি করার লক্ষ্যে কাজ করার পরেও ভয় পায় যে, এর মধ্যেও আবার কোনো ক্রটি হয়ে যায়নি তো? এতেও কোনো প্রকার বেআদবি রয়ে যায়নি তো? এদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন :

تَتَجَافَىٰ جُنُوْبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا –

'রাতের বেলা তাদের পিঠ বিছানায় লাগে না, তাঁরা ভয় ও আশা নিয়ে প্রভুকে ডাকতে থাকে।' –(সূরা সেজদা : ১৬)

অর্থাৎ– তারা আল্লাহর ইবাদতে নিদ্রাহীন রজনী কাটায়। তারা যখন আল্লাহকে ডাকে, তখন তাদের অন্তরে ক্ষমা ও মাগফেরাতের গভীর আশা থাকে। অন্যদিকে প্রচণ্ড ভয় থাকে– আমার ইবাদতে কোনো ক্রটি হচ্ছে না তো?

নেক বান্দার অবস্থা

নেক বান্দাদের প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা অন্য এক আয়াতে বলেছেন :

كَانُوْا قَلِيْلاً مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُوْنَ – وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُوْنَ –

"আল্লাহর নেক বান্দারা রাতের বেলা কমই ঘুমায়। আর শেষ রাতে তারা ক্ষমা প্রার্থনা করে।" –(সূরা যারিয়াত : ১৭-১৮)

অর্থাৎ– সারারাত ইবাদত-বন্দেগী করে ভোর রাতে এসে আল্লাহর দরবারে নিজ গুনাহের ক্ষমা চায়। হাদীস শরীফে এসেছে, হযরত আয়েশা (রা.) রাসূল (সা.)-কে প্রশ্ন করেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ! ভোর রাত তো ক্ষমা প্রার্থনার সময় নয়। যেহেতু ক্ষমা প্রার্থনা হয় কোনো গুনাহের পর। আর এসব নেক বান্দা তো

সারারাত আল্লাহর ইবাদত করেছে। রাতে এরা ক্ষমা প্রার্থনা করবে কোন গুনাহের? রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন : তারা ক্ষমা চায় ইবাদত থেকে। যেহেতু ইবাদতের হক্ক আদায় হয়নি। যেভাবে ইবাদত করার দরকার ছিল, সেভাবে ইবাদত করা হয়নি। তাই তারা ক্ষমা চায়।

যে যতটুকু জানে, সে ততটুকু ভয় পায়

ভয়-ভীতির ব্যাপারে একটি মূলনীতি হল, মানুষ যতটুকু জানে, ততটুকু ভয় পায়। পক্ষান্তরে যারা আল্লাহ সম্পর্কে যতটুকু অজ্ঞ তারা ভয় পায় তত কম। যে নির্বোধ কিছুই বোঝে না, তার সামনে প্রেসিডেন্ট, মন্ত্রী, পুলিশ সকলেই সমান। কিন্তু যার জানা আছে, প্রেসিডেন্টের মর্যাদা কতখানি, সে প্রেসিডেন্টের সামনে যেতেই ভয়ে কেঁপে ওঠে। আল্লাহকে সবচে' বেশি জানতেন, চিনতেন নবীগণ। অতঃপর সাহাবায়ে কেরাম।

হযরত হানযালা (রা.)-এর আল্লাহভীতি

বিশিষ্ট সাহাবী হযরত হানযালা (রা.)। কাঁপতে-কাঁপতে এলেন দরবারে রিসালাতে। এসে আরজ করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! হানযালা তো মুনাফিক হয়ে গেছে। নবীজি বললেন, আচ্ছা, হানযালা আবার মুনাফিক হল কী করে? হানযালা বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা যখন আপনার দরবারে থাকি, জান্নাতের কথা শুনি, জাহান্নামের কথা শুনি, আখেরাতের কথা শুনি তখন আমাদের অন্তর আখেরাতের চিন্তায় একেবারে নরম হয়ে যায়। আমরা ধীরে ধীরে পবিত্র হয়ে উঠি।

কিন্তু আমরা যখন বাড়িতে যাই, স্ত্রী-সন্তানদের সাথে উঠা-বসা করি, তখন আমাদের সবকিছুই বদলে যায়। ভেতরটা আবার অন্ধকার হয়ে যায়। সুতরাং এই যে আপনার দরবারে এলে এক অবস্থা, বাইরে গেলে অন্য অবস্থা এর নামই তো মুনাফিকী। এটাই তো মুনাফিকের আলামত। উত্তরে রাসূল (সা.) বললেন :

يَاحَنْظَلَةُ! سَاعَةً سَاعَةً -

'হানযালা! ভয়ের কিছুই নেই। এই অবস্থা মাঝে-মাঝে সৃষ্টি হয়ে থাকে। অন্তর মাঝে-মাঝে আখেরাতের ভয়ে গলে যায়। আবার মাঝে মধ্যে একটু শক্ত হয়ে যায়। তবে মানুষের পরিণাম নির্ভর করে মানুষের আমলের উপর। মানুষের অনিবার্য কর্তব্য হলো, শরিয়তপরিপন্থী কোনো কাজ না করা।

হযরত উমর (রা.) এবং আল্লাহর ভয়

হযরত উমর (রা.)। মুসলিম উম্মাহর দ্বিতীয় খলীফা, যিনি নিজকানে নবীজির মুখ থেকে শুনেছেন :

عُمَرُفِى الْجَنَّةِ -

উমর জান্নাতে যাবে।

উমর (রা.) আরো শুনেছেন, রাসূল (সা.) বলেছেন : আমি যখন মিরাজে গিয়েছি, তখন সেখানে একটি সুরম্য অট্টালিকা দেখেছি। দেখলাম সেই অনুপম সুরম্য অট্টালিকার পাশে বসে এক অনিন্দ্যসুন্দরী নারী অযু করছে। জিজ্ঞেস করলাম, মহিলাটি কার? বলা হল, এ উমরের। তখন আমার সাধ জাগল, একটু ভিতরে গিয়ে দেখি। এত মনকাড়া অট্টালিকা! কিন্তু হে উমর! আমি তোমার আত্মমর্যাদাবোধ সম্পর্কেও জানি। তাই আমি ভেতরে না ঢুকেই ফিরে এলাম। এ কথা শুনে হযরত উমর (রা.) চোখের পানি ছেড়ে দিয়ে বলেছিলেন :

اَوَعَلَيْكَ يَارَسُوْلَ اللهِ اَغَارٌ؟

ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার সঙ্গেও কি আমি মর্যাদাবোধ দেখাবো?

একটু চিন্তা করুন, হযরত উমর (রা.), যিনি নবীজির মুখে জান্নাতের সুসংবাদ শুনেছেন। তারপরও নবীজির ইন্তেকালের পর তিনি হুযায়ফা (রা.)-এর দরবারে গিয়ে হাজির হয়ে জিজ্ঞেস করছেন : নবীজি (সা.) মুনাফিকদের যে তালিকাটি তোমাকে দিয়েছেন, সেখানে আমার নাম নেই তো?

মনে কত ভয়। নবীজী (সা.) আমাকে জান্নাতী বলেছেন। কিন্তু তার ইন্তেকালের পর আমার বদ-আমলের কারণে হয়ত সেই সৌভাগ্যটি ধরে রাখতে পারিনি। দেখুন, হযরত উমর (রা.)-এর মতো মহামানবের এমন ভয়। আসলেই যে ব্যক্তি যতখানি জানে, তার ভয় ততখানি। এছাড়া মানুষ গুনাহমুক্ত হতে পারে না। মুত্তাকি হতে পারে না।

ভয় সৃষ্টির উপায়

আল্লাহর ভয় সৃষ্টি করা অপরিহার্য। এটা সৃষ্টি করার পদ্ধতি হল, প্রতিদিন সকালে কিংবা রাতে বসে ধ্যান করতে হবে যে, এখন আমি মারা যাচ্ছি। মৃত্যুশয্যায় শায়িত আমি। আমার চারপাশে আত্মীয়-স্বজনরা বসে আছে, তারা কান্নাকাটি করছে। আমার প্রাণবায়ু উড়ে যাচ্ছে। আমাকে কাফন দেয়া হচ্ছে। সমাধিস্থ করা হচ্ছে।

বসে-বসে একটু এভাবে ধ্যান করুন। প্রতিদিন করুন। ইনশাআল্লাহ ধীরে-ধীরে অন্তত আল্লাহর ভয় সৃষ্টি হবে। আলস্য আর গাফলতির পর্দা সরে যাবে। আমরা মৃত্যুকে স্মরণ করি না। তাই আমরা গাফেল হয়ে পড়ে আছি। নিজ হাতে আমরা আত্মীয়-স্বজনকে কবরে রেখে আসি। নিজের কাঁধে করে জানাযা বহন করি। কত মানুষকে এই পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে দেখি যে সম্পদের পেছনে মানুষ উদ্ভ্রান্তের মত দৌড়ায়, সকাল-সন্ধ্যা মাথার ঘাম পায়ে ফেলে যাওয়ার সময় একবার সেই সম্পদের প্রতি তাকাবারও সুযোগ পায় না।

এসব কিছু আমাদের চোখের সামনেই ঘটে। ভাবি, আহা! সে মারা গেল। অথচ ভাবি না, আমার জীবনেও একদিন এই মৃত্যু আসবে। আমাকেও চলে যেতে হবে যে কোনো মুহূর্তে– ঠিক একইভাবে। তাই তো রাসূল (সা.) বলেছেন :

اَكْثِرُوْا ذِكْرَهَاذِمِ اللَّذَّاتِ الْمَوْتِ

'সকল স্বাদের হন্তা মৃত্যুকে বেশি-বেশি স্মরণ করো।'

মৃত্যুকে এভাবে ধ্যান করার নাম মুরাকাবাহ। প্রতিদিন কিছু সময় 'মুরাকাবাহ' করা উচিত। তাহলে আল্লাহর ভয় কিছু না কিছু অবশ্যই সৃষ্টি হবে।

তাকদীর-ই শেষ কথা

হাদীস শরীফে এসেছে, রাসূল (সা.) ইরশাদ করেছেন : তোমাদের কেউ কেউ জান্নাতী মানুষের মতো আমল করতে থাকে। আমল করতে-করতে সে একেবারে জান্নাতের কাছে চলে যায়। জান্নাতের আর তার মাঝে দূরত্ব থাকে মাত্র এক হাত। অতঃপর তাকদীরের নিকট সে পরাজিত হয়। সে এখন কিছু কাজ করে বসে যে, একেবারে জাহান্নামে ঢুকে পড়ে।

পক্ষান্তরে আরেক ব্যক্তি সারা জীবন জাহান্নামের পথে চলে। জাহান্নাম আর তার দূরত্ব যখন মাত্র এক হাত, তখনই তার তাকদীর শুভ হয়ে দেখা দেয়। তাকদীর বিজয়ী হয়। জীবন তার পাল্টে যায়। জান্নাতের আমল করা শুরু করে। অবশেষে জান্নাতে প্রবেশ করে।

আমল নিয়ে বড়াই করতে নেই

আলোচ্য হাদীসে এ কথাই ফুটে ওঠে যে, আমল নিয়ে গর্ব করা নিষেধ। এটাই নবীজির শিক্ষা। 'এই আমল করছি, ওই আমল করছি' এরূপ বলতে নেই। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন :

اَنَّمَا الْعِبْرَةُ بَالْخَوَاتِيْمِ

'জীবনের অবসান যে আমলের উপর হবে, তা-ই বিবেচনার বিষয়।'

অর্থাৎ– দেখার বিষয় হল, মৃত্যু কোন আমলের উপর হয়েছে। লক্ষ্য রাখতে হবে, আমলের অহমিকা যেন জাহান্নামের দিকে ঠেলে না দেয়। তাই আমল করার সময় অন্তরে ভয় রাখতে হবে।

বদ-আমলের অশুভ পরিণতি

ভালো করে বুঝে নিন, কাউকে দিয়ে জবরদস্তিমূলক জাহান্নামের আমল করিয়ে তাকে জাহান্নামে ফেলে দেয়া হবে না। বরং সকল আমলই সে নিজ ইচ্ছায় করবে। কিন্তু এটা তার আমলের অশুভ পরিণতি যে, তার আমলই অনেক সময় অতীতের সকল নেক আমল নষ্ট করে দেয়। তাকে টেনে নিয়ে যায় মন্দ আমলের দিকে।

এক গুনাহ টেনে নিয়ে যায় আরেক গুনাহর প্রতি। পাপ পাপকে টানে। দ্বিতীয় পাপকার্য লোভ সৃষ্টি করে তৃতীয় পাপকর্মের প্রতি। এভাবে পুরো জীবনটাই পাপকার্যে ঢেকে যায়। পাপের অতলান্ত সাগরে সে আকণ্ঠ ডুবে যায়।

তাই বুযুর্গানে দ্বীনের বক্তব্য হল, পাপ যত ছোটই হোক না কেন পাপ পাপই। হতে পারে ছোট্ট একটি পাপ তোমার জীবনের সঞ্চিত সকল আমলকে ধ্বংস করে দেবে।

বুযর্গদের সাথে বেআদবির পরিণতি

বুযুর্গদের অশ্রদ্ধা করা, তাঁদের সঙ্গে বেআদবি করা, তাঁদের মনে কষ্ট দেয়া খুবই খারাপ কাজ। এগুলোর কারণে মানসিক বিপর্যয় ঘটে। পথ থেকে ছিটকে পড়ে। তাই বুযুর্গদের সাথে মতের কোনো অমিল দেখা দিলে ওটা মতানৈক্য পর্যন্তই থাকতে দাও। সামনে অগ্রসর হয়ো না। কারণ, বেআদবি পর্যন্ত চলে যাওয়া মোটেই কল্যাণকর নয়। এর ফলে মানুষ গুনাহর জালে ফেঁসে যায়।

নেক আমলের বরকত

ক্ষেত্রবিশেষে দেখা যায়, এক ব্যক্তি মন্দকাজে আকণ্ঠ ডুবে ছিল। হঠাৎ একটি নেক কাজ করার তাওফীক হয়ে গেছে তার। এই তাওফীকও কোনো নেক আমলের বরকতেই হয়ে থাকে। যেমন– প্রথমে হয়ত কোনো ছোট্ট নেক আমলের তাওফীক হয়েছিল। তারই বরকতে আরো অধিক এবং বড় নেক

আমলের সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছেন মহান আল্লাহ। এরই বরকতে জান্নাতের দরজাও খুলে গেছে। তাই নবীজি (সা.) বলেছেন :

لَايَحْقِرَنَّ اَحَدُمِنَ الْمَعْرُوْفِ شَيْئًا –

তোমাদের কেউ যেন নেক আমলকে ছোট মনে না করে। কারণ, হতে পারে এ ছোট্ট নেক আমলটিই তোমার জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দেবে। এনে দেবে জীবনের সর্বোচ্চ সাফল্য। এরই বরকতে হয়ত আল্লাহ তাআলা তোমার জীবনের সকল গুনাহ মাফ করে দেবেন। বুযুর্গানে দ্বীনের এ রকম বহু কাহিনী আছে যে, সামান্য নেক আমলের বরকতে আল্লাহ তাআলা তাদের জীবনে বিপ্লব সৃষ্টি করে দিয়েছেন। তাঁরা হয়ে গেছেন জগতখ্যাত ওলী-আল্লাহ।

তাকদীরের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য

কেউ-কেউ আবার মন্তব্য করে থাকে, কে জাহান্নামী আর কে জান্নাতী এটা যখন তাকদীরে লিপিবদ্ধ আছে, তাহলে নেক আমল করে লাভ কী? যা হবার তা তো লিপিবদ্ধ হয়ে গেছেই। ভালোভাবে জেনে রাখুন, হাদীসটির অর্থ কিন্তু এটা নয় যে, তাকদীরে যা লেখা আছে, তুমি তা-ই করবে। বরং হাদীসের মর্মার্থ হল, তুমি স্ব-ইচ্ছায় যা করবে, তাই তাকদীরে লিপিবদ্ধ হয়েছে। তাকদীর তো আল্লাহ্র ইল্মের নাম। তোমরা স্ব-ইচ্চায় যা করবে, আল্লাহ্ পূর্ব থেকেই তা জানতেন। তাই তিনি এসবই লাওহে মাহফুজে লিখে রেখেছেন। কিন্তু তোমরা জান্নাতে যাবে, না জাহান্নামে যাবে তা পুরোটাই নির্ভর করে তোমাদের আমলের উপর। এমন নয় যে, মানুষ আমল যেটাই করুক তাকদীরে যা লেখা আছে সেটাই হবে। বরং যা সে করবে তাকদীরে শুধু তা-ই লেখা আছে। কারণ, আল্লাহ তাআলা মানুষকে কর্মের স্বাধীনতা দিয়েছেন। সে তার ইচ্ছামাফিক সব কিছুই করতে পারে।

সুতরাং তাকদীরের উপর ভরসা করে বসে থাকা জায়েয নয়। বসে থাকার সুযোগও নেই। রাসূল (সা.)-কে প্রশ্ন করা হয়েছিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কে জান্নাতি আর কে জাহান্নামি তা যখন লেখাই আছে, তাহলে আমল করে কি লাভ হবে? তিনি উত্তর দিয়েছিলেন :

اِعْمَلُوْا فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَه –

'তোমরা আমল করতে থাক। কারণ, যাকে যে কাজের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে, সে সেটাই করবে।'

নিশ্চিত হয়ে বসে থেক না

তাকদীর সংক্রান্ত কথাগুলো এজন্য বলেছি, যাতে কেউ আমলের উপর ভরসা করে নিশ্চিত হয়ে বসে না থাকে। যেন না ভাবে, আমি এত নফল পড়েছি, তাসবীহ পড়েছি, যিকির করেছি, আমার আর চিন্তা কিসের। বরং মানুষকে তার জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত চেষ্টা করতে হবে, ভাবতে হবে। আখেরাত, নাজাত ও সর্বশেষ পরিণাম সম্পর্কে চিন্তা করতে হবে। উদ্বিগ্ন থাকতে হবে, আমি আবার বিপথে চলে যাচ্ছি না তো!

জাহান্নামের সবচে' লঘু শাস্তি

রাসূল (সা.) ইরশাদ করেছেন : কিয়ামতের দিন যাকে সবচে' সহজ শাস্তি দেয়া হবে, তার অবস্থা হবে তার পায়ের নিচে দুটি জ্বলন্ত কয়লা রেখে দেয়া হবে। কিন্তু এত প্রচণ্ড গরম হবে যে, মাথার মগজ মোমের মত গলে পড়বে। সে ভাববে, আমিই সবচে' যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি ভোগ করছি। অথচ তার শাস্তিই হবে সবচে লঘু।

কোনো বর্ণনায় আছে, এই শাস্তিটা হবে রাসূল (সা.)-এর চাচা আবু তালিবের। কারণ, তিনি রাসূল (সা.)-কে অনেক সহযোগিতা করেছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ইসলাম কবুল করেননি। আল্লাহ্ ভালো জানেন। বলার উদ্দেশ্য হল, সবচে' লঘু ও সহজ শাস্তির অবস্থা এই। সুতরাং বিভিন্ন শাস্তির যে হুমকি দেয়া হয়েছে, তা কতটা কঠিন, মর্মন্তুদ ও দুর্বিষহ হবে, তা মানুষ কল্পনা করতে পারবে কি? সেই জঘন্য শাস্তির কথা একটু ভাবা দরকার। এতে কিছুটা হলেও মনে আল্লাহ্ভীতি আসবে। তাকওয়া সৃষ্টি হবে।

জাহান্নামীদের শ্রেণীভাগ

এক হাদীসে রাসূল (সা.) জাহান্নামীদের বিভিন্ন শ্রেণীর কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি ইরশাদ করেছেন : কিছু কিছু জাহান্নামীর অবস্থা হবে এমন যে, তাদের পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত আগুন থাকবে। পায়ের তলার আগুনের তাপে মাথার মগজ গলে-গলে পড়বে। কারো-কারো আগুন থাকবে হাঁটু পর্যন্ত। কারো স্পর্শ করবে কোমর পর্যন্ত। কেউ-কেউ থাকবে আগুনে আকণ্ঠ নিমজ্জিত।

আরেকটি হাদীসে নবীজী (সা.) বলেছেন, কিয়ামত দিবসে এত বেশি ঘাম বের হবে যে, একজনের ঘামে সত্তর হাত পর্যন্ত ভূমি সিক্ত হয়ে যাবে। ঘামের বন্যায় সে কোমর পর্যন্ত ডুবে থাকবে।

অতল জাহান্নাম

অন্য এক হাদীসে এসেছে : হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, একদিন আমরা রাসূল (সা.)-এর দরবারে উপস্থিত ছিলাম। এমন সময়ে রাসূল (সা.) কিছু একটা পতিত হওয়ার আওয়াজ শুনলেন। তিনি আমাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন : তোমরা বলতে পারবে কি এটা কিসের আওয়াজ? সাহাবায়ে কেরাম বললেন : আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলই অধিক অবগত।

নবীজি (সা.) ইরশাদ করলেন : সত্তর বছর আগে জাহান্নামে একটি পাথর ফেলা হয়েছিল। আজ সত্তর বছর পর তা জাহান্নামের তলায় পৌছল। এটা সেই পাথর পড়ার আওয়াজ।

এটা কোনো অতিশয়োক্তি নয়। বিজ্ঞানের চরম উৎকর্ষতার যুগে এটা বোঝা অতি সহজ। বিজ্ঞানের একটি কথা আছে, এমন নক্ষত্রও আছে, যেগুলো সৃষ্টি হওয়ার পর থেকে তার আলো পৃথিবীর দিকে আসা শুরু করেছে। কিন্তু আজও পৃথিবী পর্যন্ত এসে পৌছুতে পারেনি। এত বিশাল জগত যিনি সৃষ্টি করেছেন, তার পক্ষে এই বিশাল জাহান্নাম সৃষ্টি নিতান্তই মামুলি ব্যাপার। আল্লাহ্ আমাদেরকে এই ভয়াবহ জাহান্নাম থেকে হেফাজত করুন।

এসব হাদীসের সারকথা হল, মানুষের জন্য উচিত মাঝে-মাঝে জান্নাত-জাহান্নামের কথা স্মরণ করা। আখেরাতের ধ্যান করা। অন্তরে আল্লাহ্র ভয় সৃষ্টি করা। নিঃসন্দেহে একমাত্র আল্লাহ্র ভয়ই পারে মানুষকে পবিত্র, সুন্দর ও সর্বোত্তম হিসাবে গড়ে তুলতে।

আল্লাহ্ আমাদের সকলের হৃদয়কে তাঁর ভয় ও ভালবাসায় পরিপূর্ণ করে দিন। আমীন।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ -

আত্মীয়–স্বজনের সঙ্গে সদাচরণ

"শরীয়ত মূলত অধিকার আদায়ের নাম। হয় আল্লাহর অধিকার কিংবা বান্দার অধিকার। আল্লাহর একেক বান্দার অধিকার একেক রকম। গোটা শরীয়ত এসব অধিকারের আলোচনায় ভরপুর। এসব অধিকারের একটি অধিকারও যদি অনাদায়ী থাকে, শরীয়তও তার বেলায় অপূর্ণ থাকে। কেউ আল্লাহর হক আদায় করলো, কিন্তু বান্দার হক আদায় করলো না, তাহলে এটা পরিপূর্ণ দ্বীন পালন হলো না। এসব অধিকারের মধ্যে আত্মীয়–স্বজনের অধিকার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।"

"আত্মীয়–স্বজনের অধিকার ও আত্মীয়তার বন্ধন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ কথাগুলো আমরা প্রত্যেকেই মুখে–মুখে উচ্চারণ করে থাকি, কিন্তু কজন আছে, যারা এ বিষয়টির প্রতি পরিপূর্ণ আন্তরিক?"

আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে সদাচরণ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ، وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّاٰتِ اَعْمَالِنَا، مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِىَ لَهُ، وَاَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَاَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَسَنَدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ .... صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا كَثِيْرًا — اَمَّا بَعْدُ:

فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى خَلَقَ الْخَلْقَ، حَتّٰى اِذَا فَرَغَ مِنْهُ قَامَتِ الرَّحِمُ فَقَالَتْ: هٰذَا مَقَامُ الْعَائِذِبِكَ مِنَ الْقَطِيْعَةِ قَالَ: نَعَمْ اَمَا تَرْضَيْنَ اَنْ اَصِلَ مَنْ وَصَلَكَ وَاَقْطَعَ مَنْ قَطَعَكَ، قَالَتْ: بَلٰى قَالَ: فَذٰلِكَ لَكَ -

ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اِقْرَأُوْا اِنْ شِئْتُمْ: فَهَلْ عَسَيْتُمْ اِنْ تَوَلَّيْتُمْ اَنْ تُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ وَتُقَطِّعُوْا اَرْحَامَكُمْ - اُوْلٰئِكَ الَّذِيْنَ لَعَنَهُمُ اللّٰهُ فَاَصَمَّهُمْ وَاَعْمٰى اَبْصَارَهُمْ -

(مسلم، كتاب البر والصلة باب صلة الرحم)

হাম্‌দ ও সালাতের পর!

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন, আল্লাহ সৃষ্টিকে সৃষ্টি করে যখন অব্যাহতি নিলেন, তখন নৈকট্য ও আত্মীয়তার বন্ধন দাঁড়িয়ে গেলো। অপর একটি হাদীসে এসেছে, আল্লাহ তা'আলার আরশের খুঁটি ধরে দাঁড়িয়ে গেলো। প্রশ্ন হলো, এরা দাঁড়ালো কীভাবে? মূলত এ প্রশ্নের সদুত্তর আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সা.)-ই ভালো জানেন। এটা আমার বোধগম্য নয়। কারণ, নৈকট্য ও আত্মীয়তা এমন বিষয়, যার কোনো আকৃতি নেই। এমন বেশ কিছু বিষয় রয়েছে– যাদের কোনো রূপ নেই। পরকালে আল্লাহ তাদেরকে দৈহিক আকৃতি দান করবেন।

যাহোক, আত্মীয়তার বন্ধন দাঁড়িয়ে গেলো এবং আল্লাহ তা'আলার নিকট আবেদন করলো, হে আল্লাহ! এমন একটি স্থানে আমার অধিকার ক্ষুণ্ন হওয়া থেকে আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করছি। অর্থাৎ– দুনিয়াতে মানুষ আমার হক ক্ষুণ্ন করবে। এ থেকে আপনার নিকট আশ্রয় কামনা করি। কেউ যেন আমার হক নষ্ট না করতে পারে।

উত্তরে আল্লাহ বললেন, তুমি কি এর উপর সন্তুষ্ট নও যে, আমি ঘোষণা করে দিই, যে ব্যক্তি তোমার অধিকার পদদলিত করবে, আমি তাকে শাস্তি দেব এবং তার অধিকার আমি পূরণ করবো না? এবার আত্মীয়তার বন্ধন বলে উঠলো, হে আল্লাহ, আমি সন্তুষ্ট। তারপর আল্লাহ বললেন, এই মর্যাদা আমি তোমাকে দিলাম এবং ঘোষণা করছি, যে ব্যক্তি আত্মীয়তার হকের প্রতি যত্নশীল হবে এবং স্বজনদের সঙ্গে সদাচরণ করবে, আমিও তার সঙ্গে কোমল আচরণ করবো। আর যে ব্যক্তি আত্মীয়তার হক খর্ব করবে, আমিও তার অধিকার অপূর্ণ রাখবো।

উক্ত ঘটনা ও হাদীস বর্ণনা করার পর রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, ইচ্ছা হলে এ আয়াতটি তেলাওয়াত করে নিতে পার। কেননা, আয়াতটিতে আল্লাহ তা'আলা মানবজাতিকে সম্বোধন করে বলেছেন–

فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوْا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوْا أَرْحَامَكُمْ – أُوْلَئِكَ الَّذِيْنَ لَعَنَهُمُ اللّٰهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمٰى أَبْصَارَهُمْ –

'ক্ষমতা লাভ করলে সম্ভবত তোমরা পৃথিবীতে অনর্থ সৃষ্টি করবে এবং আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করবে। এদের প্রতিই আল্লাহ তা'আলা অভিসম্পাত করেন। তারপর তাদেরকে বধির ও দৃষ্টিশক্তিহীন করেন। (সূরা মুহাম্মদ : ২২-২৩)

এ মর্মে আরেকটি আয়াত

আসলে আলোচ্য হাদীসটি ওইসব আয়াতের ব্যাখ্যা, যেসব আয়াতে আল্লাহ তা'আলা আত্মীয়তার হকের আলোচনা করেছেন। সেগুলোতে তিনি স্বজনদের সঙ্গে সদাচরণের কথা বলেছেন। এজন্যই বিয়ের খুতবায় রাসূলুল্লাহ (সা.) এ আয়াতটি তেলাওয়াত করতেন–

وَاتَّقُواْ اللّٰهَ الَّذِيْ تَسَاءَلُوْنَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ -

'আর তোমরা আল্লাহকে ভয় করো, যার নামে তোমরা একে অপরের নিকট অধিকার দাবি করে থাক এবং আত্মীয়-স্বজনের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করো।' –(সূরা নিসা : ১)

অর্থাৎ– অপরের নিকট অধিকার আদায়ের সময় মানুষ সাধারণত আল্লাহর নাম নিয়ে বলে থাকে, আল্লাহর ওয়াস্তে আমার পাওনাটা বুঝিয়ে দাও। সুতরাং যে আল্লাহর দোহাই দিয়ে তোমরা অধিকার আদায় করে থাকেন, তাকে ভয় করো। তাঁর বিরোধিতা করো না। আর আত্মীয়দের অধিকারের ব্যাপারেও আল্লাহকে ভয় করো। যদি তাদের অধিকারকে আহত কর, তাহলে এর জন্য পরকালে শাস্তি ভোগ করতে হবে। এভাবে কুরআন মজীদ হাদীস শরীফে আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করার প্রতি অত্যধিক গুরুত্ব দেয়া হয়েছে।

শরীয়ত অধিকার আদায়ের নাম

শরীয়ত মূলত অধিকার আদায়ের নাম। হয়ত আল্লাহর অধিকার-কিংবা তাঁর বান্দার অধিকার। আল্লাহর একেক বান্দার অধিকার একেক রকম। যেমন– পিতা-মাতার অধিকার, সন্তানের অধিকার, স্বামীর অধিকার, আত্মীয়-স্বজনের অধিকার, প্রতিবেশীর অধিকার, সফরসঙ্গীর অধিকার ইত্যাদি। গোটা শরীয়ত এ ধরনের অধিকারের আলোচনায় ভরপুর। এসব অধিকারের একটি অধিকারও যদি অপূর্ণ থাকে, তাহলে শরীয়তও তার বেলায় অপূর্ণ থাকে। কেউ আল্লাহর হক আদায় করলো আর বান্দার হক আদায় করলো না, তবে এটা পরিপূর্ণ দ্বীন পালন হলো না। এসব অধিকারের মধ্যে আত্মীয়তার অধিকার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

সকল মানুষ আত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ

সকল মানুষ হযরত আদম (আ.)-এর সন্তান। সবাই আত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ। একথাটি এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা.)ও বলেছেন। কারণ, আমাদের

সকলের পিতা একজন– হযরত আদম (আ.)। তাঁর মাধ্যমেই আমরা সৃষ্টি হয়েছি, বংশ, দল-উপদল ও পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে বসবাস পরবর্তীদের সৃষ্টি। মানুষ এই সূত্র ধরেই আজ গোটা পৃথিবীতে বিস্তৃত। এর ফলে নিকটাত্মীয় দূরবর্তী আত্মীয়তে পরিণত হয়েছে। একটা পর্যায়ে এসে একে অপরের পরিচয়ও ভুলে গিয়েছে। নিকটাত্মীয় বা দূরাত্মীয়– সবাই কিন্তু আত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ, এ বন্ধন থেকে কেউ কখনও মুক্ত হতে পারে না।

অধিকার আদায়ের মাঝে রয়েছে প্রশান্তি

সামাজিকতার দৃষ্টিকোণ থেকে আত্মীয় বলা হয় নিকটবর্তী আত্মীয়কে। যেমন– ভাই-বোন, চাচা-চাচি, স্বামী-স্ত্রী, মামা-খালা, পিতা-মাতা। এদের জন্য বিশেষ কিছু অধিকারের কথা আল্লাহ তা'আলা বলেছেন। কারণ, আত্মীয়-স্বজনের অধিকার সঠিকভাবে আদায় করলে নিরাপদ সমৃদ্ধ জীবন লাভ করা যায়। জীবন তখন শান্তিময় হয়। পক্ষান্তরে অধিকার আদায় না করলে সৃষ্টি হয় ঝগড়া-বিবাদ, হিংসা-বিদ্বেষ ও মামলা-মোকদ্দমা। প্রত্যেকে যদি নিজ আত্মীয়-স্বজনের অধিকার আদায়ে যত্নবান হয়, তবে কোনো ঝগড়া-বিবাদ থাকে না। মামলা-হামলার ঘটনাও তখন ঘটে না। এজন্যই আত্মীয়তার অধিকার আদায়ের ব্যাপারে আল্লাহ বিশেষ নির্দেশ দিয়েছেন।

আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য সদাচরণ করো

এমনিতে প্রতিটি ধর্ম ও সভ্যতার মাঝেই আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করার সবক রয়েছে। প্রত্যেক ধর্মই একথা বলে যে, আত্মীয়দের সঙ্গে সুন্দর আচরণ করো। কিন্তু আত্মীয়দের অধিকারের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (সা.) যে মূলনীতি দিয়েছেন, তা অন্যান্য ধর্ম ও সভ্যতার নীতিমালার মতো নয়। রাসূলুল্লাহ (সা.) কর্তৃক প্রদত্ত নীতিমালা মূলত আত্মীয়দের অধিকার সঠিকভাবে নিশ্চিত করে। মূলনীতিগুলো হলো, আত্মীয়-স্বজনের অধিকার আদায়ের সময় উদ্দেশ্য থাকবে আল্লাহর সন্তুষ্টি। অর্থাৎ– আত্মীয়-স্বজনের প্রতি সদাচরণ করার সময় এ নিয়ত থাকতে হবে যে, এটা আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ। এ নির্দেশটি পালনের মাধ্যমে আমি তাঁরই সন্তুষ্টি কামনা করছি। এভাবে নিয়তকে বিশুদ্ধ রাখতে পারলে এর অপরিহার্য ফল হবে, সদাচরণ করে ওই আত্মীয় থেকে বিনিময়ের আশা অন্তরে থাকবে না। বরং মনে তখন এটাই থাকবে যে, আমি আল্লাহকে খুশি করার জন্যই আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে সদাচরণ করছি। আমার কোমল ব্যবহারে যদি

আত্মীয়-স্বজন খুশি হয়, কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে এবং এর বিনিময় দেয়, তাহলে এটা বাড়তি নেয়ামত। কিন্তু তারা যদি খুশি না হয়, কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করে এবং কোনো বিনিময় নাও দেয়, তাহলেও কিছু যায় আসে না। বরং তখনও আমাকে ভালো আচরণ করে যেতে হবে। আল্লাহপ্রদত্ত কর্তব্য হিসাবে আমাকে তা পালন করে যেতেই হবে।

কৃতজ্ঞতা ও বিনিময়ের আশা করো না

আত্মীয়-স্বজনের অধিকার আদায় করা ভালো, তাদের অধিকার আদায় করা দরকার– একথাগুলো আমরা প্রত্যেকেই মুখে-মুখে উচ্চারণ করে থাকি। কিন্তু সমস্যা দেখা দেয় তখন, যখন আত্মীয়ের প্রতি সদাচরণ করার পর বিনিময়ের আশায় বসে থাকে। মনে-মনে ভাবে, এর বিনিময় পাওয়া যাবে বা কমপক্ষে কৃতজ্ঞতা হলেও প্রকাশ করবে কিংবা অন্যান্য আত্মীয়ের কাছে আমার গুণকীর্তন গাইবে। এরূপ আশা করার পর যখন 'আশা' আশাই থেকে যায়, তখনই দেখা দেয় সমস্যা। কারণ, তখন আমরা বলে থাকি, আমি অমুকের সঙ্গে কত সুন্দর ব্যবহার করলাম, অথচ সে ফিরে পর্যন্ত তাকালো না। তার মুখে 'শুকরিয়া' শব্দটিও এলো না। সে তো এর কোনো মূল্যই দিলো না! এ জাতীয় মন্তব্যের ফলে এর যে সাওয়াবটুকু আমরা পাওয়ার উপযুক্ত হই, তাও নষ্ট করে ফেলি। ভবিষ্যতেও তার সঙ্গে আর ভালো ব্যবহার করি না; বরং বলি, তার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করে লাভ কী? তার মুখে একটু 'শুকরিয়া' শব্দটাও তো বের হলো না। তার সঙ্গে কী ভালো ব্যবহার করবো? এসব কারণেই রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, কারো সঙ্গে সদাচরণ করার সময় শুধু আল্লাহ তা'আলাকে সন্তুষ্ট করার জন্যই কর। এ আশা নিয়ে করো না যে, সেও আমার সঙ্গে সদাচরণ করবে বা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে কিংবা বিনিময় দেবে।

আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষাকারী কে?

এ হাদীসটি সব সময় স্মরণ রাখা উচিত যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন–

لَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْمَكَافِىْ لٰكِنَّ الْوَاصِلَ مَنْ اِذَا قُطِعَتْ رِحْمَهُ وَصَلَهَا –

(بخارى ، كتاب الادب ، باب ليس الوا صل بالمكافى)

'সমপরিমাণ বিনিময় আদায়কারী আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষাকারী নয়; বরং প্রকৃতপক্ষে আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষাকারী হলো সে, যে আত্মীয়তার সম্পর্ক তার সঙ্গে ছিন্ন করার পরও সে বন্ধন ছিন্ন করে না।'

অর্থাৎ– যে আত্মীয় আমার সঙ্গে যেমন ব্যবহার দেখাবে, আমিও তার সঙ্গে তেমন ব্যবহার দেখাবো। যদি সে আত্মীয়তার বন্ধনের তোয়াক্কা করে, আমিও করবো। যদি না করে, আমিও করবো না– এ জাতীয় মানসিকতা যে রাখে, প্রকৃতপক্ষে সে আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষাকারী নয়। সে কোনো সাওয়াব পাবে না। বরং প্রকৃতপক্ষে আত্মীয়তা রক্ষাকারী ওই ব্যক্তি, যার অধিকার অপরে খর্ব করলো, তার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করলো, তবুও সে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায় ওই আত্মীয়ের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করে গেলো। সুখে-দুঃখে সম্পর্ক ছিন্নকারী আত্মীয়টির পাশে দাঁড়ালো। তাহলে সে ব্যক্তিই পাবে পরিপূর্ণ সাওয়াব।

আমরা কুসংস্কারের জালে আবদ্ধ

বর্তমানে কাউকে যদি জিজ্ঞেস করা হয়, আত্মীয়-স্বজনের হক বলতে কিছু আছে কি? উত্তরে প্রত্যেকেই বলবে, হ্যাঁ, অবশ্যই তাদের অনেক হক আছে। কিন্তু জরিপ করলে দেখা যাবে হকগুলো কে কতটুকু আদায় করেছে। তখন এটা স্পষ্ট হয়ে উঠবে যে, আমাদের গোটা সামাজিকতাকে কুপ্রথা গ্রাস করে ফেলেছে। শুধু কুপ্রথার সীমানাতেই আটকে আছে সমাজ। এছাড়া বাড়তি কোনো সম্পর্ক বর্তমানে নেই। যেমন– বিয়ে-শাদীর অনুষ্ঠানে যোগ দিলে উপহার দেয়ার প্রথা আমাদের দেশে আছে। এখন কারো কাছে উপহারটা দেবে মনে চাচ্ছে না বা উপহার দেয়ার মতো সামর্থ্য তার নেই; অথচ সে চিন্তা করে– খালিহাতে বিয়েতে গেলে সুন্দর দেখাবে না বা অন্যান্য আত্মীয়-স্বজন কী বলবে, তখন তো নাক কাটা যাবে, তাছাড়া অনুষ্ঠানের আয়োজকরা বলবে, আমরা তো তাদের বিয়েতে এ ধরনের উপহার দিয়েছিলাম, অথচ তারা তো কিছুই দিলো না। এ জাতীয় চিন্তা মাথায় আসার পর সে একটা উপহার নিয়ে অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করলো। সুতরাং এ উপহারটা আন্তরিকতার সাথে দেয়া হলো না। বরং প্রথা রক্ষা ও সুনামের জন্য দেয়া হলো। যার ফলে উপহার দেয়ার কারণে সাওয়াব তো হলোই না, বরং গুনাহের অধিকারী হলো।

পাওয়ার আশায় উপহার দেয়া যাবে না

আমাদের সমাজে একটি কুসংস্কার আছে– কোনো এলাকায় কম, কোনো এলাকায় বেশি। উর্দুতে এ প্রথাটিকে 'নিউতা' বলা হয়। অর্থাৎ অনুষ্ঠানে দেয়া-নেয়ার প্রথা।

প্রত্যেকে একটা কথা মনে রাখে যে, অমুকে আমাদের অনুষ্ঠানে কী দিয়েছিলো এবং আমি তার অনুষ্ঠানে কী দিচ্ছি। কোনো-কোনো এলাকায় তো দস্তুরমতো তালিকা রাখা হয় যে, অমুক দিয়েছে এত টাকা আর অমুক দিয়েছে এত টাকা। তারপর তালিকা রেখে দেয়া হয়। পরবর্তীতে সে 'অমুকে'র বাড়িতে যখন অনুষ্ঠান হয়, তখন অপরিহার্য হয়ে দাঁড়ায়, তাকে ওই পরিমাণ টাকা দিতে হবে। ধার করে হোক, চুরি করে হোক, পকেট কেটে হোক বা নিজের থেকে হোক– মনে করা হয় ওই টাকাটা তাকে দিতেই হবে। না দিলে সমাজের চোখে সে মহা অপরাধী হিসাবে গণ্য হবে। এটাই হলো 'নিউতা'।

লক্ষ্য করুন, টাকাটা শুধু এজন্য দেয়া হচ্ছে যে, আমার অনুষ্ঠানে সে এই টাকা দেবে। জেনে রাখুন, পাওয়ার আশায় এ জাতীয় উপহার দেয়া হারাম। কুরআন মজীদে এর জন্য 'রিবা' তথা সুদ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে–

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِيْ أَمْوَالِ النَّاسِ فَلاَ يَرْبُوْ عِنْدَ اللهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِّنْ زَكَاةٍ تُرِيْدُوْنَ وَجْهَ اللهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُوْنَ –

'মানুষের ধন-সম্পদ দ্বারা তোমাদের ধন-সম্পদ বৃদ্ধি পাবে– এ আশায় তোমরা সুদে যা কিছু দাও (অর্থাৎ এ আশায় যে, আমাদের অনুষ্ঠানে তো এর বিনিময় বা এর চেয়ে বেশি দেবে) আল্লাহর কাছে তা বৃদ্ধি পায় না, পক্ষান্তরে আল্লাহর সন্তুষ্টির আশায় পবিত্র অন্তরে যা কিছু দিয়ে থাক, তারই দ্বিগুণ লাভ করবে।" –(সূরা রূম : ৩৯)

উপহার কোন উদ্দেশ্যে দেয়া যাবে?

সুতরাং কেউ যদি চায়, প্রিয়জনের আনন্দের দিন কিছু উপহার দিয়ে তার আনন্দে শরিক হতে। এক্ষেত্রে সুনাম কুড়ানো, লোক দেখানো বা বিনিময় পাওয়ার আশা তার অন্তরে নেই; বরং আত্মীয়ের অধিকার আদায় করা এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা তার উদ্দেশ্য, তবে উপহার দেয়া দ্বারা সে সাওয়াবের অধিকারী হবে। এ উপহার তখন আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করার সাথে গণ্য হবে।

উদ্দেশ্য যাচাইয়ের পদ্ধতি

উপহার দেয়ার সময় আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি উদ্দেশ্য, নাকি বিনিময় পাওয়া উদ্দেশ্য, তা বুঝবে কীভাবে? এর পরিচয় হলো, উপহার দেয়ার সময় এই অপেক্ষা করা যে, গ্রহীতা তার প্রশংসা করবে বা এ আশায় থাকা আমাদের ঘরে যখন কোনো অনুষ্ঠান হবে, তখন সেও উপহার নিয়ে আসবে। ফলে আপনার অনুষ্ঠানে সে কোনো উপহার না দিলে যদি তার সঙ্গে দূরত্ব সৃষ্টি হয় বা যদি অভিযোগ করেন যে, আমি এতো দিয়েছিলাম; কিন্তু সে তো কিছুই দিলো না। তখন বোঝা যাবে, আপনি যখন উপহার দিয়েছিলেন, তখন আল্লাহর সন্তুষ্টি উদ্দেশ্য ছিলো না। সুতরাং দিলেন, কিন্তু সাওয়াবটা নষ্ট করে ফেললেন।

আর যদি উপহার দেয়াকালে এ ধরনের কোনো আশা না থাকে, অভিযোগও থাকে, বরং শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টিই কাম্য হয়, তখন বোঝা যাবে, আপনার উপহার দেয়াটা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যেই হয়েছিলো। এ ক্ষেত্রে উপহারদাতা ও গ্রহীতা উভয়ই সৌভাগ্যবান।

হাদিয়া হালাল ও পবিত্র সম্পদ

আব্বাজান মুফতী শফী (রহ.) বলতেন, মুসলমানদের ওই সম্পদ জগতের মধ্যে সবচে উত্তম ও হালাল, যা এক মুসলমানকে অপর মুসলমান আন্তরিকতার সঙ্গে হাদিয়া তথা উপহার হিসাবে দেয়। কারণ, তোমার উপার্জিত টাকার মাঝে ত্রুটি থাকতে পারে বিধায় হালাল হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ থাকতে পারে, কিন্তু কোনো মুসলমান যদি আন্তরিকতার সাথে তোমাকে কিছু হাদিয়া দেয়, তাহলে এটা হালাল হওয়ার ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই।

এজন্যই হযরত থানভী (রহ.)-কে হাদিয়া দেয়ার নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট কিছু নিয়ম-নীতি ছিলো। তিনি হাদিয়ার কদর করতেন এবং নিজের প্রয়োজনীয় খাতে খরচ করার চেষ্টা করতেন। কেননা, হাদিয়ার মাল অত্যন্ত বরকতপূর্ণ। তবে আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্য থাকতে হবে। তাহলে দাতা-গ্রহীতা উভয়ই সৌভাগ্যবান হবে। অন্যথায় নয়।

অপেক্ষার পর প্রাপ্ত হাদিয়া বরকতপূর্ণ নয়

এক হাদীসে এসেছে, যদি তোমার মন কাউকে এজন্য কামনা করে যে, সে আসবে এবং আমাকে হাদিয়া দেবে। তুমি তার হাদিয়ার প্রতি লালায়িত। তাহলে এই হাদিয়া বরকতপূর্ণ নয়।

পক্ষান্তরে যে হাদিয়ার জন্য তোমার কোনো অপেক্ষা ছিলো না; বরং আল্লাহ কারো মনে ঢেলে দিয়েছেন আর সে আপনার জন্য নিয়ে এসেছে, তাহলে সে হাদিয়া বরকতপূর্ণ।

এক বুযুর্গের ঘটনা

দরবেশ প্রকৃতির বুযুর্গ ছিলেন তিনি। নামটা এই মুহূর্তে মনে নেই। বুযুর্গদের উপর অনেক সময় কঠিন পরিস্থিতি অতিবাহিত হয়। এই বুযুর্গও এমনি এক পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়েছিলেন।

একবার তিনি খাবারের অভাবে পড়লেন। কয়েকদিন পর্যন্ত ক্ষুধার্ত কাটালেন। ভক্ত ও মুরিদানের সামনে ওয়াজ করছিলেন, অথচ তখনও তার পেটে কিছু পড়েনি। ফলে শক্তি কমে এলো। আওয়াজ ক্ষীণ হয়ে এলো। এক মুরিদ ব্যাপারটা লক্ষ্য করে উঠে বাড়িতে চলে গেল। কিছুক্ষণ পর একটি প্লেটে করে খাবার সাজিয়ে নিয়ে এলো। খাবার দেখে বুযুর্গ ক্ষণিক ভেবে বলে উঠলেন, না, এ খানা খাব না; যাও, ফিরিয়ে নিয়ে যাও। মুরিদও বুযুর্গের কথামতো খাবার নিয়ে ফিরে গেল। কারণ, মুরিদ জানতো যে, আমার পীর সাহেব একজন কামেল বুযুর্গ। সুতরাং তাঁর নির্দেশ সঙ্গে-সঙ্গে মানা উচিত। এর মধ্যে কোনো 'রহস্য' থাকতে পারে। তাই সে খাবার বাড়িতে নিয়ে গেল। আজ-কালের মুরিদদের মতো পীর সহেবকে খেতে বাধ্য করলো না। তারপর কিছু সময় অতিবাহিত হওয়ার পর সে পুনরায় খাবারের প্লেটটি নিয়ে এলো। বুযুর্গ বললেন, হ্যাঁ, এবার গ্রহণ করলাম। এই বলে তিনি প্লেটটি হাতে তুলে নিলেন।

উক্ত বুযুর্গ প্রথমবার খাবার গ্রহণ করলেন না, দ্বিতীয়বার গ্রহণ করলেন– এর কারণ কী? আসলে এর কারণ হলো, প্রথমবারে এ খাবারের প্রতি তাঁর অপেক্ষা ও আগ্রহ ছিলো। কারণ, মুরিদ যখন উঠে গিয়েছিল, বুযুর্গ তখন তা লক্ষ্য করে অনুমান করে নিয়েছিলেন যে, সে মনে হয় আমার জন্য খাবার আনতে গেছে। আর হাদীস শরীফে এসেছে, অপেক্ষার হাদিয়া বরকতপূর্ণ নয়। তাই তিনি প্রথমবার ফিরিয়ে দিলেন এবং দ্বিতীয়বার গ্রহণ করলেন। কারণ, দ্বিতীয়বার অপেক্ষা ও আগ্রহের বিষয়টি ছিলো না।

হাদিয়া দাও, মহব্বত বাড়াও

হাদীস শরীফে এসেছে, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন–

تَهَادُوْا تَحَابُّوْا — (الموطا، في حسن الخلق ، باب ماجاء في المهاجرة)

'তোমরা পরস্পরকে হাদিয়া দাও, মহব্বত বাড়াও।'

একে অপরকে হাদিয়া দিলে তোমাদের মাঝে হৃদ্যতা সৃষ্টি হবে। তবে এটা তখন হবে, যখন আল্লাহ্র সন্তুষ্টি উদ্দেশ্য থাকে। আত্মীয়-স্বজনের হক আদায়ের উদ্দেশ্যে, নিজের আখেরাত সাজানোর উদ্দেশ্যে এবং আল্লাহ্র সামনে কৃতকর্ম কবুল হওয়ার উদ্দেশ্যে হাদিয়া দিলে। ওই হাদিয়াই পারস্পরিক ভালোবাসার কারণ হবে। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য, আমরা এসব উদ্দেশ্যে হাদিয়া দেই না। আমরা হাদিয়া দিয়ে থাকি সমাজের চোখে ভালো হওয়ার জন্য। সামাজিক রসম পালন ছাড়া সহীহ নিয়তে হাদিয়া দেয়ার তাওফীক আমাদের হয়ে উঠে না। অনেক সময় পুরুষদের মনে কোনো আত্মীয়কে হাদিয়া দেয়ার ইচ্ছা জাগলে তখন স্ত্রী একথা বলে বিরত রাখে যে, এখন দিলে কী লাভ– অমুক সময়ে তাদের অনুষ্ঠান হবে, তখন হাদিয়া দিলে নাম হবে এবং আপনার দায়িত্বও আদায় হবে। অথচ লাভ হলো এখন। কারণ, এখনকার হাদিয়ায় কোনো লৌকিকতা ছিল না।

হাদিয়ার বস্তু না দেখে দাতার আবেগ দেখ

রাসূলুল্লাহ (সা.) এর শিক্ষা হলো, কী হাদিয়া দিলো, তা দেখ না, বরং দেখো, কেমন অনুভূতি নিয়ে হাদিয়া দিয়েছে। মুহব্বতের সঙ্গে সামান্য জিনিস দিলেও গ্রহণ করবে। তাই তো তিনি বলেছেন–

لَاتَحْقِرَنَّ جَارَّةٌ لِجَارَتِهَا وَلَوْ فِرْسِنَ شَاةٍ –

(بخاری کتا الادب ، باب لا تحقرن جارة لجارتها)

'এক প্রতিবেশী অপর প্রতিবেশীর হাদিয়াকে কখনও তুচ্ছ ভাবতে পারবে না। যদিও তা ছাগলের পায়া হয়।'

অর্থাৎ– প্রতিবেশী যদি সামান্য ছাগলের পায়াও হাদিয়া পাঠায়, তবে তা ছোট মনে করো না। হাদিয়ার পরিমাণ দেখ না, বরং দেখ তার আবেগ ও উৎসাহ। যদি মহব্বতের সঙ্গে হাদিয়া পাঠায়, তাহলে তার মূল্যায়ন করো। এ হাদিয়া তোমার জন্য বরকতময় হবে। কিন্তু অনেক মূল্যবান বস্তু যদি সুনাম কুড়ানোর উদ্দেশ্যে দেয়া হয়, তাহলে সে হাদিয়া বরকতময় হবে না।

সাধারণত ছোট জিনিস হাদিয়া দেয়ার ক্ষেত্রে লৌকিকতা থাকে না। কারণ, সাধারণ মানের জিনিস হাদিয়া দেয়ার মাঝে দেখানোর কী-ই বা থাকে। পক্ষান্তরে দামী জিনিস হাদিয়া দেয়ার ক্ষেত্রে অনেক সময় লৌকিকতা চলে আসে। সুতরাং সামান্য জিনিস হাদিয়া দিলে তার মূল্যায়ন বেশি করা উচিত।

এক বুযুর্গের হালাল উপার্জনের দাওয়াত

আব্বাজান মুফতী শফী (রহ.) প্রায়ই ঘটনাটি শোনাতেন। দেওবন্দের এক বুযুর্গ ঘাস কাটতেন। তারপর তা বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করতেন। প্রতিদিন তার আয় হতো ছয় পয়সা। দু'পয়সা নিজের প্রয়োজনে খরচ করতেন, দু'পয়সা দান করতেন আর অবশিষ্ট দু'পয়সা দারুল উলূম দেওবন্দের উলামাদেরকে দাওয়াত খাওয়ানোর উদ্দেশ্যে জমা করে রাখতেন। যখন দাওয়াত খাওয়ানোর মতো টাকা জমা হয়ে যেত, তখন দারুল উলূম গিয়ে দাওয়াত দিয়ে আসতেন। দাওয়াতি মেহমানদের মধ্যে শাইখুল হিন্দ মাহমূদ হাসান দেওবন্দী (রহ.), মাওলানা রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী (রহ.) সহ অনেক আকাবির উপস্থিত হতেন।

এসব উলামায়ে কেরাম বলতেন, আমরা পুরো মাস ওই বুযুর্গের দাওয়াতের অপেক্ষায় থাকতাম। কারণ, এ দাওয়াত ছিলো হালাল উপার্জনের দাওয়াত এবং একমাত্র আল্লাহ তাআলার মহব্বত ও ভালোবাসাতাড়িত দাওয়াত। এ দাওয়াতে যে নূর ও পরিতৃপ্তি অনুভূত হতো, তা অন্য কোনো দাওয়াতে হতো না। তাঁরা বলতেন, তার দাওয়াত খাওয়ার পর কয়েকদিন পর্যন্ত অন্তরে নূর অনুভূত হতো এবং ইবাদত ও যিকির-আযকারে মজা লাগতো। কাজেই মহব্বতের সঙ্গে হাদিয়া দিলে তার মূল্যায়ন করা উচিত।

প্রথাগত জিনিস হাদিয়া দিও না

হাদিয়া দেয়ার মাঝে লক্ষ রাখতে হবে যে, হাদিয়া-তোহফার অন্যতম উদ্দেশ্য হলো, আরাম পৌছানো ও খুশি করা। যে হাদিয়ায় প্রথার ব্যাপারটা প্রাধান্য পায়, সেই হাদিয়ায়ে সাধারণত এসবের কোনো বালাই থাকে না। বরং প্রথা পূরণ করাই উদ্দেশ্য থাকে। যেমন– কেউ কাউকে মিষ্টির প্যাকেট বা কাপড়-লুঙ্গি হাদিয়া দিলো আর এ নির্দিষ্ট বস্তুগুলো ছাড়া অন্য কিছু হাদিয়া দেয়াটাই যেন প্রথায় পরিণত হয়েছে। মানুষ মনে করে, এগুলো ছাড়া অন্য কোনো কিছু হাদিয়া দেয়া যাবে না। দিলে লজ্জার ব্যাপার হবে। মানুষ বলবে, এটাও কী হাদিয়া? মূলত ইসলামের শিক্ষা এটা নয়। বরং ইসলামের শিক্ষা হলো, ইখলাসপূর্ণ হাদিয়া দাও। হাদিয়া দেয়ার সময় লক্ষ করো, তার কোন জিনিস প্রয়োজন। সেই জিনিসটাই তাকে হাদিয়া দাও। এতে ওই ব্যক্তি আরাম পাবে, খুশিও হবে।

এক বুযুর্গের বিরল হাদিয়া

হযরত শাহ্ আব্দুল আযীয (রহ.) তাবলীগ জামাতের বিশিষ্ট একজন মুরুব্বী ছিলেন। আমার পিতার সঙ্গে তাঁর গভীর সখ্য ছিলো। তাঁর কাছে তিনি প্রায়ই আসতেন। আমার মনে আছে, আমার আব্বার সঙ্গে দেখা করার উদ্দেশ্যে যখন তিনি দারুল উলূম আসতেন, তখন যা হাদিয়া নিয়ে আসতেন, তা ছিলো সত্যিই বিরল ও চমৎকার। এ ধরনের হাদিয়া আমরা কোথাও আর দেখিনি। যেমন– কখনও তিনি এক দিস্তা কাগজ নিয়ে আসতেন এবং আব্বাজানের খেদমতে পেশ করতেন। দেখুন, কাগজের দিস্তা হাদিয়া হিসাবে পেশ করার ঘটনা মনে হয় এটাই নতুন। কিন্তু এ আল্লাহ্র বান্দা তো জানতেন যে, মুফতী সাহেব (রহ.) লেখক মানুষ, কাগজ তাঁর কাজে আসবে। লেখার মাধ্যমে তিনি যে খেদমত করবেন, এতে আমার অংশও থাকবে, আমিও সাওয়াব পাবো। অনেক সময় কালির দোয়াত হাদিয়া নিয়ে আসতেন। এবার বলুন, লৌকিকতা উদ্দেশ্য থাকলে কালির দোয়াত কি হাদিয়া দেয়া যেত? কিন্তু তাঁর লক্ষ হলো, আল্লাহ্র সন্তুষ্টি এবং হাদিয়া গ্রহীতাকে আরাম পৌছানো। তিনিই পারেন এ ধরনের হাদিয়ার চিন্তা করতে। যদি মিষ্টির প্যাকেট হাদিয়া দেয়া হতো, তবে আব্বাজান নিজে তো খেতেন না, খেলেও কটাই বা খেতেন, বরং তখন অন্যদের খাওয়ার কাজে আসতো।

হাদিয়া দেয়ার জন্যও বিবেক-বুদ্ধি থাকা দরকার

হাদিয়া দেয়ার ক্ষেত্রে বিবেক-বুদ্ধি থাকা দরকার। আর বিবেক-বুদ্ধি এমনিতেই আসে না, বরং আল্লাহ্র তাওফীক সাথী হলে, তাঁর সন্তুষ্টি উদ্দেশ্য হলে এবং ইখলাস ও আন্তরিকতা থাকলে, তখনই আসে বিবেক-বুদ্ধি। যেখানে সুনাম কুড়ানো উদ্দেশ্য থাকে, সেখানে বিবেক অচল হয়ে পড়ে। সেখানে তো প্রথাই হয় মুখ্য উদ্দেশ্য। বর্তমানের সমাজটা কুপ্রথার জালে আবদ্ধ। আত্মীয়-স্বজনের হকের ব্যাপারটিকে এই 'কুপ্রথা' আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। এসব সামাজিক কুপ্রথা বর্জন করতে হবে। যে হাদিয়া সাওয়াবের 'কারণ', তা আজ এই কুপ্রথার কারণে আযাবের 'কারণ' হয়ে দাঁড়িয়েছে। সুতরাং কুপ্রথার জাল থেকে সকলকেই বেরিয়ে আসতে হবে।

প্রতিটি কাজ আল্লাহ্র জন্য করো

এ তো গেল হাদিয়ার কথা। এছাড়াও আত্মীয়-স্বজনের আরো অধিকার রয়েছে। যেমন– তাদের বিপদ-আপদে সহযোগিতা করা, প্রয়োজনের মুহূর্তে পাশে দাঁড়ানো ইত্যাদি বিষয়েও রাসূলুল্লাহ (সা.) এর শিক্ষা হলো, এসব কিছু

করবে একমাত্র আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য। সুনামের জন্য, শুকরিয়া পাওয়ার জন্য এসব করো না। উদ্দেশ্যে গড়মিল থাকলে দুনিয়াতেও শান্তি পাবে না।

স্বজন যখন দুশমন হয়

আরবী ভাষায় একটি প্রসিদ্ধ প্রবাদ সমাজের ভুল চিন্তা-ধারণার কারণেই সৃষ্ট। বলা হয়– اَلْاَقَارِبُ كَالْعَقَارِبِ অর্থাৎ স্বজনরা বিচ্ছুর মতো। তথা আত্মীয়-স্বজন যদি দুশমনে পরিণত হয়, তখন ধ্বংস করার চিন্তায় ব্যস্ত থাকে। কখনও সন্তুষ্ট হয় না। আর এই শত্রুতা তখন সৃষ্টি হয়, যখন সদাচরণ করে বিনিময়ের আশা করা হয়। ফলে আশানুরূপ বিনিময় পাওয়া না গেলে ওই আত্মীয় বিচ্ছু তথা দুশমনে পরিণত হয়।

বিনিময়ের আশা তো তখন থাকে না, যখন উত্তম আচরণ দ্বারা উদ্দেশ্য হয় আল্লাহ্র নির্দেশ ও রাসূল (সা.) এর সুন্নাত পালন। তখনকার চিন্তার ধরন হয় স্বচ্ছ ও পবিত্র। তখন মনে করা হয়, এই আত্মীয় বিনিময় না দিলেও কিছু যায় আসে না। কারণ, আল্লাহ্ তো অবশ্যই বিনিময় দেবেন। আত্মীয়-স্বজনের কাছ থেকে সদাচরণের বিনিময় না পাওয়া গেলে এর মধ্যেই রয়েছে প্রকৃত স্বাদ। কেননা, ওই মহান মালিক, যাঁর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্য সদাচারণ করা হয়েছে, হাদিয়া দেয়া হয়েছে, তিনি অবশ্যই এর উত্তম প্রতিদান দেবেন।

আত্মীয়দের সঙ্গে রাসূলুল্লাহ (সা.) এর ব্যবহার

রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁর আত্মীয়দের সঙ্গে কেমন আচরণ করেছেন? হাতেগোনা কয়েকজন আত্মীয় ব্যতীত অবশিষ্ট সবাই তো ছিলো রাসূলুল্লাহ (সা.) এর দুশমন ও রক্তপিপাসু। নির্যাতন ও ষড়যন্ত্রের প্রতিটি তীর তারা রাসূলুল্লাহ (সা.) এর দিকে তাক করে রেখেছিলো। এমনকি তাঁর চাচা, চাচাত ভাই– যারা ছিলো নিকটাত্মীয়, অথচ ক্ষতি করার ব্যাপারে ছিলো সদা সচেষ্ট। কিন্তু তিনি আত্মীয়দের অধিকার আদায়ে কখনও কোনো ত্রুটি করেননি। মক্কা বিজয়ের সময় প্রতিশোধ নেয়ার মতো পূর্ণ সুযোগ পাওয়া সত্ত্বেও তিনি সবাইকে ক্ষমা করে দিলেন। তখন তিনি ঘোষণা করেছিলেন– যে ব্যক্তি হারাম শরীফের ভেতরে আশ্রয় নেবে, সে নিরাপদ। যে আবু সুফিয়ানের ঘরে আশ্রয় নেবে– সেও নিরাপদ, তিনি কারো থেকে প্রতিশোধ নেননি।

মোটকথা, আত্মীয়-স্বজনের পক্ষ থেকে দুর্ব্যবহার পাওয়া সত্ত্বেও সদাচরণ করা নবীজি (সা.)-এর সুন্নাত। মন্দের প্রতিদান ভালোর মাধ্যমে দেয়াও তাঁর আরেকটি সুন্নাত।

মাখলুকের উপর আশা করো না

হাকীমুল উম্মত আশরাফ আলী থানভী (রহ.) তাঁর মাওয়ায়েযে একটা কঠোর অভিজ্ঞতা তুলে ধরেছেন। তাঁর ভাষায়– পৃথিবীতে শান্তিতে জীবন যাপন করার পথ একটাই। তাহলো, মাখলূকের উপর থেকে আশার রঙিন স্বপ্ন ঝেড়ে ফেলো। যেমন এ আশা করা যে, অমুক ব্যক্তি আমার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করবে। অমুক প্রয়োজনে আমার কাজে আসবে। আমার দুঃখ-বেদনায় শেয়ার করবে– এ জাতীয় আশা বর্জন করে এক আল্লাহ্‌র প্রতি ভরসা করা। কারণ, মাখলুক থেকে আশা হটিয়ে নেয়ার পর যদি তাদের পক্ষ থেকে ভালো কিছু পাওয়া যায়, এতে অনেক আনন্দ পাওয়া যায়। কারণ, তখন আশার চেয়ে বেশি পাওয়া গেল। মোটকথা, আশা-আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টির উপর নয়, বরং স্রষ্টার উপর রাখা উচিত। এতে সুখময় জীবন অর্জন করতে পারবে।

দুনিয়া শুধু বেদনা দেয়

দুনিয়ার বৈশিষ্ট্য হলো, সে আঘাত করবে, দুঃখ দেবে। কখনও যদি আনন্দের কিছু পাও, তবে মনে করবে এটা আল্লাহ তাআলার বিশেষ অনুগ্রহ ও ইহসান। আর দুঃখজনক কিছু ঘটলে বুঝে নেবে, এটা তো আমার পাওনা ছিলো। সুতরাং অধিক অনুতাপের প্রয়োজন নেই। বরং মাখলুকের উপর নির্ভরশীল না হয়ে আল্লাহ্‌র উপরই ভরসা রাখো, তাহলে 'ইনশাআল্লাহ্' পরিপূর্ণ সুখ ও আনন্দ পাবে।

আল্লাহ্‌ওয়ালাদের অবস্থা

এত কথা যা বললাম, এগুলো আমাদের বড়দের কথা। কিন্তু শুধু বলা ও শোনা দ্বারা কাজ হয় না; বরং কথাগুলো অন্তরে স্থান দিতে হবে। কার্যক্ষেত্রে তা বাস্তবায়ন করতে হবে। অপরের উপর আশা ছেড়ে দিয়ে সব আশা আল্লাহ্‌র কাছে করতে হবে। আল্লাহ্‌ওয়ালাদেরকে দেখুন, তারা কত প্রশান্ত। কঠিন বিপদের সময়েও তারা আল্লাহ্‌র উপর সন্তুষ্ট। কষ্টের সামান্য ছটা দেখা গেলেও তা তাদের জন্য ক্ষণিকের। দুঃখ-বেদনা ও কষ্টে তারা একেবারে অস্থির হয়ে যান না। কারণ, তারা সম্পর্ক গড়ে তুলেছেন প্রভুর সাথে। মাখলুক থেকে তাঁরা দৃষ্টি সরিয়ে নিয়েছেন। যার ফলে তারা আত্মিক প্রশান্তি খুঁজে পেয়েছেন।

এক বুযুর্গের ঘটনা

ঘটনাটি লিখেছেন হাকীমুল উম্মত হযরত আশরাফ আলী থানভী (রহ.)। এক বুযুর্গকে কেউ জিজ্ঞেস করলো, হযরত! কেমন আছেন? তবিয়ত কেমন?

তিনি উত্তর দিলেন, ওই ব্যক্তির অবস্থা কী জিজ্ঞেস করছ, দুনিয়ার সমস্ত কাজ যার মর্জিমতো হয়, কোনো কাজ যার মনের বিপরীত হয় না?

প্রশ্নকারী বিস্ময়ঝরা সুরে বললো, এ ধরনের অবস্থা তো নবীদেরও হত না। কারণ, সব বিষয় নবীদেরও মন মতো হয় না। বরং কোনো-কোনো কাজ তাদের মনের বিপরীতেও হয়। অথচ আপনি কিনা বলছেন, সকল কাজ আপনার মর্জি অনুযায়ী হয়– এটা কীভাবে সম্ভব?

বুযুর্গ উত্তর দিলেন, আমার মর্জিকে আমি আল্লাহ তাআলার মর্জির অনুগত বানিয়ে নিয়েছি। আল্লাহ্‌র মর্জি আমার মর্জি। তাঁর ইচ্ছা আমার ইচ্ছা। পৃথিবীর সকল কাজ আল্লাহ্‌র ইচ্ছা ও মর্জি অনুযায়ী হয়। আর আমি তো নিজসত্তা থেকে 'আমি' শব্দ মিটিয়ে দিয়েছি। সুতরাং প্রতিটি কাজ আমার মর্জি অনুযায়ী হচ্ছে। যেহেতু তা আমার আল্লাহ্‌র মর্জি অনুযায়ী হয়। এজন্যই আমি সবসময় বেশ সুখী ও আনন্দিত।

বুযুর্গদের আত্মপ্রশান্তি

বুযুর্গরা সব সময় প্রশান্তিতে থাকেন। যেমন সুফিয়ান সাওরী (রহ.) বলেন, দুনিয়ার রাজা-বাদশাহরা যদি আমাদের স্থিরতা ও প্রশান্তির খোঁজ পায়, তাহলে তারা অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে আমাদের শান্তি ছিনিয়ে নিতে আসবে এবং এই প্রশান্তি ও স্থিরতা বিলিয়ে দাও।

কিন্তু এই প্রশান্তি ও স্থিরতা তো অর্জনের বিষয়– বিনাকষ্টে পাওয়ার বিষয় নয়। এরজন্য প্রয়োজন সৃষ্টি থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে আল্লাহ্‌র কাছে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে সঁপে দেয়া।

সারকথা

প্রতিবেশী ও আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে মার্জিত ব্যবহার হতে হবে একমাত্র আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য। লোকদেখানো বা প্রথা পালনের উদ্দেশ্য এক্ষেত্রে মোটেও থাকবে না।

আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে এসব বিষয়ের উপর আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ -

মুসলিম মুসলিম ভাই ভাই

"মুসলমান মুসলমানের সাহায্যে এগিয়ে আসবে একটি সক্রিয় অঙ্গের মত। নিজের সবটুকু শক্তি-সামর্থ্য উৎসর্গ করে দেবে অপর মুসলমানের প্রয়োজন পূরণে, সমস্যার সমাধানে। তার দুঃখ-দুর্দশায় ব্যথিত হবে, ব্যাকুল হৃদয়ে এগিয়ে আসবে। এটা মুসলমান হিসাবে তার কর্তব্য। একর্তব্য পালন করতে হবে অবশ্যই।"

"বর্তমানে আমরা এক নাজুক সময় অতিক্রম করছি। মানবতার রূপ বদলে গেছে। মানুষ হয়ে গেছে অমানুষ। একটা সময় ছিলো, কেউ হোঁচট খেয়ে পড়ে গেলে তাকে ধরতে, তাকে তুলতে একাধিক মানুষ ছুটে আসতো। পথে-ঘাটে কোনো দুর্ঘটনা ঘটলে অনেকেই সাহায্যের লক্ষ্যে এগিয়ে আসতো।"

মুসলিম মুসলিম ভাই ভাই

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ، وَنَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّاتِ اَعْمَالِنَا، مَنْ يَّهْدِهِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلاَ هَادِىَ لَهُ، وَاَشْهَدُ اَنْ لاَّ إِلٰهَ اِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، وَاَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَسَنَدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلاَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ .... صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا — اَمَّا بَعْدُ :

فَأَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ – بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ– (سورة الحج : ٧٧)

وَ عَنْ اَبِىْ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : اَلْمُسْلِمُ اَخُوالْمُسْلِمُ لاَيَظْلِمُهُ وَلاَ يُسَلِّمُهُ، وَمَنْ كَانَ فِىْ حَاجَةِ اَخِيْهِ كَانَ اللهُ فِىْ حَاجَتِهِ ، وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ سَتَرَمُسْلِمًا سَتَرَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ – (ابوداود ، كتاب الادب ، باب المواخاة)

এক মুসলমানের প্রতি আরেক মুসলমানের কতটুকু দায়িত্ব এটা মুসলিমজীবনে এক বিরাট জিজ্ঞাসা। এটা ঠিক যে, এক মুসলমান অন্য মুসলমানকে কষ্ট দেবে না। জুলুম-অত্যাচারের হাত বাড়াবে না। অপর মুসলমানের অধিকার পদদলিত করবে না। তার আবেগ-অনুভূতিকে আহত করবে না। কিন্তু এতটুকুতেই কি দায়িত্ব শেষ হয়ে যাবে? মূলত মুসলমানের প্রতি মুসলমানের দায়িত্ব আরো ব্যাপক ও বিস্তৃত।

মুসলমান মুসলমানের সাহায্যে এগিয়ে আসবে শরীরের একটি সক্রিয় অঙ্গের মতো। নিজের সবটুকু শক্তি-সামর্থ উৎসর্গ করে দেবে অপর মুসলমানের প্রয়োজন পূরণে, সমস্যার সমাধানে। তার দুঃখ-দুর্দশায় ব্যথিত হবে, ব্যাকুলমনে এগিয়ে আসবে, এটা মুসলমান হিসেবে তার দায়িত্ব। এ দায়িত্ব অবশ্যই পালন করতে হবে। কুরআন মজীদে ইরশাদ হয়েছে–

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا ارْكَعُوْا وَاسْجُدُوْا وَاعْبُدُوْا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوْا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ -

"তোমরা সৎকর্ম করো, তাহলে সফলকাম হবে।" –(সূরা হজ্জ : ৭৭)

'কল্যাণ' ও 'মঙ্গল' অর্থ ব্যাপক। অন্যের সঙ্গে সদাচরণ, ভাল ব্যবহার, দয়া-মমতা ও সহমর্মিতা, অন্যের প্রয়োজনে সক্রিয় সহযোগিতা সবই মঙ্গল ও কল্যাণকর।

একটি অর্থপূর্ণ হাদীস

সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) সূত্রে বর্ণিত, রাসূল (সা.) ইরশাদ করেছেন, মুসলমান মুসলমান ভাই ভাই, মুসলমান মুসলমানকে জুলুমও করে না, শত্রুর হাতেও তুলে দেয় না। যে ব্যক্তি মুসলমানের একটি কষ্ট দূর করবে, আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন তার কষ্টও দূর করবেন। যে ব্যক্তি কোনো মুসলমানের ত্রুটি গোপন রাখবে, আল্লাহ তাআলাও কিয়ামতের দিন তার দোষ গোপন রাখবেন। –(আবু দাউদ, কিতাবুল আদাব, বাবুল মুআখাত)

মুসলমান মুসলমান ভাই ভাই

হাদীসটির প্রথম বাক্যে রাসূল (সা.) একটি মূলনীতি নির্দেশ করেছেন। বলেছেন : 'মুসলমান মুসলমানের ভাই'। আর সকলেরই জানা আছে, ভাইয়ের প্রতি ভাইয়ের আচরণ কেমন হয়। ভাইয়ের প্রতি ভাইয়ের মহব্বত ও আন্তরিকতা কেমন থাকে। রাসূল (সা.)-এর বক্তব্যের অর্থ হলো, মুসলমান

মুসলমানের প্রতি সত্যিকারের ভ্রাতৃসুলভ আচরণ করা উচিত। চাই সে মুসলমান তার অপরিচিত হোক না কেন! তার প্রতি একটা টান ও আকর্ষণ থাকা উচিত। তার সাথে পূর্বপরিচিত বা আত্মীয়তার বন্ধন নেই তবুও সে ভাই। সে তোমার আপন। সে তোমার পরম স্বজন।

রাসূল (সা.) পবিত্র এ বাক্যটির মাধ্যমে সমাজে গড়ে-ওঠা-বিভেদ ও সাম্প্রদায়িকতার সকল ভিত সমূলে উপড়ে ফেলেছেন। কে কোন দেশের, কার কোন ভাষা, গোত্রীয় আভিজাত্যের অধিকারী কে– এসব চিন্তা করার কোনো অবকাশ এখানে নেই। দেশ, ভাষা, বংশ ও বর্ণের অতল গহ্বরে নিমজ্জিত আমাদের চলমান সমাজকে নিয়ে আসতে চেয়েছেন দীপ্তিময় আন্তরিকতাপূর্ণ এক সোনালি সমাজে। বলতে চেয়েছেন : মুসলমান মুসলমানে কোনো ভেদাভেদ নেই, তফাৎ নেই, ঝগড়া নেই, হিংসা ও মারামারি নেই। তারা তো পরস্পর ভাই ভাই। দেশ, বর্ণ ও বংশীয় মর্যাদা তাদের যাই হোক না কেন– তারা মুসলমান। সুতরাং তারা ভাই ভাই। আপন ভাইয়ের মতো ভাই। অতএব, তাকে ভ্রাতৃত্বের মাপকাঠিতে বিবেচনা করতে হবে।

কেউ কারও বড় নয়

আল্লাহ তাআলা কথাটি অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী ভঙ্গিতে বলেছেন। ইরশাদ হয়েছে–

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّأُنْثٰى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوْا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ -

"হে মানবজাতি! আমি তোমাদেরকে এক পুরুষ ও এক নারী থেকে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি, যাতে তোমরা পরস্পরে পরিচিত হও। নিশ্চয় আল্লাহ্‌র নিকট সে-ই সর্বাধিক সম্ভ্রান্ত, যে সর্বাধিক খোদাভীরু। –(সূরা হুজুরাত : ১৩)

আয়াতটিতে খুব সংক্ষেপে আলোচিত হয়েছে মানববংশের উৎপত্তি ও বিস্তারের মূল কথাটি। আল্লাহ্ বলেছেন : মানবজাতি, তোমাদের সকলকে সৃষ্টি করেছি একই নর ও নারী থেকে। বংশসূত্রে তোমরা সকলেই অভিন্ন। আদম-হাওয়া তোমাদের আদি পিতা-মাতা। তোমাদের সকলের মা হযরত হাওয়া (আ.), পিতাও একজন, হযরত আদম (আ.)। মাও এক পিতাও এক। অতএব, কেউ কারো থেকে মহান নয়।

অবশ্য এ সুবাদে প্রশ্ন আসতে পারে, সকল মানুষ যখন এক আদমের সন্তান, সকলের জননীও যখন একজন– হাওয়া (আ.), তাহলে আবার মানুষ ও গোত্রের বিভক্তি কেন? মানুষের মধ্যে কেন এত দল উপদল? বিভিন্ন বংশ উপাধিতে বিভক্তি কেন এক পিতার সন্তানেরা? এরই উত্তরে আল্লাহ্ বলেছেন : 'যাতে তোমরা পরস্পরকে চিনতে পার।' কারণ, সকল মানুষের ভাষা যদি এক হতো, বর্ণ যদি একই হোত, সকলেই যদি একই বংশে জন্মগ্রহণ করতো, তাহলে একে অপরকে চেনা ও চিহ্নিত করার খুবই কঠিন হয়ে পড়তো। যথা তিনজন মানুষ। প্রত্যেকের নাম আব্দুল্লাহ, তিনজনের পরিচয় স্পষ্ট করার জন্য আমরা জন্মস্থানের নাম জুড়ে দেই। বলি, আব্দুল্লাহ করাচী, আব্দুল্লাহ লাহোরী এবং আব্দুল্লাহ পেশোয়ারী। এভাবে তিন আব্দুল্লাহর পরিচয়কে ফুটিয়ে তুলি। কখনো বা এ পরিচয়কে তুলে ধরি বংশপরিচয়ে। কখনও দলীয় পরিচয়ে। প্রকৃতপক্ষে এ পরিচয়ের প্রয়োজনেই বনী আদমকে করা হয়েছে বিভিন্ন ভাষাভাষী। এটাই রহস্য। এ ছাড়া কারো উপর কারো কোনো বিশেষত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব নেই।

হ্যাঁ, শ্রেষ্ঠত্বের একটা বিষয় আছে। তাহলো, তাকওয়া বা আল্লাহ্র ভয়। যে যত বেশি আল্লাহ্কে ভয় করবে, সে-ই তাঁর দরবারে তত বেশি সম্মানিত বলে বিবেচিত হবে। বাহ্যিক দৃষ্টিতে সে যত সাধারণ বংশেরই হোক না কেন।

পার্থক্য ইসলাম ও কুফরের

রাসূল (সা.)এর প্রতি লক্ষ্য করুন! তাঁর আদর্শই সর্বশ্রেষ্ঠ। আবু লাহাব রাসূল (সা.)-এর চাচা ও গোত্রপতি ছিল। ইসলাম কবুল করেনি। মুসলমান হয়নি। তাই কুরআন মজীদে তাকে অভিসম্পাত করা হয়েছে। এ অভিসম্পাতের কথা কুরআনের অংশে পরিণত হয়েছে। কিয়ামত অবধি যত মানুষ, যত মুসলমান কুরআন মজীদ তেলাওয়াত করবে, তারা সকলেই আবু লাহাবের প্রতি লা'নতবাণী উচ্চারণ করে বলবে :

تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَّتَبَّ

'ধ্বংস হোক আবু লাহাবের উভয় হাত আর সে ধ্বংস হয়েছেও।'

বদরের যুদ্ধ। প্রচণ্ড যুদ্ধ। রাসূল (সা.) যুদ্ধ করেছেন আপন চাচাদের বিরুদ্ধে। কত স্বজনের বিরুদ্ধে।

জান্নাতে বিলালের (রা.) অবস্থান

অন্যদিকে হযরত বিলালকে দেখুন! হাবশার মানুষ। কালো বর্ণের মানুষ। বেমানান মুখাবয়ব। অথচ নবীজি (সা.) তাঁকে বুকে তুলে নিচ্ছেন। মু'আনাকা

করছেন, বরং মার্জিতকণ্ঠে জিজ্ঞেস করছেন : বিলাল! তুমি এমন কী আমল কর? আজ আমি স্বপ্ন দেখেছি। স্বপ্নে জান্নাত দেখেছি। জান্নাতে তোমার পায়ের আওয়াজ শুনেছি। তুমি আমার আগে-আগে হেঁটে যাচ্ছিলে।

বিলাল হাবশী। গোটা আরব যাদেরকে অবজ্ঞার চোখে দেখে, ঘৃণার চোখে দেখে, সেই তাকেই মহানবী (সা.) জিজ্ঞেস করছেন, আমার আগে তুমি জান্নাতে গেলে কীভাবে?

বিলাল বিনয়ের সঙ্গে উত্তর দিলেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ! এমন কি-ই বা আমল আছে আমার। অবশ্য একটা আমল আমি নিয়মিত করি, দিনে বা রাতে যখনই অযু করি দু'রাকাত 'তাহিয়্যাতুল অযু' নামায পড়ি।' রাসূল (সা.) বললেন, 'এটাই। এরই বরকতে তুমি এত বড় সম্মান লাভ করেছ।'

[সহীহ বুখারী, বাবু ফযিলাতুত্তুহুর বিল্লাইলি ওয়ান্ নাহার ওয়া ফায্লিস সালাতি বা'দাল অযু]

বিলাল (রা.) রাসূল (সা.)-এর আগে কেন?

অনেক সময় মনে প্রশ্ন জাগে, হযরত বিলাল রাসূল (সা.)-এরও আগে চলে গেলেন। এটাও কি সম্ভব! রাসূল (সা.)-এর আগে তো কেউ যেতে পারে না!

হযরত বিলাল রাসূল (সা.)-এর আগে-আগে চলেছেন। এর অর্থ এই নয় যে, তাঁর মর্যাদা রাসূল (সা.)-এর চাইতে বেশি। প্রকৃত ঘটনা হলো, রাসূল (সা.) যখন কোথাও যেতেন, তখন বিলাল (রা.) এর অভ্যাস ছিলো তিনি আগে-আগে হাঁটতেন। রাসূল (সা.)-কে পথ দেখিয়ে দেয়ার উদ্দেশ্যে তিনি এমনটি করতেন। তাঁর হাতে সবসময় একটি ছড়ি থাকতো। রাস্তায় কষ্টদায়ক কিছু থাকলে সরিয়ে দিতেন। আর আগপিছ লক্ষ্য রাখতেন, যেন অজ্ঞাত কোনো দুশমন রাসূল (সা.)-কে হামলা করতে না পারে। দুনিয়াতে যেহেতু হযরত বিলাল সর্বদা রাসূল (সা.)-এর সামনে থাকতেন, তাই স্বপ্নেও সেটাই দেখানো হয়েছে। ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে, দুনিয়াতে তুমি আমার হাবীব (সা.)-কে হেফাযতের লক্ষ্যে আগে আগে চলতে, জান্নাতেও তোমাকে সামনে রাখবো– হে বিলাল! এটা বিলালের জন্য এক মহান পুরস্কার আল্লাহ্র পক্ষ থেকে। এ কারণেই রাসূল (সা.) জান্নাতে বিলালের পদধ্বনি নিজে আগে শুনতে পেয়েছেন।

ইসলামের বন্ধনে সবাই আবদ্ধ

এ মহান মর্যাদা বিলাল পেয়েছেন। আরবরা যাকে গোলাম বলে, কৃষ্ণ-কুশ্রী বলে ভর্ৎসনা করে, যার বংশীয় আভিজাত্য নেই, সেই বিলাল জান্নাতে নবী করীম (সা.)-এর আগে! পক্ষান্তরে আবু লাহাব, কুরআনের ভাষায় তার জন্য লা'নত হচ্ছে। কুরআন বলছে : 'আবু লাহাবের উভয় হাত নিপাত যাক।'

হযরত সুহাইল রুমী (রা.)। আরবে নবাগত। কালেমা পড়েছেন। আর তার কত মর্যাদা।

হযরত সালমান (রা.)। ইরানে যাঁর জন্ম। নবী করীম (সা.) এর দরবারে এসেছেন, ঈমান এনেছেন। মর্যাদার শীর্ষচূড়ায় আসীন হয়েছেন। নবী করীম (সা.) তাঁর সম্পর্কে ইরশাদ করেছেন :

سَلْمَانُ مِنَّا اَهْلُ الْبَيْتِ

'সালমান আমার পরিবারেরই একজন।'

রাসূল (সা.) ইসলামী ভ্রাতৃত্বের লাঠি ব্যবহার করেছেন। সাম্প্রদায়িকতা, জাতীয়তা, বংশ ও ভাষা বিদ্বেষের সকল মূর্তিকে পিটিয়ে তাড়িয়েছেন। ঘোষণা করেছেন : আমরা সেই আল্লাহ্র গোলাম, অনুগত বান্দা যিনি সকল নর-নারীকে সৃষ্টি করেছেন একই পুরুষ ও একই নারী থেকে। আরো ইরশাদ করেছেন :

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ إِخْوَةٌ

'ঈমানদারগণ পরস্পর ভাই ভাই।'

মদীনার অন্যতম দুটি গোত্রের নাম আউস ও খাযরাজ। রাসূল (সা.) যখন মদীনা এলেন, তখন তারা পরস্পর লড়াইয়ের আগুনে জ্বলছিল। পিতা মৃত্যুকালে অসীয়ত করে যায়– বাবা! সব কাজ তো করবে। কিন্তু আমার শত্রুদের থেকে প্রতিশোধ নেয়ার কথা কখনও ভুলবে না।

জাহিলী যুগে একটি যুদ্ধ হয়েছিলো। 'হারবে বাসূস' তথা বাসূস যুদ্ধ নামে প্রসিদ্ধ সংঘাত। যুদ্ধটির সূচনা হয়েছিলো এভাবে যে, এক লোকের মুরগির বাচ্চা ঢুকে পড়েছিলো অন্যজনের জমিতে। জমির মালিক ক্রোধের মাথায় বাচ্চাটি মেরে ফেলছে। এই দেখে বেরিয়ে এলো মুরগির মালিক। রাগে ফেটে পড়ার উপক্রম। শুরু হলো কথা কাটাকাটি। অতঃপর লাঠালাঠি। তারপর বের হলো তরবারি। একদিকে মুরগির মালিকের গোত্র, অন্যদিকে জমির মালিকের খান্দান। লড়াই শুরু হলো, এক মুরগির বাচ্চাকে কেন্দ্র করে যুদ্ধ শুরু হলো। চললো দীর্ঘ চল্লিশ বছর।

এ জঙ্গি লোকগুলোর মাঝেই এসেছেন আমাদের নবীজী (সা.)। বললেন, সকলেই পড়ো– লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ। সকলকে এক কালিমার বন্ধনে দিলেন আবদ্ধ করে। একই বিশ্বাসের বাঁধনে গেঁথে দিলেন যুদ্ধমুখর দুই জঙ্গি গোত্রকে। নিভে গেল বিদ্বেষের লেলিহান। যুদ্ধ থেমে গেল। এমনও সময় ছিলো, তাদেরকে দেখে কেউ কল্পনাও করতো না এরা আপস করবে। কারণ, তারা ছিলো একে অপরের খুনপিয়াসী। ভ্রাতৃত্বের শক্ত প্রাচীর গড়ে উঠলো তাদের মধ্যে। এদিকে ইঙ্গিত করে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন :

وَاذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَآءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوْبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا -

"আর তোমরা সেই নেয়ামতের কথা স্মরণ কর, যা আল্লাহ্ তোমাদেরকে দান করেছেন। তোমরা পরস্পর শত্রু ছিলে, অতঃপর আল্লাহ্ তোমাদের মনে সম্প্রীতি দান করেছেন। ফলে এখন তোমরা তাঁর অনুগ্রহের কারণে পরস্পর ভাই ভাই হয়েছো।" –(সূরা আলে-ইমরান : ১০৩)

আমরা আজ মূলনীতি ভুলে বসেছি

সারকথা, আলোচ্য হাদীসটির মাধ্যমে রাসূল (সা.) প্রধানত একটি মূলনীতির কথা বলেছেন। মূলনীতিটি হলো, মুসলমান মুসলমান ভাই ভাই। এ ক্ষেত্রে ভাষা, গোত্র ও রং এর কোনো ভেদাভেদ নেই। পরস্পর ভ্রাতৃত্বসুলভ আরচণ করবে, একথা ভাববার অবকাশ নেই। সে তো আমার বংশের নয়, কিংবা আমার দেশের নয়। এ জাতীয় কথা সর্বপ্রথম আমাদেরকে মন থেকে ঝেড়ে ফেলে দিতে হবে। বদ্ধপরিকর হতে হবে, মুসলমানমাত্রই আমার ভাই। ইসলামের ইতিহাস সাক্ষী, মুসলমানরা যখন পরাজিত হয়েছে, লাঞ্ছনা-গঞ্জনার শিকার হয়েছে এর মৌলিক কারণ ছিলো একটাই। তাহলো, তারা পরস্পর ভ্রাতৃত্ববোধ হারিয়ে ফেলেছে। কেউ হয়তো প্ররোচনা দিয়েছে, বিভেদ সৃষ্টি করেছে যে, অমুক তো তোমার জাতির কেউ নয়, সে তো ভিন্ন জাতির। পরিণামে মুসলিম জাতি অনেক কিছুই হারিয়েছে। হে আল্লাহ্! আমাদের হৃদয়ে এ মূলনীতি বসিয়ে দিন। আমীন।

আর আমরা মুখ ফেনায়িত করে বলি, মুসলমান মুসলমান ভাই ভাই। অথচ কার্যক্ষেত্রে আমরা তার কী প্রমাণ দেখাচ্ছি? বিষয়টি অনুধাবন করে আত্মজিজ্ঞাসার সময় এসেছে। নিজের হিসাব নিজে নেয়ার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। অতীতে ভুল করে থাকলে এ মুহূর্তে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হওয়া উচিত। পৃথিবীর

সকল মুসলমান আমার ভাই। সকলের সাথে ভাইয়ের মতো আচরণ করবো, আল্লাহ্ আমাদেরকে দয়া করুন। আমাদের হৃদয়ে কথাটি গেঁথে দিন।

হাদীসের পরবর্তী অংশে 'মুসলমান মুসলমান ভাই ভাই' এর কিছু নিদর্শন পেশ করা হয়েছে। প্রথম নিদর্শন হলো মুসলমান কস্মিনকালেও অপর মুসলমানের প্রতি অত্যাচারের হাত বাড়ায় না। যেহেতু সে ভাই। ভাইয়ের উপর কি কেউ অত্যাচার করতে পারে? তার জান-মাল, ইজ্জত-আব্রু সকল কিছুর প্রতিই সে আন্তরিকভাবে লক্ষ্য রাখে। লক্ষ্য রাখে, তাঁর সমূহ অধিকারের প্রতি।

তারা পরস্পর সহযোগী

অতঃপর রাসূল (সা.) বলেছেন : মুসলমান কখনও অপর মুসলমানকে শত্রুর হাতে ছেড়ে দেয় না। বরং সে সর্বদা তার সাহায্যে একপায়ে খাড়া থাকে। বিপদকালে সাহায্যের জন্য ঝাঁপিয়ে পড়ে। তাকে অসহায় ছেড়ে দেয় না। সে ভাবতেও পারে না অমুক বিপদে পড়েছে তাতে আমার কী? যার বিপদ, সে-ই সামলাবে। এটা আমার সাথে কিসের সম্পর্ক। আমার তো কিছু হয়নি। এ ধরনের স্বার্থপরতা দেখিয়ে কেটে পড়া কোনো মুসলমানের চরিত্র হতে পারে না।

বরং মুসলমানের কর্তব্য হলো, কোনো মুসলমান অসুস্থ হলে, বিপদে পড়লে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সহযোগিতার জন্য এগিয়ে আসবে। দুঃখ ও পেরেশানি দূর করতে চেষ্টা করবে। নিজের সময় ও ব্যস্ততার প্রতি না তাকিয়ে সাহায্যের জন্য অগ্রসর হবে।

এ যুগের একটি শিক্ষণীয় ঘটনা

আমরা এক নাজুক সময় অতিক্রম করছি। এখন মানবতার রূপ বদলে গেছে। এখন মানুষ হয়ে গেছে অমানুষ। একটা সময় ছিলো, কেউ হোঁচট খেয়ে পড়ে গেলে তাকেও ধরতে, ধরে তুলতে অনেকেই ছুটে আসতো। পথে-ঘাটে কোনো দুর্ঘটনা ঘটলে অনেকেই সাহায্যের লক্ষ্যে দৌড়ে আসতো।

অথচ আমাদের বর্তমান অবস্থা কেমন যাচ্ছে– একটি ঘটনা বললে বুঝতে পারবেন। আমি একবার দেখলাম, একটি গাড়ি এক লোককে ধাক্কা মেরে চলে গেছে। লোকটি চিৎ হয়ে রাস্তায় পড়ে গেলো। তারপর তার পাশ দিয়ে কমপক্ষে বিশ-পঁচিশটি গাড়ি চলে গেছে। আল্লাহ্র কোনো বান্দার পক্ষে সম্ভব হলো না যে, রাস্তায় নেমে তাকে একটু সাহায্য করবে। অথচ আজকের পৃথিবীর সকলেই নিজেদেরকে সভ্য ও প্রগতিশীল বলে দাবি করে।

ইসলাম তো অনেক দূরের কথা। সাধারণ মানবতার দাবিও তো এটা ছিলো। লোকটিকে একটু দেখবে কতটুকু আহত হয়েছে। যথাসম্ভব সহযোগিতা করা তো ছিলো মানবিক কর্তব্য।

রাসূল (সা.) আলোচ্য হাদীসটির মাধ্যমে একথাই বলেছেন : কোনো মুসলমানের চরিত্র এটা নয় যে, অপর মুসলমানকে অসহায় অবস্থায় ফেলে রেখে সে কেটে পড়বে। বরং তার পাশে দাঁড়ানো, সাধ্যানুযায়ী সহযোগিতা করাই তো একজন মুসলমানের কর্তব্য।

রাসূল (সা.) এর আদর্শ

রাসূল (সা.) এর চরিত্র ছিলো, তিনি যখনই শুনতেন যে, অমুক ব্যক্তির এটা প্রয়োজন অথবা সে পীড়িত, বিপদগ্রস্ত, তখনই তিনি অস্থির হয়ে পড়তেন। হৃদয় উজাড় করে সহযোগিতার জন্য এগিয়ে যেতেন। সাহায্য না করা পর্যন্ত তিনি প্রশান্তি পেতেন না।

শুধু হুদায়বিয়ার সন্ধির সময় যখন তিনি কাফেরদের সঙ্গে সন্ধি করলেন, তখন আল্লাহ্র হুকুমে– মুসলমানদের সাহায্য না দিতে এবং কাফেরদের হাতে ফেরত দিতে অঙ্গীকারাবদ্ধ ছিলেন। তাই তিনি মক্কা থেকে পালিয়ে আসা মুসলমানদেরকে মক্কায় ফিরিয়ে দিতে বাধ্য ছিলেন। এটা ছিলো তাঁর অপারগতা। এ ছাড়া ইতিহাসে এমন ঘটনা খুঁজে পাওয়া যায় না যে, তিনি কোনো মুসলমানকে সাহায্য করতে সকল সামর্থ্য প্রয়োগ করেননি। আজ তাঁর আদর্শ আমাদের বড়ই প্রয়োজন। প্রয়োজন 'ভাই ভাই' আলোকিত সমাজ। আল্লাহ্ আমাদেরকে এ তাওফীক দান করুন। আমীন।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ -

সৃষ্টিকে ভালোবাসুন

"মাওলার ভালোবাসা কীভাবে লায়লার ভালোবাসা অপেক্ষা কম হয়? লায়লার প্রতি মজনুর যে ভালোবাসা, তার জোয়ারে ভাটা আছে। আর মাওলার ভালোবাসার জোয়ারে ভাটা নেই। সমূহ ভালোবাসার আধার আমার মাওলা— আমার স্রষ্টা— আমার আল্লাহ্। তিনি সকল বাদশাহের বাদশাহ। সুতরাং তাঁর প্রতি অগাধ ও অসীম ভালোবাসা থাকতে হবে। সেই ভালোবাসার আকর্ষণে তাঁর সব সৃষ্টিকেই ভালোবাসতে হবে।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ، وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّاٰتِ اَعْمَالِنَا، مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِىَ لَهٗ، وَاَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ، وَاَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَسَنَدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ .... صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى آلِهٖ وَأَصْحَابِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا كَثِيْرًا — اَمَّا بَعْدُ :

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللّٰهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَعَلٰى مُعْسِرٍيَسَّرَاللّٰهُ عَلَيْهِ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ، وَمَنْ سَتَرَمُسْلِمًا سَتَرَهُ اللّٰهُ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَاللّٰهُ فِىْ عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِىْ عَوْنِ اَخِيْهِ ، وَمَنْ سَلَكَ طَرِيْقًا يَلْتَمِسُ فِيْهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللّٰهُ لَهٗ بِهٖ طَرِيْقًا اِلَى الْجَنَّةِ وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِىْ بَيْتٍ مِنْ بَيْتِ اللّٰهِ تَعَالٰى يَتْلُوْنَ كِتَابَ اللّٰهِ يَتَدَارَسُوْنَهٗ بَيْنَهُمْ اِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِيْنَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ ، وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَآئِكَةُ ، وَذَكَرَهُمُ اللّٰهُ فِيْمَنْ عِنْدَهٗ ، وَمَنْ بَطَّأَبِهٖ عَمَلُهٗ لَمْ يُسْرِعْ بِهٖ نَسَبُهٗ —

(صحيح مسلم ، كتاب الذكروالدعاء ، باب فضل الا جتماع على تلاوة القران)

হাম্‌দ ও সালাতের পর!

'জাওয়ামিউল কালিম' কী?

আলোচ্য হাদীসটি বর্ণনা করেছেন সাহাবী হযরত আবু হুরায়রা (রা.)। রাসূলুল্লাহ (সা.) এর পবিত্র মুখ থেকে নিসৃত বেশ ক'টি বাক্য হাদীসটিতে স্থান পেয়েছে। শব্দশরীরের দিক থেকে যদিও হাদীসের বাক্যগুলো সংক্ষিপ্ত, কিন্তু মর্মার্থের দিক থেকে প্রতিটি বাক্য ব্যাপক তাৎপর্যপূর্ণ। এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন– أُوْتِيْتُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ 'আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে আমাকে 'জাওয়ামিউল কালিম' দান করা হয়েছে। অর্থাৎ– শব্দবিবেচনায় যদিও সংক্ষিপ্ত; কিন্তু মর্মার্থ ও আমলের দিক থেকে ব্যাপক তাৎপর্যসমৃদ্ধ ভাষা আল্লাহ্ আমাকে দান করেছেন। আলোচ্য হাদীসটিও এই শ্রেণীভুক্ত।

কারো দুশ্চিন্তা দূর করার মাঝে সাওয়াব রয়েছে

প্রথম বাক্যটিতে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি কোনো মুমিন ভাইয়ের জাগতিক কোনো দুঃখ-দুশ্চিন্তা দূর করলো, যেমন এক মুমিন বিপদে পড়লো, অপর মুমিন তার সহযোগিতায় এগিয়ে এলো, কথা বা কাজ দ্বারা কিংবা অন্য কোনোভাবে তাকে সহযোগিতা করলো, তাহলে এর জন্য বিশাল সাওয়াব রয়েছে। তাহলো, আল্লাহ তাআলা কেয়ামতের দিন তার কোনো দুঃখ-দুশ্চিন্তা রাখবেন না।

অসচ্ছল ব্যক্তিকে সুযোগ দেয়ার ফযীলত

দ্বিতীয় বাক্যের মর্মার্থ হলো, যে ব্যক্তি কোনো মুমিন ভাইয়ের বিপদ দূর করার লক্ষ্যে কোনো সুযোগ সৃষ্টি করে দিলো, যেমন এক ব্যক্তি ঋণগ্রস্ত, ঋণ পরিশোধ করার ব্যাপারে সে সম্পূর্ণ আন্তরিক। ওয়াদামতো সে ঋণ পরিশোধ করার ইচ্ছা তার পুরোপুরি আছে। কিন্তু অসচ্ছলতার কারণে পারছে না। এখন ঋণদাতার এ অধিকার আছে যে, সময়মতো সে তার টাকা দাবি করবে, আবার সে ইচ্ছা করলে ঋণগ্রহীতার অপারগতার দিকে লক্ষ্য করে আরো কিছুদিনের সময়ও দিতে পারে। যদি দ্বিতীয়টি করে, তাহলে তার এ সামান্য দয়ার জন্য আল্লাহ্ তাকে দুনিয়া ও আখেরাতে দয়া করবেন। তার অসচ্ছলতা দূর করে দেবেন। এই মর্মে কুরআন মজীদে আল্লাহ তাআলা বলেছেন :

وَإِنْ كَانَ ذُوْ عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلٰى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ –

'যদি ঋণগ্রহীতা অভাবগ্রস্ত হয়, তবে তাকে সচ্ছলতা আসা পর্যন্ত সুযোগ দেয়া উচিত। –(সূরা বাক্বারা : ২৮০)

কোমলতা আল্লাহ্‌র কাছে প্রিয়

কোমলতা আল্লাহ্ পছন্দ করেন। আল্লাহ্‌র বান্দাদের সঙ্গে নম্র আচরণ করা একটি নেক আমল। এটা আল্লাহ্ খুবই পছন্দ করেন। পাওনাদার নিজের পাওনা যে কোনো সময় চাইতে পারে। এটা তার অধিকার। সে ইচ্ছা করলে এজন্য ঋণগ্রহীতাকে জেলেও ঢোকাতে পারে। তবে ইসলাম একজন মুসলমানের কাছে এ ধরনের আচরণ আশা করে না। ইসলাম বলে, কত এলো আর কত গেল– এটা মূল্যায়নের বিষয় নয়। মূল্যায়নের বিষয় হলো, একজন মুসলমান অপর মুসলমানের সঙ্গে কেমন আচরণ করেছে। আচরণে যদি নম্রতা থাকে, তবে সেটাই আল্লাহ্‌র কাছে প্রিয়। কতটুকু প্রিয় এর কোনো সীমা নেই। এর পরিবর্তে আল্লাহ্ও তার সঙ্গে কেয়ামতের দিন কোমলতা দেখাবেন।

অপর মুসলমানের প্রয়োজন পূরণ করার ফযীলত

অন্য হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন :

مَنْ كَانَ فِيْ حَاجَةِ أَخِيْهِ كَانَ اللهُ فِيْ حَاجَتِهِ –

(ابو داؤد ، كتاب الادب ، باب المؤاخاة)

যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের অভাবে সাহায্য করবে, আল্লাহ্ও তার অভাবে সাহায্য করবেন।

তিনি আরো বলেছেন–

مَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ –

'যে ব্যক্তি কোনো মুসলমানের দুঃখ-কষ্ট দূর করবে, আল্লাহ তাআলা তার বিপদসমূহের কোনো একটি বড় বিপদ দূর করে দেবেন।

সৃষ্টির উপর দয়া করো

অপর ভাইকে সাহায্য করা, তার দুঃখ-কষ্ট দূর করার মতো মহান আমল একজন মানুষ থেকে তখন প্রকাশ পায়, যখন তার অন্তরে সৃষ্টির প্রতি ভালোবাসা থাকে। এ দু'টি কাজ লোকদেখানের উদ্দেশ্যে করলে এর কোনো মূল্য থাকে না। নিয়ত করতে হবে যে, লোকটি আমার আল্লাহ্র বান্দা, তাঁরই সৃষ্টি। এজন্য আমি তার সঙ্গে সদাচরণ করবো, এতে আল্লাহ্ আমাকে সাওয়াব দান করবেন। নিয়ম শুদ্ধ হলে কাজ মূল্যবান হবে। আমরা আল্লাহ্কে ভালোবাসি। এ ভালোবাসার একটা দাবি আছে। তাহলো, তাঁর বান্দাকে ভালোবাসা। এজন্য আল্লাহ্র ভালোবাসা পেতে হলে তাঁর বান্দাকে ভালোবাসতে হবে। হাদীস শরীফে এসেছে—

اَلرَّاحِمُوْنَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمٰنُ — اِرْحَمُوْا مَنْ فِى الْاَرْضِ
يَرْحَمُكُمْ مَنْ فِى السَّمَاءِ – (ابو داؤد ، كتا الادب ، باب الرحمة)

যাঁরা অন্যের উপর দয়া করে, দয়ালু আল্লাহ্ তাদের উপর দয়া করেন। তোমরা জমিনবাসীদের উপর দয়া করো, তাহলে আসমানবাসীরা তোমাদের উপর দয়া করবেন।

লায়লার শহর ও দেয়ালের প্রতি মজনুর ভালোবাসা

ভালোবাসার মানুষটির প্রতিটি জিনিসই ভালো লাগে। এ মর্মে মজনূন-লায়লার প্রেমের প্রসিদ্ধি আছে। মজনূন বলল—

اَمُرُّ عَلَى الدِّيَارِ دِيَارِ لَيْلٰى
اُقَبِّلُ ذَا الْجِدَارِ وَذَا الْجِدَارِ

যখন আমি লায়লার বাসস্থান দিয়ে চলি, তখন তার প্রতিটি জিনিসকেই আমি ভালোবাসি। তাই একবার এই দেয়াল, আবার ওই দেয়ালে আমি চুমো খাই। কেন আমি এমনটি করি?

وَمَا حُبُّ الدِّيَارِ شَغَفْنَ قَلْبِىْ
وَلٰكِنْ حُبُّ مَنْ سَكَنَ الدِّيَارَ

আসলে লায়লার বাসস্থানের প্রতি আমার আসক্তি নেই। বরং আমার আসক্তি হচ্ছে এ বাসস্থানের বাসিন্দার প্রতি। এ বাসস্থান তো সে বাসিন্দারই বাসস্থান। এ দেয়ালগুলোর মাঝেও আমি তার ছোঁয়া খুঁজে পাই।

মজনূন লায়লার প্রেমের আকর্ষণে যদি তার বাড়ি-ঘর চুমো দিতে পারে এবং এরই মধ্য দিয়ে ইশ্ক প্রকাশ করতে পারে, তাহলে যে ব্যক্তি আল্লাহ্কে ভালোবাসে, সে তাঁরই বান্দাকে ভালোবাসা ছাড়া আল্লাহ্র ভালোবাসার চিন্তা কীভাবে করতে পারে?

আল্লাহ্র ভালোবাসা কি লায়লার ভালোবাসার চেয়েও কম?

মসনবী শরীফে মাওলানা রূমী (রহ.) লিখেছেন, মজনূন লায়লার শহরের কুকুরকেও ভালোবাসতো। লায়লার শহরের কুকুর— সামান্য এ ভাবনাটুকুও তার অন্তরে পুলক জাগাতো। এরপর মাওলানা রূমী লিখেন—

عشق مولیٰ کے کم از لیلیٰ بود
گوئے گشت بہر او اولی بود

মাওলার ভালোবাসা কীভাবে লায়লার ভালোবাসা অপেক্ষা কম হয়? লায়লার ভালোবাসার জোয়ারে ভাটা আছে আর মাওলার ভালোবাসার জোয়ারে ভাটা নেই। সমূহ ভালোবাসার আধার আমার মাওলা— আমার আল্লাহ্। তিনি সকল বাদশাহর বাদশাহ। সুতরাং তাঁর প্রতি ভালোবাসা থাকতে হবে। সে ভালোবাসার আকর্ষণে তাঁর সব সৃষ্টিকেই ভালোবাসতে হবে। এমনকি একটি জন্তুর প্রতিও মহব্বত থাকতে হবে। এ জন্তুটি তো আমার আল্লাহ্র সৃষ্টি। এ কারণেই ইসলামী শরীয়তের জীব-জন্তুর অধিকারও নিশ্চিত করা হয়েছে এবং তাদের প্রতিও সহমর্মিতা দেখানোর নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

একটি কুকুরকে পানি পান করানোর ঘটনা

বুখারী শরীফে এসেছে, এক পেশাদার ব্যভিচারিণী কোথাও যাচ্ছিলো। পথিমধ্যে সে দেখতে পেলো, একটি কুকুর পিপাসায় কাতর হয়ে পড়ে আছে। পিপাসার তীব্রতায় সে জমিন চাটছে। পাশেই ছিলো একটি কূপ। এ দৃশ্য দেখে মহিলার মনে দয়া জাগলো। তাই সে নিজের পা থেকে মোজা খুলে নিলো এবং মোজা ভর্তি করে কূপ থেকে পানি তুলে এনে কুকুরটিকে পান করালো। ব্যভিচারিণী মহিলার এ কাজটি আল্লাহ্র কাছে দারুণভাবে গৃহীত হলো। ফলে আল্লাহ্ তাকে মাফ করে দিলেন। সুতরাং আল্লাহ্কে ভালোবাসতে হলে তাঁর

সৃষ্টিকে ভালোবাসতে হবে। এমনকি জীবজন্তুর সঙ্গে ভালো আচরণ করতে হবে।

সৃষ্টিকে ভালোবাসার একটি ঘটনা

মাওলানা মাসীহুল্লাহ খান সাহেব (রহ.)। আল্লাহ্‌র এ বান্দা সৃষ্টিকে খুব ভালোবাসতেন। এমনকি কোনো জীব-জন্তুকে তিনি নিজহাত দ্বারা তাড়াতেন না। প্রহার করা তো অনেক দূরের কথা। তিনি ভাবতেন, একেও তো আমার আল্লাহ্‌ই সৃষ্টি করেছেন। একবারের ঘটনা। তিনি পায়ে আঘাত পেয়েছেন। ফলে পা ক্ষত হয়ে গিয়েছিলো। ক্ষতস্থানে মশা-মাছি বসলো। এতে অবশ্যই তিনি কষ্ট পাচ্ছিলেন। কিন্তু তাঁর যেন সেদিকে কোনোই ভ্রূক্ষেপ নেই। আপন মনে তিনি নিজ কাজ করে যাচ্ছেন। এই অবস্থা দেখে এক ভদ্রলোক বললেন, হযরত! অনুমতি দিলে আমি আপনার ক্ষতস্থান থেকে মাছিগুলো তাড়িয়ে দিতে পারি। হযরত উত্তর দিলেন, ভাই! মাছিগুলো তাদের কাজ করছে, আর আমি করছি আমার কাজ। তাদেরকে তাদের কাজ করতে দিন আর আমাকে আমার কাজ করতে দিন।

আমাদের বড়রা আল্লাহ্‌র সৃষ্টিকে এভাবেই ভালোবাসতেন। আল্লাহ্‌কে ভালোবাসার পথ ও পদ্ধতি তাঁরা পেয়েছেন বিধায় সেভাবেই আমল করেছেন।

একটি মাছির উপর দয়ার এক চমৎকার ঘটনা

ঘটনাটি হযরত ডাক্তার আবদুল হাই (রহ.) থেকে আমি একাধিকবার শুনেছি। এক বুযুর্গের ঘটনা। তিনি ছিলেন একজন বিদগ্ধ আলেম, মুহাদ্দিস ও মুফাসসির। পঠন-পাঠনে, লেখালেখিতে তিনি অনন্য ছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পরে এক লোক তাঁকে স্বপ্নে দেখলো। তখন সে জিজ্ঞেস করলো, হযরত! আপনার সঙ্গে কেমন ব্যবহার করা হচ্ছে? তিনি উত্তর দিলেন, সবই আল্লাহ্‌র দয়া, যিনি আমার সঙ্গে ভালো আচরণ করেছেন। তবে আমার বিষয়টা খুব বিস্ময়কর। আমার ধারণা ছিলো, আমি আলহামদুলিল্লাহ দ্বীনের বহু খেদমত করেছি, আজীবন ওয়াজ-নসিহত, লেখালেখি ও দরস-তাদরীসে কাটিয়েছি। সুতরাং হিসাব-কিতাবের সময় নিশ্চয় এগুলো কাজে আসবে। কিন্তু ঘটনা ঘটলো এর ব্যতিক্রম। যখন আল্লাহ্‌র সামনে আমকে উপস্থিত করা হলো, আল্লাহ্ বললেন, তোমাকে আমি মাফ করে দিলাম। কিন্তু তুমি কি জানো যে, তোমাকে ক্ষমা করলাম কেন? তখন আমি মনে মনে ভাবলাম, আমার খেদমতের বদৌলতে নিশ্চয় আমি মাফ পেয়ে গেছি। কিন্তু আল্লাহ্ আমাকে জানালেন ভিন্ন কথা, তিনি

বললেন, তোমার খেদমতের কারণে তোমাকে মাফ করা হয়নি; বরং ক্ষমা করা হয়েছে অন্য কারণে। তাহলো দুনিয়াতে থাকাকালীন একদিন তুমি লিখছিলে, (তখনকার যুগে কাঠের কলম দিয়ে লেখা হতো এবং দোয়াত থেকে বারবার কালি নিতে হতো) তোমার কলমটাকে তুমি দোয়াত থেকে যখন উঠিয়েছিলে, তখন একটি মাছি এসে তোমার কলমের ডগায় বসেছিলো এবং কালি চুষে-চুষে খাচ্ছিলো। এ অবস্থা দেখে তুমি তখন ভেবেছিলে যে, হয়তোবা মাছিটি পিপাসার্ত। এ ভেবে তুমি কিছুক্ষণের জন্য লেখা বন্ধ রেখেছিলে, যেন মাছিটি তার পিপাসা নিবারণ করতে পারে। এ কাজটি তুমি একমাত্র আমার জন্যই করেছিলে। তোমার কাজটিতে ইখলাস ছিলো এবং আমার প্রতি ভালোবাসার প্রকাশ ছিলো, তাই তোমার এ আ'মলটি আমার কাছে ভালো লেগেছে। আর এজন্যই তুমি ক্ষমা পেয়ে গেছো।

সৃষ্টির সেবার নাম তাসাউফ

এ প্রসঙ্গে কবি চমৎকার বলেছেন—

ز تسبیح و سجادہ و دلق نیست

طریقت بجز خدمت خلق نیست

তাসবীহ, জায়নামায আর জুব্বার নাম তরীকত নয়, বরং খেদমতে খালক তথা সৃষ্টির সেবার নাম তরীকত।

মূলত কোনো বান্দা যখন আল্লাহকে ভালোবাসে, তখন আল্লাহ্‌ও তাকে ভালোবাসেন। ফলে আল্লাহ তাআলা তার অন্তরে সৃষ্টির মহব্বত ঢেলে দেন, যার কারণে মানুষের প্রতি, এমনকি জীব-জন্তুর প্রতিও তার অন্তরে মহব্বত সৃষ্টি হয়ে যায়।

আল্লাহ্ নিজ সৃষ্টিকে ভালোবাসেন

মানুষ যদি একটি পাথরও বানায়, তাহলে সেটার প্রতি তার অন্তরে মহব্বত তৈরি হয়ে যায়। এবার একটু ভাবুন, আল্লাহ্‌র সৃষ্টি, যেগুলো তিনি নিজেই সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং নিজের সৃষ্টির প্রতি ভালোবাসা থাকাটাই যুক্তিযুক্ত। কাজেই আল্লাহ্‌কে ভালোবাসতে হলে তাঁর সৃষ্টিকে ভালোবাসতে হবে।

হযরত নূহ (আ.)-এর একটি চমৎকার ঘটনা

হরত নূহ (আ.) এর জাতি তুফানে আক্রান্ত হয়েছিলো। ফলে তারা ধ্বংস হয়ে গিয়েছিলো। তারপর আল্লাহ তাআলা হযরত নূহ (আ.)-কে নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, কিছু মাটির পাত্র বানাও। নূহ (আ.) আল্লাহ্র নির্দেশ পালনে লেগে গেলেন। দিন-রাত শুধু এ কাজেই লেগে থাকলেন। এক পর্যায়ে পাত্র যখন অনেক হয়ে গেল, তখন আল্লাহ্ নির্দেশ দিলেন, সব পাত্র ভেঙ্গে ফেলো। এতে হযরত নূহ (আ.) বিচলিত হলেন। বললেন, হে আল্লাহ্! আমি এগুলোর পেছনে খুব কষ্ট করেছি, আর তা আপনারই নির্দেশ করেছি। এখন আপনি ভাঙ্গার নির্দেশ দিচ্ছেন! আল্লাহ্ উত্তর দিলেন, এটা আমার নির্দেশ। অবশেষে কী আর করা। নূহ (আ.) আল্লাহ্র নির্দেশ পালনার্থে সব পাত্র ভেঙ্গে ফেললেন। কিন্তু তাঁর অন্তর ছিলো ভারাক্রান্ত। এত কষ্টের জিনিস নিজহাতে ভাঙ্গার কারণে তিনি দুঃখ পেয়েছিলেন। তাঁর হৃদয়ের অবস্থা দেখে আল্লাহ্ বললেন, হে নূহ! তুমি পাত্রগুলো বানিয়েছিলে আমারই নির্দেশে। এগুলোর পেছনে তোমর ঘাম ঝরেছে। ফলে এগুলোর প্রতি তোমার ভালোবাসা সৃষ্টি হয়ে গিয়েছে। নিজেরই শ্রমের ফসল আবার নিজ হাতে ভেঙ্গে ফেলেছ। এটাও ছিলো আমার নির্দেশ। কিন্তু এ নির্দেশ পালন করতে গিয়ে তুমি ব্যথিত হয়েছ। নিজের শ্রম এভাবে ধ্বংস করে দেয়ার জন্য তোমার মন চাচ্ছিলো না। এবার চিন্তা করো, এসব সৃষ্টিজীব আমারই হাতের সৃষ্টি। তোমার জাতির মানুষগুলোকে সৃষ্টি করেছি আমি। অথচ তুমি এক কথায় বলে দিলে–

وَقَالَ نُوحٌ رَّبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا –

হে আমার পালনকর্তা! আপনি পৃথিবীর বুকে কোনো কাফের গৃহবাসীকে রেহাই দেবেন না। সব কাফেরকে ধ্বংস করে দিন। –(সূরা নূহ : ২৬)

তোমার এই একটিমাত্র প্রার্থনায় আমি নিজ সৃষ্টিকে ধ্বংস করে দিয়েছি।

মূলত হযরত নূহ (আ.)-কে আল্লাহ তাআলা এদিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, মাটির পাত্রগুলো বানানোর নির্দেশ আমি দিয়েছি। আমার নির্দেশে তুমি এগুলো বানিয়েছ। তোমার নিজস্ব খাহেশ পূরণের জন্য তুমি এগুলো বানাওনি। আর এ মাটিও ছিলো আমার। অথচ সেই পাত্রগুলোর প্রতি তোমার কত ভালোবাসা! সুতরাং আমার সৃষ্টির প্রতি কি আমার ভালোবাসা থাকবে না?

ডা. আবদুল হাই (রহ.)-এর একটি বাণী

ডা. আবদুল হাই (রহ.) বলতেন, আমি যখন আল্লাহ্র ইবাদত করি এবং তাঁর প্রতি মহব্বত সৃষ্টি হওয়ার জন্য দু'আ করি যে, হে আল্লাহ্! আমার মাঝে আপনার মহব্বত তৈরি করে দিন, তখন আমি অনুভব করি, আল্লাহ্ যেন আমাকে বলছেন, তুমি কি আমাকে ভালোবাসতে চাও? অথচ আমি তো অদৃশ্য, তাহলে আমাকে ভালোবাসবে কীভাবে? আমাকে তো এমনভাবে ভালোবাসতে হবে, যেন সরাসরি আমাকে দেখতে পাচ্ছ। সুতরাং এ লক্ষ্যে একটা কাজ করো, তুমি আমার বান্দাদেরকে ভালোবাস, তাদের উপর দয়া করো, তাদের সঙ্গে কোমল আচরণ করো। এর মাধ্যমে আমার সঙ্গে তোমার গভীর ভালোবাসা সৃষ্টি হবে। এটাই আমাকে ভালোবাসার পথ ও পদ্ধতি।

অতএব, একজন সাধারণ মানুষকেও হেয় চোখে দেখা যাবে না। বরং তার প্রতিও দরদ ও ভালোবাসা দেখাতে হবে। তার দুঃখ-কষ্টে এগিয়ে যেতে হবে। তার প্রয়োজন পূরণে সক্রিয় ভূমিকা রাখতে হবে।

আল্লাহ্ওয়ালাদের অবস্থা

আমাদের সকল বুযুর্গের অবস্থা ছিলো, তারা মানুষকে গুনাহের সাগরে ডুবে থাকতে দেখলে গুনাহগারকে ঘৃণা করতেন না; বরং ঘৃণা করতেন গুনাহকে। কারণ, গুনাহর প্রতি ঘৃণা প্রদর্শন ওয়াজিব; কিন্তু মানুষকে হেয় মনে করা ইসলামের শিক্ষা নয়।

হযরত জুনাইদ বাগদাদী (রহ.)-এর ঘটনা

হযরত জুনাইদ বাগদাদী (রহ.)-এর ঘটনা। তিনি দজলার পাড় দিয়ে হাঁটছিলেন। তখন দেখতে পেলেন উদ্ভট কিছু যুবক কিশতির মধ্যে বসে আড্ডা মারছে। উপচানো রস-আনন্দে, গান-বাজনায় তারা মেতে ছিলো। এরূপ আড্ডার পরিবেশে কোনো মোল্লা-মৌলভীকে দেখতে পেলে আড্ডাবাজরা সাধারণত হাসি-তামাশা করে। এসব যুবকও তা-ই করলো। তারা জুনাইদ বাগদাদী (রহ.)-এর উদ্দেশ্যে একথা ওকথা বলতে লাগলো। এটা দেখে জুনাইদ বাগদাদী (রহ.)-এর সঙ্গী তাঁকে বললেন, হযরত! আপনি এসব যুবকের জন্য বদদু'আ করুন। এরা একে তো নিজেরা গুনাহতে লিপ্ত, পরন্তু আপনাকে নিয়েও হাসি-তামাশায় লিপ্ত। জুনাইদ বাগদাদী (রহ.) তখন হাত উঠালেন, দু'আ করলেন, হে আল্লাহ্! আপনি এসব যুবককে এ দুনিয়াতে যেমনিভাবে আনন্দে রেখেছেন, আখেরাতেও তাদেরকে এরূপ আনন্দ দান করুন।

এমনই ছিলো বুযুর্গদের স্বভাব ও কর্ম। তারা গুনাহগারকে নয়, গুনাহকে ঘৃণা করতেন।

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর দয়া

মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা.)। আল্লাহ্ তাঁকে বিশ্ববাসীর জন্য রহমতস্বরূপ পাঠিয়েছেন। কাফেরদের পক্ষ থেকে তিনি অমানবিক নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। তারা তাঁকে পাথর মেরেছিলো, কঙ্কর মেরেছিলো, তাঁর পবিত্র পা বেয়ে রক্ত ঝরেছিলো, অথচ তখনও তিনি দু'আ করছিলেন–

اَللّٰهُمَّ اهْدِقَوْمِىْ فَاِنَّهُمْ لاَ يَعْلَمُوْنَ —

হে আল্লাহ্! আমার জাতিকে হিদায়াত দান করুন। তারা তো আমাকে চেনে না। মূর্খতার কারণে তারা এমন করছে। আপনি তাদেরকে হিদায়াত দিন।

এ দু'আ কেন করেছেন? কারণ, কাফেরের প্রতি তাঁর বিদ্বেষ ছিলো না, বরং মূলত বিদ্বেষ ছিলো কুফরির প্রতি।

গুনাহগারকে ঘৃণা করো না

গুনাহকে ঘৃণা করতে হবে। কারণ, গুনাহকে ঘৃণা না করাও এক প্রকার গুনাহ। তবে যে ব্যক্তি গুনাহর মাঝে লিপ্ত, তার প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করা যাবে না, তাকে হেয়-প্রতিপন্ন করা যাবে না। কেননা, গুনাহগার তো একজন রোগীর মতো, চিকিৎসক রোগীকে ঘৃণা করে না, বরং তার জন্য আফসোস করে এবং তার রোগমুক্তি কামনা করে। এজন্য দু'আও করে। অনুরূপভাবে ফাসিক ও গুনাহগার ব্যক্তির প্রতি খারাপ মনোভাব রাখা যাবে না, বরং তার জন্য আফসোস করতে হবে, তার গুনাহমুক্তির জন্য দু'আ করতে হবে। ভাবতে হবে, এ ব্যক্তি তো আমার আল্লাহ্‌র বান্দা। সুতরাং আল্লাহ্ যেন তাকে সঠিক পথে নিয়ে আসেন।

ক্ষমাপ্রাপ্তির এক চমৎকার ঘটনা

হাদীস শরীফে এসেছে, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, এক ব্যক্তিকে আল্লাহ্‌র দরবারে উপস্থিত করা হলো। 'উপস্থিত করা হলো' এর অর্থ বিচার দিবসে তাকে উপস্থিত করা হবে। অথবা বাস্তবেই হয়ত এ জাতীয় কোনো নমুনা আল্লাহ্ এ দুনিয়াতে পেশ করেছেন। যাক, ওই ব্যক্তি যখন আল্লাহ্‌র দরবারে উপস্থিত হলো, তখন আল্লাহ তাআলা ফেরেশতাদেরকে বললেন, এই ব্যক্তির আমলনামা দেখো

যে, সে কী আমল করেছিলো। ফেরেশতারা আল্লাহ্‌র নির্দেশে যখন তার আমলনামা দেখলো, তখন দেখতে পেলো, আমলনামা একেবারে শূন্য। নামায-রোযা কিছুই নেই। রাত-দিন শুধু দুনিয়ার ধান্ধায় কাটিয়েছে।

আল্লাহ তাআলা সব বান্দার যাবতীয় বিষয়-আশয় সম্পর্কে সম্যক অবগত। কিন্তু তিনি ফেরেশতাদেরকে এ বান্দার আমল অন্যদের সামনে প্রকাশ করার জন্য পুনরায় নির্দেশ দিলেন, ভালো করে দেখো, কোনো নেক আমল পাওয়া যায় কি-না। তখন ফেরেশতারা বললো, হ্যাঁ, হে পরওয়ারদেগার! একটি নেক আমল পাওয়া গেছে। তা হলো, এ লোকটি ব্যবসা-বাণিজ্য করতো নিজের গোলামদের মাধ্যমে। তার গোলামরা বেচাকেনা করে তার কাছে এসে যখন টাকা-পয়সা জমা দিতো, তখন সে গোলামদেরকে এ নির্দেশ দিয়ে রেখেছিলো যে, অভাবগ্রস্তদের সঙ্গে কোমল ব্যবহার করবে। প্রয়োজনে তাদেরকে বাকি দেবে, বাকি টাকা উসূল করার সময় তাদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করবে না। বরং প্রয়োজনে মাফ করে দেবে।

একথা শুনে আল্লাহ্ বলেন, আমার এই বান্দা তো আমার বান্দাদেরকে মাফ করে দিতো। সুতরাং আমিও তাকে মাফ করে দিলাম। অবশেষে ফেরেশতাদেরকে তিনি নির্দেশ দেবেন, যাও, আমার এ বান্দাকে জান্নাতে নিয়ে যাও।

এ হাদীস দ্বারা প্রতীয়মান হলো, মানুষের সঙ্গে নম্রতা দেখানো আল্লাহ্‌র নিকট অত্যন্ত পছন্দনীয় আমল।

এটা অনুগ্রহের ব্যাপার– আইনের ব্যাপার নয়

এ প্রসঙ্গে একটি কথা মনে রাখতে হবে। তাহলো, আলোচ্য হাদীসের বিষয়টি মূলত রহমতসংশ্লিষ্ট– আইন-সংশ্লিষ্ট নয়। সুতরাং নামায না পড়ে, রোযা না রেখে, যাকাত না দিয়ে, ফরয বিধানগুলো আদায় না করে এবং গুনাহসমূহ থেকে বেঁচে না থেকে শুধু অন্যকে মাফ করে দেয়ার আমল করে মুক্তির চিন্তা করা যাবে না। এ ধরনের চিন্তা হবে একেবারে অবান্তর। কারণ, আলোচ্য ঘটনাটি মূলত আল্লাহ্‌র দয়ার সঙ্গে সম্পর্কিত। আর আল্লাহ্‌র রহমতে কোনো আইন-কানুনের পাবন্দি থাকে না। তিনি যাকে চান দয়া করে মাফ করে দিতে পারেন। আল্লাহ্‌র আইন তো হলো, ফরয-বিধানগুলো মানতে হবে, গুনাহসমূহ থেকে অবশ্যই বেঁচে থাকতে হবে।

এক শিশুর বাদশাহকে গালি দেয়ার ঘটনা

হযরত আশরাফ আলী থানভী (রহ.) এ জাতীয় ঘটনার তাৎপর্য বোঝানোর উদ্দেশ্যে একটি ঘটনা বলেছেন। হায়দারাবাদের এক নবাবের ঘটনা। একবার তিনি মন্ত্রীর দাওয়াতে তার বাড়িতে গিয়েছিলেন। মন্ত্রী সাহেবের শিশু-সন্তান ছিলো। নবাব সাহেবের অভ্যাস ছিলো শিশুদেরকে চটিয়ে দেয়া। তাই তিনি শিশুটির কান মলে দিলেন। এতে শিশুটি ভীষণ রেগে গেলো এবং নবাব সাহেবকে গালি দিয়ে বসলো। ঘটনাটি মন্ত্রীর চোখের সামনেই ঘটলো। তাই তিনি খুব বিচলিত হলেন। মনে-মনে ভাবলেন, না-জানি আজ আমার ও সন্তানের কী অবস্থা হয়। নবাবের শাস্তির ভয়ে মন্ত্রী একেবারে ঘাবড়ে গেলেন। এ থেকে নিস্তার পাওয়ার জন্য এবং নবাবের প্রতি নিজের বিশ্বস্ততা প্রকাশের জন্য তিনি তরবারি বের করে বললেন, জাহাঁপনা! আমার এ সন্তান আপনার সঙ্গে মহা অন্যায় করেছে। আমি এখনি তার মাথা কেটে ফেলবো। নবাব সাহেব বললেন, না তুমি তরবারি নামাও। শিশুটিকে আমার দারুণ ভালো লেগেছে। আমার মনে হয়েছে, শিশুটি খুব দুরন্ত, মেধাবী ও আত্মমর্যাদাশীল হবে। এক কাজ করো, এর পড়ালেখার জন্য মাসিক বৃত্তির ব্যবস্থা করো। এই বলে তিনি শিশুটির জন্য মাসিক বৃত্তির ব্যবস্থা করে দিলেন। বৃত্তির নাম দেয়া হলো 'গালি দেয়ার বৃত্তি'।

ঘটনাটি উল্লেখ করার পর হযরত থানভী (রহ.) বললেন, নবাব সাহেবকে গালি দেয়ার কারণে শিশুটি বৃত্তি পেলো। এখন তুমিও যদি মনে করো যে, আমি নবাব সাহেবকে গালি দেবো আর বৃত্তি পাওয়ার সুযোগ নেবো। বলা বাহুল্য, তখন তোমার এ কাজটি হবে নির্বুদ্ধিতার কাজ। কারণ, এর ফলে তোমাকে শাস্তি ভোগ করতে হবে। হয়ত মাথাটাও খোয়াতে হবে। মূলত নবাব সাহেবের ঘটনাটি আইনের বন্ধন থেকে মুক্ত ছিলো। এ ছিলো তাঁর বদান্যতার বহিঃপ্রকাশ। আইন তো হলো, গালি দিলে শাস্তি ভোগ করা।

অনুরূপভাবে বিশেষ কোনো আমলের কারণে যদি আল্লাহ্ কাউকে মাফ করে দেবেন। এটা হবে আল্লাহ্র রহমতের বহিঃপ্রকাশ। وَسِعَتْ رَحْمَتِىْ كُلَّ شَىْءٍ আল্লাহ্র রহমত তো সীমাহীন। কিন্তু আইনের কথা হলো, গুনাহ করলে তিনি শাস্তি দেবেন। সুতরাং আইনের প্রতি যত্ন নিতে হবে। আল্লাহ্ যদি কারো উপর আইন প্রয়োগ করেন, তাহলে তা অন্যায় হবে না।

নেক কাজকে ছোট মনে করো না

আলোচ্য হাদীস থেকে এ শিক্ষা পাওয়া যায় যে, সব নেক কাজই মূল্যায়নযোগ্য। সুতরাং কোনো নেক কাজকে ছোট মনে করা যাবে না। কে জানে আল্লাহ্র কাছে কোন্ আমলটি ভালো লেগে যায়। তবে 'অমুক আমল আল্লাহ্র কাছে প্রিয়' 'অমুক আমলের কারণে আল্লাহ্ সব গুনাহ মাফ করে দেন' এ জাতীয় হাদীস দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ছোট বড় সব নেক কাজের প্রতি মানুষকে উৎসাহিত করা। এর কারণে শুধু ওই নেক আমলকে নাজাতের জন্য যথেষ্ট মনে করা যাবে না। এক হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, ওই ব্যক্তি ব্যর্থ, যে কামনা-বাসনার পেছনে লেগে থেকেছে। মনে যা এসেছে তা-ই করেছে। হালাল-হারামের বাছ-বিচার করেনি। জায়েয-নাজায়েয যাচাই করে দেখেনি। অথচ এ আশা করে রেখেছে যে, আল্লাহ্ তো ক্ষমাশীল ও দয়াবান। তিনি সব মাফ করে দেবেন।

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর অভ্যাস

এক হাদীসে এসেছে, একবার রাসূলুল্লাহ (সা.) বাজার থেকে একটি বস্তু কিনলেন। ওই যুগে মানুষ দিনার-দেরহাম মেপে দিতো। তাই রাসূলুল্লাহ (সা.) দিরহাম দ্বারা দাম পরিশোধ করার সময় বললেন, কিছুটা ঝোঁক দিয়ে মাপো। অর্থাৎ আমার জিম্মায় যে পরিমাণ দিরহাম পাওনা আছে, এ থেকে আরো বেশি দাও।

অপর হাদীসে এসেছে, তিনি বলেছেন– خِيَارُكُمْ اَحْسَنُكُمْ قَضَاءً তোমাদের মধ্যে ওই ব্যক্তি উত্তম, যে পরিশোধ করার সময় ভালোভাবে পরিশোধ করে। দেনা পরিশোধের সময় টালবাহানা না করা, যথাসময়ে দিয়ে দেয়া এবং পাওনা চেয়ে খুশিমনে অতিরিক্ত দেয়া– এ সবই ভালোভাবে পরিশোধ করার অন্তর্ভুক্ত।

ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর অসিয়ত

হযরত ইমাম আবু হানিফা (রহ.)। ফিকাহশাস্ত্রে তিনি আমাদের ইমাম। তাঁর ফিকহের আলোকেই আমরা যাবতীয় আমল করি। তিনি নিজের ছাত্রদের উদ্দেশ্য একটি অসিয়তনামা লিখেছিলেন। সেখানে লেখা ছিলো, 'কারো সঙ্গে যখন বেচা-কেনা করবে, তখন পরিশোধের সময়ে একটু বাড়িয়ে পরিশোধ করবে। কখনও কম দেবে না। মূলত এটা রাসূলুল্লাহ (সা.) এরই সুন্নাত। অথচ

আমরা বিশেষ কিছু সুন্নাতকে মুখস্থ করে নিয়েছি এবং শুধু ওগুলোকেই সুন্নাত মনে করি।

যে টাকা-পয়সা জমা করে রাখে তার জন্য বদদুআ

এক হাদীসে এসেছে, আল্লাহ্র এক ফেরেশতা সব সময় তাঁর দরবারে এই দু'আ করে যে,

اَللّٰهُمَّ اَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا وَاَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا —

হে আল্লাহ্! যে ব্যক্তি অর্থ-সম্পদ জমা করে রাখে অর্থাৎ সব সময় শুধু গুনতে থাকে যে, কত হলো আর কত হবে। অথচ খরচ করার সময় মনে হয় প্রাণটা বের হয়ে যাবে। হে আল্লাহ্! তার সম্পদ ধ্বংস করে দিন।

এ দু'আর ফলে ওই ব্যক্তির সম্পদে কখনও বরকত দেখা দেয় না। কখনও চুরি হয়, ডাকাতি হয় বা অন্য কোনো সমস্যায় পড়ে যায়। অনেক সময় হয়ত গণনায় টাকা-পয়সা অনেক দেখা যায়, কিন্তু হঠাৎ এমন কোনো বিপদ সামনে চলে আসে, যার ফলে সব সঞ্চয় শেষ হয়ে যায়। যেমন হয়ত বাসার কেউ এমন অসুস্থ হয়ে পড়ে যে, ডাক্তার-হাসপাতালের চক্করে সব শেষ হয়ে যায়।

ব্যয়কারীর জন্য দু'আ

পক্ষান্তরে ওই ফেরেশতা ব্যয়কারীর জন্য দু'আ করতে থাকে যে, وَاَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا হে আল্লাহ্! যে ব্যক্তি আল্লাহ্র রাস্তায় খরচ করে, মানুষের সঙ্গে সদাচরণ করে, কাউকে টাকা-পয়সা দান করে, কাউকে টাকা-পয়সা মাফ করে দেয়, এমন ব্যক্তিকে দুনিয়াতেই প্রতিদান দিন।

মোটকথা, আল্লাহ্র রাস্তায় ব্যয় করলে, কাউকে মাফ করে দিলে অথবা কারো কাছ থেকে পাওনা টাকা কম নিলে মূলত সম্পদ কমে না, বরং বাড়ে। আজ পর্যন্ত এমন একজন লোককে পাবেন না যে, ব্যয় করার ফলে নিঃস্ব ও অসহায় হয়ে গেছে। বরং সঠিক পথে ব্যয় করার কারণে সম্পদ কমে না, বরং বাড়ে এবং বরকত আসে।

অপরের দোষ গোপন করা

আলোচ্য হাদীসের তৃতীয় বাক্যটি ছিলো–

وَمَنْ سَتَرَمُسْلِمًا سَتَرَهُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ —

যে ব্যক্তি কোনো মুসলমানের দোষ গোপন রাখে, আল্লাহ তাআলা কেয়ামতের দিন তার দোষ গোপন রাখে।

অপরের দোষচর্চা নয়, বরং দোষ গোপন রাখতে হবে। কারো মাঝে কোনো দোষ দেখলে তা লুকিয়ে রাখার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে এবং তার জন্য দু'আ করতে হবে যে, হে আল্লাহ্! লোকটি গুনাহর মাঝে লিপ্ত। আপনি তাকে এ থেকে ফিরিয়ে আনুন এবং তাকে মাফ করে দিন। অথচ বর্তমানে দেখা যায়, মানুষ কারো দোষ দেখলে তা অন্যের কাছে বলার আগ পর্যন্ত স্বস্তি পায় না। এটা গুনাহ। অপরের দোষচর্চা করা কবীরা গুনাহ। অবশ্য কেউ যদি কারো বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে যেমন কাউকে যদি সে হত্যার পরিকল্পনা করে, তাহলে সম্ভাব্য ক্ষতিরোধে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে তা অবহিত করা যাবে। তখন এটা গুনাহ হবে না।

অপরের গুনাহ্র ব্যাপারে তিরস্কার করা

এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন–

مَنْ عَيَّرَاَخَاهُ بِذَنْبٍ قَدْتَابَ مِنْهُ لَمْ يَمُتْ حَتّٰى يَعْمَلَهُ —

(ترمذی ، کتاب صفة القيامة ، رقم الباب ٥٤)

যে ব্যক্তি নিজ ভাইয়ের এমন কোনো গুনাহ সম্পর্কে তিরস্কার করে, যে গুনাহ থেকে সে তাওবা করেছে, তাহলে আল্লাহ তাআলা তাকে সে গুনাহতে লিপ্ত করা ছাড়া মৃত্যু দেবেন না। যেমন এক ব্যক্তি একটি গুনাহ করলো এবং পরবর্তীতে তাওবা করে নিলো, অথচ তুমি সুযোগ পেয়ে তাকে বলে বসলে যে, ওহো তুমি তো সেই– যে অমুক গুনাহটি করেছো অথবা তোমাকে তো আমি চিনি যে, তুমি কেমন লোক! আল্লাহ্ বলেন, তোমার এ ধরনের তিরস্কার আমার পছন্দ নয়। এর ফলে তোমাকেও আমি এ গুনাহতে লিপ্ত করবো। এর আগে তোমার মৃত্যু হবে না। সে তো আমার কাছে তাওবা করেছে। যার ফলে আমি গুনাহটি তার আমলনামা থেকে মুছে দিয়েছি। সুতরাং তুমি তাকে তিরস্কার করার কে?

অতএব কারো গুনাহ প্রকাশ করা যাবে না। এ নিয়ে তাকে তিরস্কারও করা যাবে না। আল্লাহ তাআলা তো আমাদেরকে দারোগা বানিয়ে পাঠাননি যে, আমরা অপরের দোষ খুঁজে বেড়াবো। অপরের দোষ খোঁজা এবং এ নিয়ে তাকে হেয় প্রতিপন্ন করা কবীরা গুনাহ।

নিজের ফিকির করুন

নিজের ফিকির করুন। নিজের দোষ দেখুন। নিজের আঁচলে চোখ বুলিয়ে দেখুন। আল্লাহ্ যাকে নিজের দোষের ফিকির করার তাওফীক দান করে, সে অন্যের দোষ দেখতে পায় না। অপরের দোষ সে-ই বেশি দেখে, যে নিজেই দোষে জর্জরিত। নিজেকে শুদ্ধ করার ফিকির যার মাঝে নেই, সে-ই অপরের দোষ খুঁজে বেড়ায়। যে ব্যক্তি নিজে অসুস্থ সে অপরের সর্দি-কাশি দেখার সুযোগ পায় কীভাবে? অসুস্থ ব্যক্তি অন্যের অসুস্থতা খুঁজে বেড়ানো নির্বুদ্ধিতা বৈ কিছু নয়। হাদীস শরীফে এ ধরনের কাজ থেকে নিষেধ করা হয়েছে। বলা হয়েছে, এটা মহা অন্যায়।

ইল্‌মে দ্বীন শেখার ফযীলত

আলোচ্য হাদীসের চতুর্থ বাক্যটি হলো–

وَمَنْ سَلَكَ طَرِيْقًا يَلْتَمِسُ فِيْهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللّٰهُ لَهٗ بِهٖ طَرِيْقًا اِلَى الْجَنَّةِ –

যে ব্যক্তি দ্বীনি-শিক্ষা শেখার উদ্দেশ্যে পথ চললো, আল্লাহ তাআলা তার জন্য জান্নাতের পথ সুগম করে দেবেন।

আলোচ্য হাদীসের এ অংশে আমাদের জন্য রয়েছে মহা সুসংবাদ। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে এর উপর আমল করার তাওফীক দান করুন। যেমন কোনো ব্যক্তির সামনে কোনো মাসআলা উপস্থিত হলো, যার কারণে সে মুফতী সাহেবের কাছে যাওয়ার প্রয়োজন হলো এবং এ উদ্দেশ্যে সে বাসা থেকে বের হলো, তাহলে সেও এ হাদীসের সুসংবাদ পাওয়ার যোগ্য হবে।

ইল্‌ম আমাদের কাছে এমনিতেই আসেনি

ইল্‌ম অর্জনের জন্য আমাদের আসলাফ-আকাবির যে মেহনত করেছেন, তার কল্পনাও আমরা করতে পারি না। আজ আমরা বসে কিতাব খুলে হাদীস পড়ে নিচ্ছি এবং এ থেকে মানুষকে ওয়াজ শোনাচ্ছি। এটা আমাদের বড়দের মেহনতের ফসল। তাঁরা ইল্‌ম অর্জনের জন্য ক্ষুধার জ্বালা সহ্য করেছেন, বস্ত্রের অভাব মাথা পেতে নিয়েছেন, ঘাম ঝরিয়েছেন, কুরবানি পেশ করেছেন এবং আমাদের পর্যন্ত তা পৌঁছিয়ে দিয়েছেন। এরূপ কষ্ট-ক্লেশ যদি তাঁরা না করতেন, তাহলে হাদীসের এই বিশাল সম্পদ থেকে আমরা বঞ্চিতই থাকতাম।

একটি হাদীসের জন্য দীর্ঘ সফর

বুখারী শরীফে এসেছে, সাহাবী হযরত জাবির (রা.) রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর অত্যন্ত প্রিয় আনসারী সাহাবী। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ইন্তেকালের পরের ঘটনা। একদিন তিনি বসা ছিলেন। ইত্যবসরে জানতে পারলেন যে, তাহাজ্জুদ-সংক্রান্ত একটি হাদীস আছে, যেটি তিনি জানেন না, হাদীসটি যে সাহাবী জানেন, তিনি এখন দামেশকে থাকেন।

তিনি ভাবলেন, হাদীসটি আমার কাছে মধ্যস্থতাসহ থাকবে কেন? বরং যিনি সরাসরি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর যবান মুবারক থেকে হাদীসটি শুনেছেন, আমিও তার কাছ থেকেই গ্রহণ করবো। জাবির (রা.) তখন ছিলেন মদীনায়। মদীনা থেকে সিরিয়ার দামেশক শহরের দূরত্ব প্রায় পনেরশ' কিলোমিটার। পথও ছিলো অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ। হযরত জাবির (রা.) এ দীর্ঘ পথ উটের পিঠে করে পাড়ি দিয়ে পৌঁছলেন দামেশকে। সেখানে গিয়ে ওই সাহাবীর বাড়ি খুঁজে বের করলেন। ঘরের দরজায় গিয়ে কড়া নাড়লেন। ওই সাহাবী দরজা খুললেন এবং জিজ্ঞেস করলেন, এতদূর কেন এসেছেন?

জাবির (রা.) উত্তর দিলেন, আমি শুনেছি তাহাজ্জুদের ফযীলত সংক্রান্ত একটি হাদীস আপনি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর মুখ থেকে শুনেছেন। ওই হাদীসটি আমি আপনার কাছ থেকে সরাসরি গ্রহণ করতে চাই। ওই সাহাবী বললেন, আপনি কি মদীনা থেকে শুধু এ উদ্দেশ্যেই এসেছেন? জাবির (রা.) উত্তর দিলেন, হ্যাঁ, শুধু এ উদ্দেশ্যেই এসেছি। সাহাবী বললেন, ঠিক আছে, তাহাজ্জুদের ফযীলত সংক্রান্ত হাদীস পরে শুনুন, এর আগে আরেকটি হাদীস শুনুন। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি দ্বীনী শিক্ষা গ্রহণের উদ্দেশ্যে পথ পাড়ি দিলো, আল্লাহ তাআলা তার জন্য জান্নাতের পথ সুগম করে দেবেন।

তারপর তিনি জাবির (র.)-কে তাহাজ্জুদের ফযীলত সংক্রান্ত হাদীস শোনালেন এবং বললেন, এবার ভেতরে আসুন, একটু বসুন, আরাম করুন। আপনার জন্য আমি খাবারের ব্যবস্থা করছি। জাবির (রা.) উত্তর দিলেন, না, আমি খাবো না। কারণ, আমি চাই আমার এ দীর্ঘ সফরটি শুধু রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর হাদীস শোনার জন্য হোক। এ সফরের মাঝে যেন অন্য কোনো বিষয়ের ছোঁয়া না লাগে। তাই আমি অন্য কোনো কাজ করতে চাই না। আমার কাঙ্ক্ষিত হাদীস আমি পেয়ে গিয়েছি। কাজেই আমার ভ্রমণের উদ্দেশ্য সফল হয়েছে। এবার আমি মদীনায় ফিরে যাচ্ছি। আসসালামু আলাইকুম। বলেই তিনি পুনরায় মদীনার পথে রওনা হয়ে গেলেন।

দেখুন, একটিমাত্র হাদীসের জন্য সাহাবায়ে কেরাম কত দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়েছেন। এ শুধু একটি ঘটনাই নয়, বরং সাহাবায়ে কেরাম, তাবিঈন, তাবে-তাবিঈনের এরূপ শত ঘটনা কিতাবের পাতায় ভরপুর। তাঁদের মেহনতের ফলেই আজ আমরা ইল্‌মে দ্বীনের এ সম্পদ পেয়েছি। এ সম্পদের হেফাযতের জিম্মাদারী যদি আমাদেরকে দেয়া হতো, তাহলে এ সম্পদ আমরা না জানি কী 'অসহায়' অবস্থায় ফেলে দিতাম। আল্লাহ্‌র অনুগ্রহে এসব মনীষী এ দ্বীনকে হেফাযত করেছেন। দ্বীনের প্রতিটি কথা অনাগত প্রজন্মের জন্য রেখে গিয়েছেন। প্রতিটি যুগের যে কোনো মানুষ এ দ্বীন থেকে উপকৃত হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি করে গিয়েছেন।

আল্লাহ্‌র ঘরে জমায়েত হওয়ার ফযীলত

আলোচ্য হাদীসে এর পরবর্তী বাক্যে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, যে লোকগুলো আল্লাহ্‌র ঘর মসজিদে কুরআন তেলাওয়াতের উদ্দেশ্য বা কুরআনের দরস-তাদরীসের উদ্দেশ্যে অথবা দ্বীনী কথাবার্তা শোনা ও বলার উদ্দেশ্যে একত্র হয়, আল্লাহ্ তাদের উপর প্রশান্তি নাযিল করেন, তাঁর রহমত এদেরকে ঢেকে নেয় এবং ফেরেশতারা চারিদিক থেকে ওই মজলিসকে বেষ্টন করে রাখে।

ফেরেশতারা বেষ্টন করে রাখে– এর অর্থ হলো, ফেরেশতারা এসব বান্দার জন্য দুআ, ইস্তেগফার করতে থাকে এবং আল্লাহ্‌র কাছে এদের জন্য রহমতের প্রার্থনা করতে থাকে।

আল্লাহ্‌র যিকর করো, আল্লাহ্ তোমাদের আলোচনা করবেন

আলোচ্য হাদীসে এরপর বলা হয়েছে–

وَذَكَرَهُمْ فِيْمَنْ عِنْدَهُ -

আল্লাহ তাআলা নিজের মাহফিলে উক্ত মজলিসের লোকদের সম্পর্কে আলোচনা করেন যে, এরা আমার বান্দা, এরা নিজেদের সব কাজ ছেড়ে আমারই জন্য, আমার আলোচনা করার জন্য এবং আমার দ্বীনের কথাবার্তা শোনার জন্য একত্র হয়েছে। আল্লাহ্ নিজের মাহফিলে অর্থাৎ ফেরেশতাদের সঙ্গে এদের আলোচনা করাটা চাট্টিখানি কথা নয়।

আল্লাহ্‌র যিকর করা তো আমাদের কর্তব্য। এই মর্মে আল্লাহ্ আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন فَاذْكُرُوْنِىْ 'তোমরা আমার যিকর বা আলোচনা করো। সঙ্গে

সঙ্গে তিনি এর প্রতিদানও বলে দিয়েছেন যে, اَذْكُرْكُمْ তাহলে আমি তোমাদের আলোচনা করবো? অথচ আমরা তাঁর যিকর কতটুকুইবা করতে পারি। আমাদের যিকিরের কারণে তাঁর বড়ত্ব ও মহত্বের মধ্যে সামান্য সংযোজিতও হবে না। বরং গোটা দুনিয়া যদি তাঁর যিকির না করে, তবুও তাঁর বড়ত্বের মাঝে একতিলও কমতি আসবে না। আমরা তাঁর বড়ত্বের সামনে সামান্য 'খড়কুটো'র মতো। অথচ এ ক্ষুদ্রগোষ্ঠীর আলোচনা তিনি করেন, এটা তো অনেক বড় কথা!

উবাই ইবনে কা'ব (রা) এর কুরআন তেলাওয়াত

হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রা.) একজন প্রসিদ্ধ সাহাবী। প্রত্যেক সাহাবীর স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য ছিল। এই সাহাবীর বৈশিষ্ট্য ছিলো তাঁর কুরআন তেলাওয়াত ছিলো চমৎকার। তাই রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁর সম্পর্কে বলেছিলেন– اَقْرَأُهُمْ اُبَىُّ بْنُ كَعْبٍ 'সকল সাহাবার মধ্যে উবাই ইবনে কাবের তেলাওয়াত সবচে বেশি সুন্দর।'

একদিনের ঘটনা, তিনি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর দরবারে বসে আছেন। এমন সময় রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, আল্লাহ তাআলা আমার কাছে জিব্রাঈল (আ.) এর মাধ্যমে এই মর্মে সংবাদ পাঠিয়েছেন যে, আপনি উবাইকে তেলাওয়াত শোনানোর জন্য বলুন। সঙ্গে-সঙ্গে উবাই ইবনে কা'ব জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহ্ কি আমার নাম নিয়েছেন? তিনি কি আমার নাম ধরে বলেছেন যে, উবাই ইবনে কা'বকে বলুন? ! রাসূলুল্লাহ (সা.) উত্তর দিলেন, 'হ্যাঁ আল্লাহ্ তোমার নাম নিয়েছেন।' এ কথা শুনে উবাই ইবনে কা'ব (রা.) স্থির থাকতে পারলেন না। তিনি কাঁদতে-কাঁদতে বেহুঁশ হয়ে গেলেন। বললেন, আল্লাহ্ আমার নাম নিয়েছেন– এত বড় যোগ্যতা আমার কোথায়?

আরেকটি সুসংবাদ

হাদীসে কুদসীতে এসেছে– আল্লাহ্‌র কথা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ভাষায় প্রকাশ পেলে তাকে 'হাদীসে কুদসী' বলে। আল্লাহ তাআলা বলেছেন–

مَنْ ذَكَرَنِىْ فِىْ نَفْسِهٖ ذَكَرْتُهٗ فِىْ نَفْسِىْ وَمَنْ ذَكَرَنِىْ فِىْ مَلَا ذَكَرْتُهٗ فِىْ مَلَاٍ خَيْرٍ مِنْهُ -

যে ব্যক্তি আমাকে মনে-মনে স্মরণ করে– আমিও তাকে মনে-মনে স্মরণ করি। যে ব্যক্তি আমার আলোচনা মজলিসের মাঝে করে, আমি তার আলোচনা এর চেয়ে উত্তম মজলিসে করি। অর্থাৎ– ফেরেশতাদের মজলিসে তার কথা বলি।

এ হলো যিকিরের ফযীলত। যারা দ্বীনের দরস-তাদরীসে অথবা কথাবার্তায় লিপ্ত, তারাও এ হাদীসের ফযীলত পাবে। আল্লাহ তাআলা দয়া করে আমাদেরকে এদের অন্তর্ভুক্ত করুন। আমীন।

বংশীয় আভিজাত্য মুক্তির জন্য যথেষ্ট নয়

আলোচ্য হাদীসের সর্বশেষ বাক্যটি ছিলো–

مَنْ بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ –

এ বাক্যটিও 'জাওয়ামিউল কালিম' তথা সংক্ষিপ্ত অথচ ব্যাপক তাৎপর্যপূর্ণ হাদীসের অন্তর্ভুক্ত। বাক্যটির মর্মার্থ হলো, যে ব্যক্তি নিজের আমলের কারণে পেছনে রয়ে গেছে, তাকে শুধু তার বংশীয় কৌলিন্য উন্নতির পথে আনতে পারবে না। যেমন– একজনের আমল ভালো নয়, অথচ বংশীয় মর্যাদা তার অনেক, তাহলে সে পেছনেই থেকে যাবে। জান্নাতে সে পৌঁছুতে পারবে না। অথচ অন্যরা আমলের কারণে ধীরে-ধীরে জান্নাতের যোগ্য হয়ে যাবে। কবির ভাষায়–

یاران تیز گام نے منزل کو جالیا ٥ ہم محو نالہ جرس کارواں رہے

মানুষ সামনে চলে গেছে। আর এ ব্যক্তি বদআমলের কারণে পেছনে পড়ে গেছে। নিজেকে শুদ্ধ করেনি। সুতরাং সে অমুক বংশের লোক, অমুক আলেমের ছেলে পীরজাদা বা সাহেবজাদা– এসব আভিজাত্যের কারণে সে অগ্রসর হতে পারবে না, বরং পেছনেই পড়ে থাকবে। যদি বংশীয় পরিচিতি কাজে আসতো, তবে হযরত নূহ (আ.)-এর 'সাহেবজাদা' জাহান্নামে যেতো না। হযরত নূহ (আ.)-এর মতো মহান নবীর সন্তানের ঠিকানা যদি 'জাহান্নাম' হয়, তাহলে অন্যান্যদের তো কোনো খবরই থাকার কথা নয়। উপরন্তু তিনি নিজ সন্তানের জন্য মাগফেরাতের দু'আ করেছিলেন। কিন্তু আল্লাহ্ সাফ জানিয়ে দিয়েছেন– اِنَّهٗ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ তার আমল ভালো নয়। সুতরাং তার ব্যাপারে দু'আ কবুল করা হবে না।

প্রতীয়মান হলো, আমলই হলো আসল। তবে হ্যাঁ, আমলের পাশাপাশি যদি আল্লাহ্ওয়ালাদের সঙ্গেও সম্পর্ক রাখা হয়, তাহলে ফায়দা পাওয়া যায়। কিন্তু আমল লাগবেই। আমলের ফিকির ছাড়া কোনো উপায় নেই। গাফলতের চাদর মুড়ে বসে থাকার কোনো সুযোগ নেই। আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

সারকথা

আজকের বয়ানের সারকথা হলো, আল্লাহ্র প্রতি ভালোবাসর দাবি এবং পূর্বশর্ত যে, আল্লাহ্র সৃষ্টিকে ভালোবাসতে হবে। তাঁর সৃষ্টির প্রতি দরদ, দয়া, মায়া ও কোমলতা দেখাতে হবে। যতক্ষণ পর্যন্ত এগুলো করা না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত ভালোবাসার দাবি মিথ্যা।

আল্লাহ তাআলা আমাদের অন্তরে তাঁর প্রতি ও তাঁর সৃষ্টির প্রতি অগাধ ভালোবাসা সৃষ্টি করে দিন। আমীন।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ -

আলেম-ওলামাকে অবজ্ঞা করো না

"ছাগল-ভেড়াকে যখন দলচ্যুত করা হলো, তখনই হিংস্রপ্রাণীর জিভে পানি এসে গেলো। সে যখন-তখন, যেখানে-সেখানে ছাগল-ভেড়ার উপর আক্রমণ করার স্বাধীনতা পেয়ে গেলো। এ জন্যই বলি, অমুসলিমদের কাজই হলো, মুসলিম জনসাধারণকে ওলামায়ে কেরাম থেকে বিচ্যুৎ করে দেয়া। এজন্যই ওলামায়ে কেরামের বিরুদ্ধে আজ এত অপপ্রচার। কিন্তু বেশি দুঃখ লাগে তখন, যখন দেখি, কিছু দ্বীনদার লোকও অমুসলিমদের সুরে কথা বলে। তারাও বলে বেড়ায়, বর্তমানের ওলামাদের অবস্থা খারাপ। ওলামায়ে কেরামের এ অবস্থা, ওই অবস্থা। অথচ এসব কথা বলে ক্ষতি ছাড়া লাভ নেই।

মুসলমান জনসাধারণ যদি ওলামায়ে কেরামের উপর থেকে আস্থা হারিয়ে ফেলে, তাহলে তাদেরকে ইসলামের বিধি-বিধান কে শেখাবে? তখন তো শয়তানই হবে তাদের শিক্ষক। হালাল-হারামের ব্যাখ্যা তখন শয়তানের মুখ থেকেই শুনতে হবে!"

আলেম-ওলামাকে অবজ্ঞা করো না

اَلْحَمْدُ لله نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِه وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْه، وَنَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّاتِ اَعْمَالِنَا، مَنْ يَّهْدِه اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِىَ لَهُ، وَاَشْهَدُ اَنْ لَّآ إِلٰهَ اِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لَآ شَرِيْكَ لَهُ، وَاَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَسَنَدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ .... صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْه وَعَلٰى آله وَأَصْحَابِه وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا كَثِيْرًا — اَمَّا بَعْدُ :

عَنْ عَمْرِوبْنِ عَوْفِ الْمُزَنِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ : قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اِتَّقُوْازَلَّةَ الْعَالِمِ وَلَاتَقْطَعُوْهُ وَانْتَظِرُوْا فَيْئَتَهُ —

(مسند الفردوس للديلمى ، جلد ١، صفحه ٩٥، كنـــزالعمال حديث نمبر ٢٨٦٨٢)

হাম্‌দ ও সালাতের পর!

সনদের বিবেচনায় হাদীসটি যদিও দুর্বল, কিন্তু অর্থের বিবেচনায় এটি অত্যন্ত জোরালো বিধায় গোটা মুসলিম উম্মাহর কাছে এটি গ্রহণযোগ্য একটি হাদীস। হাদীসটিতে রাসূলুল্লাহ (সা.) অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও সূক্ষ্ম একটি বিষয়ের আলোচনা করেছেন। হাদীসটির অর্থ এই-

রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন, ওলামায়ে কেরামের দোষ-ত্রুটি দেখা থেকে বেঁচে থাকো। তাদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করো না, বিচ্যুতি থেকে যেন তারা ফিরে আসে, এ অপেক্ষা করো।

এখানে 'আলেম' দ্বারা উদ্দেশ্য হল, আল্লাহ তাআলা যাকে দ্বীনের ইল্‌ম, কুরআনের ইল্‌ম, হাদীসের ইল্‌ম ও ফিকহের ইল্‌ম দান করেছেন। আপনি যদি একটি নিশ্চিত গুনাহের মাঝে এমন একজন আলেমকে লিপ্ত থাকতে দেখেন, তখন এটা মোটেও কল্পনা করবেন না যে, এত বড় আলেম কাজটি করেছেন; আমিও করি। বরং তখন এ আলেমের কৃত গুনাহটিতে জড়িয়ে পড়ার সুযোগ আপনার নেই। গুনাহটি থেকে দূরে সরে থাকাই আপনার কর্তব্য।

গুনাহর কাজে ওলামায়ে কেরামের অনুসরণ করা যাবে না

আলোচ্য হাদীসের প্রথম বাক্যে তাদেরকে সতর্ক করেছেন, যাদেরকে গুনাহ থেকে নিষেধ করা হলে বলে উঠে, অমুক আলেমও তো এটা করে, অমুক আলেম অমুক সময় এ কাজ করেছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) এ জাতীয় যুক্তির মূলে কুঠারাঘাত করেছেন এবং বলেছেন, তোমরা গুনাহলিপ্ত আলেমের কৃত গুনাহর অনুসরণ করতে পারবে না। বরং তোমরা আলেমদের শুধু ভালো কাজগুলোর অনুসরণ করবে। একটু ভেবে দেখ, যদি এ আলেম দোযখের পথে পা বাড়ায়, তুমিও কি তার পেছনে-পেছনে যাবে? যদি তাকে কৃত গুনাহর কারণে শাস্তি দেয়া হয়, তুমিও কি শাস্তি ভোগ করবে? মোটেও নয়। মূলত কেউ একে সমর্থন করবে না। সুতরাং কী কারণে গুনাহর কাজে তাঁর অনুসরণ করছো?

আলেমের কাজ গ্রহণযোগ্য হওয়া জরুরি নয়

ওলামায়ে কেরাম বলেছেন, যে আলেম বাস্তবেই আলেম, তার ফতওয়া ও মাসআলা গ্রহণযোগ্য। তার আমল গ্রহণযোগ্য হওয়া জরুরি নয়। তিনি ভুল কাজ করে থাকলে তাকে জিজ্ঞেস করে দেখুন যে, কাজটা কি জায়েয? দেখবেন, তিনি অবশ্যই সঠিক উত্তর দেবেন। বললেন, কাজটি নাজায়েয। সুতরাং অনুসরণ করতে হবে আলেমের ফতওয়ার। তাঁর সব কাজের অনুসরণ করা যাবে না। এজন্যই রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, ওলামায়ে কেরামের ত্রুটি-বিচ্যুতি ধরো না। অর্থাৎ তাঁদের অন্যায় কাজের অনুসরণ করো না।

আলেম সম্পর্কে খারাপ ধারণা করো না

কেউ-কেউ আরেকটি ভুল করে থাকে। তা হলো, কোনো আলেমকে ভুলে লিপ্ত দেখলে তাঁর সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে বসে। তাঁর উপর খারাপ ধারণা করে তার বিরুদ্ধে সমালোচনা করতে থাকে। পর্যায়ক্রমে গোটা আলেম-সমাজের সমালোচনায় মেতে ওঠে। নাক ছিটকিয়ে বলতে থাকে, বর্তমানের আলেম সম্প্রদায় এমনই হয়ে থাকে। আলোচ্য হাদীসের দ্বিতীয় অংশে রাসূলুল্লাহ (সা.) এ থেকেও বারণ করেছেন। তাঁর ভাষায়– কোনো আলেমকে অন্যায় কাজে লিপ্ত দেখলেও তাঁর সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করো না।

ওলামায়ে কেরামও মানুষ

ওলামায়ে কেরাম তোমাদের মতই রক্ত-গোশতে গড়া মানুষ। যে গোশত-হাড় তোমাদের আছে, তাদেরও তা আছে। তাঁরা আকাশ থেকে নেমে আসেননি। তাঁরা ফেরেশতাও নন। যে আত্মা-রিপু তোমাদের আছে, তাঁদেরও তা আছে। তোমাদের পেছনে শয়তান লেগে আছে, তাঁদের পেছনেও আছে। তোমরা যেমনিভাবে গুনাহমুক্ত নও, তাঁরাও তেমনিভাবে গুনাহ থেকে পবিত্র নন। তাঁরা নবী নন, নিষ্পাপ ফেরেশতাও নন। তাঁরা তো এ পৃথিবীরই মানুষ। তাঁদের সময়ও তোমাদের সময়ের মতোই অতিবাহিত হয়। কাজেই তাদেরও ভুল-ত্রুটি হতে পারে। তাঁদের কোনো গুনাহর কারণে তাঁরা নষ্ট হয়ে যায়নি। এজন্য তাঁদের সম্পর্কে বিরূপ ধারণা করা যাবে না।

তাঁরা গুনাহ করে না, করতে পারে না– এমন ধারণার কোনো ভিত্তি নেই। রাসূলুল্লাহ (সা.) এজন্যই বলেছেন, আলেম সম্পর্কে খারাপ ধারণা করো না, ভুল-চুক হয়ে গেলে তাঁর সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করো না, বরং অপেক্ষা করো, যেন তিনি সুপথে ফিরে আসেন। কারণ, তাঁর কাছে সঠিক ইল্‌ম আছে। আশা করা যায়, তিনি ভুলের উপর থাকবেন না।

ওলামায়ে কেরামের জন্য দু'আ করো

কোনো আলেমকে ভুলের উপর দেখলে তাঁর জন্য দু'আ কর যে, হে আল্লাহ্! অমুক লোক আপনার দ্বীনের ধারক-বাহক, তাঁর উসিলায় আমরা আপনার দ্বীন সম্পর্কে অনেক কিছু জানতে পারি, এখন তিনি অমুক ভুলের মাঝে আছেন। হে আল্লাহ্! আপনি তাঁর উপর রহম করুন। তাঁকে এ ভুল থেকে ফিরিয়ে আনুন। আমীন।

এরূপ প্রার্থনা করলে তোমার দু'টি লাভ হবে। এক. দুআ করার সাওয়াব পাবে। দুই. অপর মুসলমানের কল্যাণ কামনা করার সাওয়াব পাবে। তোমার দু'আ কবুল হলে তা হবে ওই আলেমের সংশোধনের কারণ। ফলে তিনি যত নেক কাজ করবেন, তোমার আমলনামায়ও সেগুলোর সাওয়াব লেখা হয়ে যাবে।

আমলবিহীন আলেমও সম্মানের পাত্র

হাকীমুল উম্মত হযরত আশরাফ আলী থানভী (রহ.) বলেন, ইল্‌ম অনুযায়ী আমল করা ওলামায়ে কেরামের কর্তব্য। কিন্তু কোনো আলেম যদি ইল্‌ম

অনুযায়ী আমল না করেন, তবুও তিনি সাধারণ মানুষের কাছে সম্মানের পাত্র। কারণ, আল্লাহ তাআলা তাঁকে ইল্‌ম দান করেছেন। এ হিসাবে তাঁর একটা মর্যাদা আছে। যেমন আল্লাহ তাআলা পিতা-মাতার ক্ষেত্রে বলেছেন–

وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَن تُشْرِكَ بِيْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوْفًا –

'পিতা-মাতা যদি মুশরিক হয়, তবে শিরক-বিষয়ে তাদের নির্দেশ মানবে না। কিন্তু দুনিয়াতে তাদের সঙ্গে সুন্দর আচরণ করবে।' –(সূরা লুকমান : ১৫)

কেননা, পিতৃত্ব ও মাতৃত্বের সম্মান অবশ্যই বজায় রাখতে হবে। সুতরাং তোমাদের পক্ষ থেকে তাদেরকে অবজ্ঞা করার কোনোই অবকাশ নেই। তেমনি একজন আলেমের ইল্‌মের কারণে তাঁর সম্মানের প্রতি অবশ্যই লক্ষ্য রাখতে হবে। তাঁর মাঝে ত্রুটি থাকলে হেয় করা যাবে না, বরং তখন তাঁর জন্য দু'আ করতে হবে।

হযরত আশরাফ আলী থানভী (রহ.) আলেমগণের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেছেন, স্বত্ত্বাগতভাবে ইল্‌ম কোনো বস্তু নয় বা কোনো কাজে আসে না– যতক্ষণ না তার সঙ্গে আমল থাকে। পাশাপাশি তিনি একথাও বলেছেন, আমার অভ্যাস হলো, যখনই আমার নিকট কোনো আলেম আসেন, যদিও তাঁর সম্পর্কে আমি জানি যে, তিনি অমুক-অমুক খারাপ কাজে অভ্যস্ত, তবুও যেহেতু তাঁর কাছে ইল্‌ম আছে, তাই তাঁকে আমি সম্মান করি।

ওলামায়ে কেরামের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তোলো

'মোল্লা-মাওলানাদের অবস্থা অশোচনীয়।' 'তাদের অবস্থা অত্যন্ত করুণ।' এ জাতীয় অপপ্রচার বর্তমান সমাজের ফ্যাশন হয়ে দাঁড়িয়েছে। এসব অপপ্রচার বিজাতিদের সৃষ্টি। কারণ, বিজাতিরা ভালো করেই জানে, ওলামায়ে কেরামকে অপাংক্তেয় করতে না পারলে মুসলিম জাতিকে বিপথগামী করা যাবে না। ওলামায়ে কেরামের সঙ্গে সাধারণ মুসলমানের যে ঘনিষ্ঠতা আছে, তার মাঝে ফাটল ধরাতে পারলেই পূরণ হবে আমাদের রঙিন স্বপ্ন। তখনই সম্ভব হবে এজাতিকে পশুর পালের মত যেদিকে ইচ্ছা সেদিকে ঘুরানোর। এ জাতি তখন আমাদের করুণার পাত্র হয়ে বেঁচে থাকবে।

এ প্রসঙ্গে আব্বাজান মুফতী শফী (রহ.) বলতেন, ছাগল-ভেড়াকে যখন তাদের দলচ্যুত করে দিলো, তখনই হিংস্রপ্রাণীদের জিভে পানি এসে গেলো।

তারা যখন-তখন, যেখানে-সেখানে ছাগল-ভেড়ার উপর আক্রমণ করার স্বাধীনতা পেয়ে গেল।

এজন্যই বলি, বিজাতীয়দের কাজই হলো, ওলামায়ে কেরামকে হেয়-প্রতিপন্ন করে জাতির সামনে তুলে ধরা। কিন্তু দুঃখ লাগে তখন, যখন দেখি, দ্বীনদার লোকেরাও বিজাতীয়দের প্রোপাগান্ডার সুরে কথা বলে। তারাও বলে বেড়ায়, ওলামায়ে কেরামের এই অবস্থা, ওই অবস্থা। অথচ এসব কথা বললে লাভ নেই ক্ষতি ছাড়া। মুসলিম উম্মাহ যদি ওলামায়ে কেরামের উপর থেকে আস্থা হারিয়ে ফেলে, তাহলে শরীয়তের বিধি-বিধান তাদেরকে শেখাবে কে? তখন তো শয়তানই হবে তাদের শিক্ষক। হালাল-হারামের বর্ণনা তখন শয়তানের মুখ থেকে শুনতে হবে। এর মাধ্যমে উম্মাহর পথচ্যুতির ফাঁকফোকর অপরিহার্য হয়ে দাঁড়াবে। কাজেই কোনো আলেমকে আমলহীন দেখলেও তাঁর মর্যাদাহানি করো না। বরং এ অবস্থায় তাঁর জন্য দু'আ করবে।

ডাকাত হয়ে গেলো পীর

হযরত রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী (রহ.) একদিন মুরিদদের উদ্দেশ্যে বলছিলেন, তোমরা আমার পেছনে ছুটছো কেন? আমার অবস্থা তো ওই পীরের মতো, যে মূলত ডাকাত ছিলো। ডাকাত যখন দেখলো, মানুষ পীরকে ভক্তি করে, হাতে চুমো খায়, হাদিয়া দেয়, তখন মনে জাগলো, এটা তো দারুণ ব্যবসা! আমি তো শুধু শুধুই রাত জেগে ডাকাতি করি। তার চেয়ে ভালো, আমি পীর সাজবো, মানুষ আমার কাছে আসবে, হাতে চুমো খাবে, হাদিয়া দেবে।

অবশেষে লোকটি ডাকাতি ছেড়ে মস্তবড় পীর সেজে বসলো। একটা খানকাহ বানালো, বিশাল তাসবীহ হাতে নিলো, লম্বা জুব্বা পরে নিলো এবং পীরদের মতো তাসবীহ জপতে লাগলো। তারপর মানুষ যখন দেখলো, ভাবলো, ইনি হয়ত মস্তবড় বুযুর্গ, আমাদের এখানে বসে আছেন। তাই মানুষ তার কাছে আসা শুরু করলো। এক সময় পীরের দরবার বেশ জমে ওঠলো। মুরিদের সংখ্যাও অনেক হলো। কেউ-কেউ হাদিয়া নিয়েও আসা শুরু করলো। পীর সাহেবও একেক মুরিদকে একেক রকমের যিকির-সবক দিতে লাগলেন। আর যিকিরের বৈশিষ্ট্য তো হলো, আল্লাহ তাআলা এর কারণে যিকিরকারীর মর্যাদা বৃদ্ধি করে থাকেন। যেহেতু এসব মুরীদও ইখলাসসহ আল্লাহ্‌র যিকিরে মশগুল ছিলো, তাই এদের মর্যাদাও আল্লাহ্ বৃদ্ধি করে দিলেন এবং অন্তর্দৃষ্টি খুলে দিলেন। তাঁরা মর্যাদার উচ্চ আসনে পৌঁছে গেলো।

মুরিদের দু'আও কাজে আসে

একবার মুরিদরা পরস্পর আলোচনা করলো, আল্লাহ তাআলা তো আমাদেরকে এ স্তরে নিয়ে এসেছেন। আমরা দেখবো, আমাদের পীর সাহেব কোন স্তরে আছেন? তারা মুরাকাবায় বসলো। কিন্তু পীর সাহেবের স্তর খুঁজে পেলো না। মুরিদরা কোনো কিছু বুঝতে না পেরে পরস্পর বলাবলি করলো, মনে হয় আমাদের পীর সাহেবের অবস্থান অনেক উপরে, যেখানে আমাদের অন্তর্দৃষ্টি পৌঁছে না। অবশেষে তারা বিষয়টি পীর সাহেবকে জানালো। পীর সাহেব তখন চোখের পানি ছেড়ে দিলো। অনুশোচনার ভাষাতে নিজের প্রকৃত অবস্থা তাদের সামনে তুলে ধরলো। বললো, তোমাদেরকে আমার অবস্থান সম্পর্কে কী বলবো! আসলে আমি একজন ডাকাত। তারপর নিজের পীর হওয়ার ইতিবৃত্ত তুলে ধরলো। আরো বললো, রিয়াযত ও মুশাহাদার ময়দানে তোমরা অনেক উপরে পৌঁছে গিয়েছ একমাত্র ইখলাসপূর্ণ যিকিরের কারণে, আর আমার তো কোনো স্তরই নেই। তোমরা আমার স্তর পাবে কোথায়? কাজেই তোমরা আমার কাছ থেকে চলে যাও, অন্য কোনো হক পীরের দরবারে যাও।

পীর সাহেবের মুখে এসব বৃত্তান্ত শুনে মুরিদরা সবাই মিলে আল্লাহ্র নিকট দু'আ করলো যে, হে আল্লাহ্! আমাদের পীর সাহেব চোর হোক বা ডাকাত হোক, তুমি আমাদেরকে যা কিছু দিয়েছো, তাঁর উসিলাতেই দিয়েছো। হে আল্লাহ্! এখন তুমি তাঁকেও শুদ্ধ করে দাও। তাঁকেও উচ্চ মর্যাদার আসন দান কর।

যেহেতু মুরিদরা ছিলো অত্যন্ত মুখলিছ ও বুযুর্গ, তাই তাদের দু'আর বরকতে আল্লাহ তাআলা ওই পীর সাহেবকেও মাফ করে দিলেন এবং তাঁকেও মর্যাদার আসন দান করলেন।

সারকথা

কোনো আলেমের মাঝে ভুল-বিচ্যুতি দেখলে, এ নিয়ে সমালোচনা করা যাবে না। তাঁকে হেয়প্রতিপন্ন করা যাবে না। তাঁর বিরুদ্ধে দুর্নাম রটানো যাবে না। বরং তখন তাঁর জন্য হিদায়াতের দু'আ করতে হবে।

আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ -

গোস্বাকে কাবু করুন

"সব গুনাহর দু'টি উৎস রয়েছে। এক. রিপুর তাড়না। দুই. গোস্বা। কিন্তু এ দুয়ের মাঝেও রয়েছে পার্থক্য। রিপুর তাড়নায় সৃষ্ট গুনাহগুলো সাধারণত তাওবার মাধ্যমে মেটানো যায়। পক্ষান্তরে রাগের কারণে সৃষ্ট গুনাহগুলোর অধিক সম্পর্ক যেহেতু বান্দার হকের সঙ্গে, তাই শুধু তাওবার মাধ্যমে এগুলো মেটানো যায় না।"

গোস্বাকে কাবু করুন

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ، وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّاٰتِ اَعْمَالِنَا، مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلاَ هَادِىَ لَهُ، وَاَشْهَدُ اَنْ لاَّ إِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، وَاَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَسَنَدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلاَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ .... صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى آلِهٖ وَأَصْحَابِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا — اَمَّا بَعْدُ : عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ : اِنَّ رَجُلاً قَالَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَوْصِنِىْ وَلاَ تُكْثِرْ عَلَىَّ قَالَ : لاَتَغْضَبْ —

(جامع الاصول ، الكتاب الثالث فى الغضب والغيض)

হামদ ও সালাতের পর

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে আরজ করলো, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমাকে কিছু উপদেশ দিন। তবে উপদেশটা যেন লম্বা না হয়। অর্থাৎ- এ লোকটি রাসূলুল্লাহ (সা.) থেকে উপদেশ কামনা করলো, সঙ্গে সঙ্গে শর্তও জুড়ে দিলো, উপদেশটা যেন লম্বা-চওড়া না হয়।

এ কারণেই এ হাদীসের ব্যাখ্যায় হাদীসবিশারদগণ লিখেছেন, উপদেশপ্রার্থী যদি উপদেশদাতার কাছে সংক্ষিপ্ত উপদেশ কামনা করে, তাহলে এটা আদবের খেলাফ নয়। যেমন- এ হাদীসে উল্লিখিত লোকটি এমনটি করেছেন আর

রাসূলুল্লাহ (সা.) এটাকে কিছু মনে করেননি। কারণ, হতে পারে উপদেশপ্রার্থীর হাতে সময় কম, তাই সে সংক্ষিপ্ত উপদেশ চাচ্ছে। তার তাড়া আছে, তাই সে সময়ক্ষেপণ করতে রাজি নয়। এখন এমন ব্যক্তিকে যদি লম্বা-চওড়া উপদেশের ফিরিস্তি শুনানো হয়, হয়ত সে ভাববে, উপদেশ চেয়ে আমি কোন্ মুসিবতেই না পড়লাম!

যাক, রাসূলুল্লাহ (সা.) লোকটিকে ছোট্ট একটি উপদেশ দিলেন। তিনি বললেন, لاَتَغْضَبْ গোস্বা করো না।

এটি শব্দশরীরে ক্ষুদ্র একটি উপদেশ হলেও, মূলত এটি এমন একটি উপদেশ, মানুষ যদি শুধু এ উপদেশটির প্রতি যত্নবান হয়, তাহলে শত নয়; বরং হাজারও গুনাহ থেকে বেঁচে থাকতে পারবে।

যে দুটি ইঞ্জিন দ্বারা গুনাহগুলো চালিত হয়

গোস্বা ও প্রবৃত্তির চাহিদা- গুনাহসমূহকে উস্কানি দেয়। দুনিয়াতে সংঘটিত তাবৎ গুনাহ এ দু'টির কারণেই সংঘটিত হয়। একটু চিন্তা করলেই এটা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, আল্লাহ্র হক কিংবা বান্দার হকসংশ্লিষ্ট সকল গুনাহ মূলত এ দু'টির কারণেই চাঙ্গা হয়ে ওঠে।

প্রবৃত্তির চাহিদার দু'টি দিক রয়েছে। যেমন মানুষের খেতে মন চায়- এটাও প্রবৃত্তির চাহিদা। অবৈধ উপায়ে মানুষ মনের চাহিদাকে পূরণ করা মানেও প্রবৃত্তির চাহিদা পূরণ করা। মানুষ কেন চুরি করে? ডাকাতি কেন করে? প্রবৃত্তির চাহিদার কারণেই করে। কুদৃষ্টির গুনাহও এর কারেণই হয়। প্রতীয়মান হলো, রিপুতাড়িত মানুষ নিজের প্রবৃত্তির চাহিদা পূরণের কারণে বহু গুনাহ করে। অনুরূপভাবে গোস্বাও। এর কারণেও মানুষ বহু গুনাহতে লিপ্ত হয়। গোস্বা কত অসংখ্য গুনাহকে জন্ম দিতে পারে- সামনের বিবরণ দ্বারা কিছুটা অনুমান করা যাবে। এ জন্যই রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, গোস্বা করো না। এই ছোট্ট কথাটার উপর আমল করতে পারলে গুনাহর দুর্গের অর্ধেকটাই ভেঙ্গে পড়বে।

আত্মশুদ্ধির জন্য প্রথম পদক্ষেপ

হাকীমুল উম্মত হযরত আশরাফ আলী থানভী (রহ.) বলেন, এ হাদীসের বক্তব্য হলো- গোস্বা না করা। এটা আত্মশুদ্ধির পথে তথা তরিকতের লাইনে বহু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এজন্য যে ব্যক্তি আল্লাহ্র পথে চলতে চায় এবং নিজেকে শোধরাতে চায়, তার প্রথম কাজ হবে, নিজের গোস্বাকে কাবু করে নেয়া।

গোস্বা মানুষের স্বভাবজাত বিষয়

গোস্বা মানুষের স্বভাবজাত বিষয়। কোনো মানুষই 'গোস্বা' নামক গুণ থেকে মুক্ত নয়। আল্লাহ তাআলা প্রত্যেকের মাঝেই 'গোস্বা' রেখে দিয়েছেন। এটা এমন এক গুণ, মানুষ যদি একে কন্ট্রোল করতে পারে, তাহলে অসংখ্য অনাকাঙ্ক্ষিত বিপদ থেকে সে বেঁচে থাকতে পারে। এ গুণটি মানুষের মাঝে যদি না থাকতো, তবে সে শত্রুর আক্রমণ থেকে, হিংস্রপ্রাণীর হিংস্রতা থেকে ও অনিষ্টকারীর অনিষ্টতা থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারতো না। কাজেই প্রয়োজনের সময় গোস্বাকে ব্যবহার করার অনুমতি আছে। এ ক্ষেত্রে শরীয়তের কোনো পাবন্দি নেই। তাই নিজেকে বাঁচানোর জন্য, নিজের সম্পদ, স্ত্রী-সন্তান ও আত্মীয়-স্বজনকে রক্ষা করার জন্য 'গোস্বা' গুণটিকে কাজে লাগানোর আবশ্যকতা অবশ্যই রয়েছে।

গোস্বার কারণে সংঘটিত গুনাহ

কিন্তু এই 'গোস্বা' যেসব গুনাহর জন্ম দেয়, সেগুলো দু'-একটি নয়– বরং অসংখ্য। যেমন– গোস্বার কারণেই অহঙ্কার সৃষ্টি হয়। হিংসাও গোস্বারই সৃষ্টি। তাছাড়া বিদ্বেষ, শত্রুতাসহ আরো বহু গুনাহ সংঘটিত হয় এ গোস্বার নিয়ন্ত্রণহীনতার কারণেই। মনে করুন, এ নিয়ন্ত্রণহীন গোস্বার পাত্র যদি আপনার অধীন কেউ হয়, তবে এর কারণে হয়ত আপনি তাকে বকাঝকা করবেন, চড়-থাপ্পড়ও দেবেন, তিরস্কার করবেন কিংবা এমন ব্যবহার করবেন, যার কারণে সে ভীষণ কষ্ট পাবে। অথচ এসবই তো বান্দার হকসংশ্লিষ্ট গুনাহ। কারণ, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন–

سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوْقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ – (صحيح البخاری ، کتاب الأدب)

'মুসলমানকে গালি দেয়া পাপ এবং হত্যা করা কুফরি।'

গোস্বার কারণে সৃষ্টি হয় বিদ্বেষ

আর যদি গোস্বার পাত্র আপনার অধীন না হয়, তখন গোস্বার পরিণাম হয় আরো মারাত্মক। এ কারণে আপনি তার দোষচর্চায় লিপ্ত হবেন। বিশেষ করে যদি গোস্বার পাত্র আপনার থেকে বড় কেউ হয়, তখন গোস্বার প্রয়োগ করতে না পেরে তার দোষচর্চায় লিপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা আরও বেশি। এরপরেও হয়ত আপনার গোস্বা থামবে না; বরং আরও স্ফীত হয়ে ওঠবে, তখন আপনার মনের অবস্থা হয়ত এমন হবে যে, পারলে তাকে খাবলে খাবেন। আর এরই নাম

বিদ্বেষ। দোষচর্চা ও বিদ্বেষ ভিন্ন-ভিন্ন গুনাহ। যেগুলো এ গোস্বার কারণেই সৃষ্টি হয়। এখন আপনার মনের একান্ত কামনা হবে তাকে কষ্ট দেয়া। অথবা সে কোনো কারণে কষ্ট পেলে আপনার মনটা খুশিতে নেচে ওঠবে।

গোস্বার কারণে সৃষ্টি হয় হিংসা

আর যদি সে অশান্তিতে থাকার পরিবর্তে শান্তিতে থাকে, তখন আপনার মনের তীব্র কামনা হবে, শান্তিটা যেন তার থেকে ছিনিয়ে নেয়। তার পদ, সম্পদ ও সফলতা দেখলে তখন আপনার মন জ্বলে ওঠবে। একেই বলা হয়– হিংসা। যা এ গোস্বারই কারণে সৃষ্টি হয়। তাই রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, গোস্বা করো না। এ মর্মে আল্লাহ তাআলা নেককার বান্দাদের প্রশংসা করতে গিয়ে বলেছেন–

وَالْكَاظِمِيْنَ الْغَيْظَ وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ –

'যারা নিজেদের রাগকে সংবরণ করে, আর মানুষকে ক্ষমা করে।'

–(সূরা আলে-ইমরান : ১৩৪)

বান্দার হক রাগের কারণে আহত হয়

এজন্যই বলি, গুনাহসমূহের দু'টি কেন্দ্রীয় ঠিকানা রয়েছে– রিপুর তাড়না ও গোস্বা। কিন্তু এ দুয়ের মাঝেও রয়েছে পার্থক্য। রিপুর তাড়নার কারণে সৃষ্ট গুনাহগুলো সাধারণত তাওবার মাধ্যমে মেটানো যায়। পক্ষান্তরে রাগের কারণে সৃষ্ট গুনাহগুলোর অধিক সম্পর্ক যেহেতু বান্দার হকের সঙ্গে, তাই শুধু তাওবার মাধ্যমে এগুলো মেটানো যায় না; বরং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির কাছেও মাফ নিতে হয়। যদি সে মাফ করে, তাহলে তো ভালো কথা। অন্যথায় এ গুনাহ মিটে যায় না, বরং থেকে যায়। যেমন, গোস্বার কারণে সৃষ্ট গুনাহগুলো হলো– হিংসা, বিদ্বেষ, দোষচর্চা, গালি দেয়া, অপরের মনে কষ্ট দেয়া ইত্যাদি। এসবই হুকুকুল ইবাদ বা বান্দার হক-সংশ্লিষ্ট গুনাহ। এসব গুনাহ অন্যসব গুনাহ থেকেও মারাত্মক। কারণ, এগুলো থেকে পবিত্র হওয়া অনেক কঠিন ব্যাপার। এজন্যই রাসূলুল্লাহ (সা.) গোস্বা করা থেকে নিষেধ করেছেন।

আলোচ্য হাদীসে তিনি বলেছেন, 'গোস্বা করো না'। মানুষ যদি এ গোস্বাকে কাবু করতে পারে, তবে সহজে আল্লাহ্র রহমতের পাত্র হতে পারে। আল্লাহ্ও তখন তার উপর রাগ করেন না।

রাগ সংবরণ করার কারণে মহা পুরস্কার

অপর এক হাদীসে এসেছে, কেয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলার সামনে এক ব্যক্তিকে উপস্থিত করা হবে। তিনি ফেরেশতাদেরকে জিজ্ঞেস করবেন, বলো, 'এ বান্দার আমলনামায় কী-কী নেক আমল আছে?' আল্লাহ তাআলা যদিও জানেন, তবুও অন্যদের সামনে প্রকাশ করার জন্য তিনি এমনটিও করে থাকেন। যাক, ফেরেশতারা তখন উত্তর দেবে, 'হে আল্লাহ্! এ বান্দার আমলনামায় নেক আমলের প্রাচুর্য নেই। নফল নামায ও ইবাদতের সংখ্যাও খুব বেশি নয়। তবে এর আমলনামায় বিশেষ একটা নেক আমল আছে। তাহলো, এ ব্যক্তির সঙ্গে কেউ অন্যায় আচরণ করলে, সে তাকে মাফ করে দিতো। আর যখন সে কারো কাছে কোনো হক পাওনা থাকতো, তখন ওই ব্যক্তি হক আদায়ে অক্ষম হলে নিজের চাকর-বাকরকে বলে দিতো, একে ছেড়ে দাও। আল্লাহ তাআলা তখন বললেন, আমার এ বান্দা যেহেতু দুনিয়াতে আমার অন্যান্য বান্দার সঙ্গে ক্ষমার নীতি দেখিয়েছে, সুতরাং আমিও আজ তার সঙ্গে ক্ষমার নীতি দেখাবো'। এ বলে আল্লাহ্ তাকে মাফ করে দেবেন। এত বড় পুরস্কার শুধু গোস্বা সংবরণের কারণেই পাওয়া যাবে।

রাগকে কাবু করুন, ফেরেশতারাও ঈর্ষা করবে

এ কারণেই আমাদের বুযুর্গানে দ্বীনের কাছে যখন কোনো ব্যক্তি নিজেকে সংশোধন করার জন্য যেতো, তখন সর্বপ্রথম তাওবা করাতেন। এরপরেই সবক দিতেন যে, রাগকে সম্পূর্ণ মিটিয়ে দাও। আর এ রাগ মেটানোর জন্য তাঁরা কঠিন-কঠিন মুজাহাদা করাতেন। কারণ, তাঁদের চিকিৎসার আসল উদ্দেশ্য ছিলো, অহঙ্কার, অহমিকা, হিংসা, বিদ্বেষ, কপটতা, অপরের দোষচর্চা মোটকথা যাবতীয় আত্মিক পীড়া থেকে ভুক্তভোগীকে পুতঃপবিত্র করে দেয়া। আর এসব গুনাহের বেশির ভাগ তো গোস্বার কারণেই সৃষ্টি হয়। তাই বুযুর্গগণ রাগকে কাবু করার সবক দিতেন সর্বপ্রথম। আর এ রাগ কারো নিয়ন্ত্রণে চলে এলে তখন সে একটা পর্যায়ে এমন স্তরে পৌঁছুতে সক্ষম হয় যে, তাকে দেখে ফেরেশতারাও ঈর্ষা করে। ফেরেশতাদের মাঝে তো রাগের কোনো ছোঁয়া-ই নেই। সুতরাং এ কারণে তারা গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার মাঝে বিশেষ কোনো কৃতিত্ব নেই। মানুষের মাঝে গোস্বা আছে, রিপুর তাড়না আছে, সুতরাং গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার কৃতিত্ব মানুষেরই প্রাপ্য।

শায়খ আব্দুল কুদ্দুস গাঙ্গুহী (রহ.)-এর ছেলের ঘটনা

শায়খ আব্দুল কুদ্দুস ছিলেন গাঙ্গুহ'র একজন শীর্ষস্থানীয় ওলি। আমাদের বুযুর্গদের সূত্রপরম্পরায় তাঁর বিশেষ অবস্থান রয়েছে। তাঁর এক ছেলে ছিলো। শায়খ জীবিত থাকাকালীন তার মাথায় কখনো এ ভাবনা জাগেনি যে, আমার আব্বা থেকে সারা দুনিয়ার মানুষ ফয়েজ নিচ্ছে আর আমি শাহী মেজাজে ঘুরে বেড়াচ্ছি। অথচ তিনি চলে গেলে তো শত আফসোস করেও পাবো না। তাই তাঁর দরবারে থেকে আমি আত্মশুদ্ধি করে নিই। এ দৃষ্টিকোণ থেকে ছেলে কখনো ভেবে দেখেনি।

শায়খের ইন্তেকালের পর তার আফসোস জেগে ওঠলো। ভাবলো, আব্বাকে নিজের কাছে পেয়েও আমি ধন্য হতে পারলাম না। বাতির নিচের অন্ধকারের মতোই রয়ে গেলাম। অথচ দুনিয়ার অসংখ্য মানুষ তাঁর থেকে ফয়েজ-বরকত লাভ করেছে। এভাবে তার আফসোস উজ্জীবিত হলো। ব্যাকুল হয়ে পড়লো এখন সে ক্ষতি পূরণ করা যায় কীভাবে?

বহু ভেবে-চিন্তে উপায় একটা বের করলো। পিতার নিকট থেকে যারা উপকৃত হয়ে ধন্য হয়েছেন, তাঁদের কারো নিকট গিয়ে উপকৃত হওয়া যায়। অনুসন্ধানে নামলো, পিতার খলিফাদের মধ্যে সবচে' বড় আল্লাহ্ওয়ালা কে? তারপর বলখের এক বুযুর্গের সংবাদ পেলেন, তিনিই তার পিতার শীর্ষ খলিফা। কিন্তু সমস্যা দেখা দিলো, কোথায় গাঙ্গুহ আর কোথায় বলখ। ঘরের সম্পদকে কদর না করায় আজ এ পরিণতি। তবুও কী আর করা। যেহেতু তার হৃদয়ে সত্যের পিপাসা ছিলো, তাই বলখের পথে পড়ি জমালো।

শায়খের নাতিকে অভ্যর্থনা

অন্যদিকে শায়খের সেই বলখি খলিফা যখন জানতে পারলেন, তাঁর শায়খের ছেলে তাঁরই নিকট আসছেন, তখন তিনি শহর থেকে বের হয়ে অত্যন্ত শানদার অভ্যর্থনা জানালেন। সসম্মানে নিজের বাড়িতে নিয়ে এলেন, উন্নত খাবার পরিবেশন করলেন এবং থাকার উন্নত ব্যবস্থা করে দিলেন। না জানি আরো কত কী করলেন।

গোসলখানার ওখানে আগুন জ্বালাবে

এভাবে এক-দুদিন অতিক্রান্ত হওয়ার পর সে বললো : 'হযরত! আপনি আমার সঙ্গে সদাচরণ দেখিয়েছেন, অত্যন্ত আদর-যত্ন করেছেন। কিন্তু আসলে

আমি অন্য একটি উদ্দেশ্যে এসেছি।' বুযুর্গ জিজ্ঞেস করলেন, 'কী উদ্দেশ্য?' উত্তর দিলো, 'উদ্দেশ্য হচ্ছে, আপনি আমার বাড়ি থেকে যে দৌলত এনেছেন, তার কিছু অংশ আমাকেও দান করবেন।' বুযুর্গ বললেন, 'আচ্ছা, ওই দৌলত নিতে এসেছ?' বললো, 'জি হযরত!' এবার বুযুর্গ বললেন, 'যদি সেই দৌলত অর্জন করার জন্যই এসে থাকো, তাহলে তো এই গালিচা, এই কার্পেট, এই সম্মান আর উন্নত খাবার– সবকিছুই ছেড়ে দিতে হবে। জিজ্ঞেস করলো, 'তাহলে আমাকে কী করতে হবে?' বুযুর্গ উত্তর দিলেন, 'আমাদের মসজিদের পাশে একটি গোসলখানা আছে, সেখানে যারা অযু করে, তাদের জন্য লাকড়ি জ্বালিয়ে গরম পানির ব্যবস্থা করা হয়। তোমার কাজ হলো, শুধু লাকড়ি জ্বালাবে আর পানি গরম করবে।' বুযুর্গ আমল, ওজিফা, যিক্র এসব কিছুর কথাই বললেন না। বললেন, 'তোমার আপাতত কাজ এটাই।' জিজ্ঞেস করা হলো, 'তাহলে হযরত! থাকার কী ব্যবস্থা?' বললেন, 'রাতে ঘুমাতে হলে ওখানে গোসলখানার পাশেই শুয়ে থাকবে।'

কোথায় লাল গালিচার সংবর্ধনা, উন্নত থাকা-খাওয়া, আপ্যায়ন আর কোথায় গোসলখানায় বসে-বসে আগুন জ্বালানোর কাজ!

আমিত্বকে আরো বিনাশ করতে হবে

শায়খ আব্দুল কুদ্দুস (রহ.)-এর ছেলে তাঁর পিতার বলখীয় খলিফার দরবারে এসে যথারীতি গোসলখানার সামনে পানি গরম করার কাজ করতে লাগলো। এদিকে বলখী বুযুর্গ ঝাড়ুদারকে বললেন, 'দেখবে, গোসলখানার পাশে এক লোক বসা আছে। ময়লার এই ঝুড়িটি নিয়ে তার পশ দিয়ে যাবে এবং এমনভাবে তার পাশ ঘেঁষে যাবে, যেন ময়লার গন্ধ তার নাকে লাগে। ঝাড়ুদার কথামতো যেই তার পাশ ঘেঁষে যেতে চাইলো, তখন তার সহ্য হলো না। সারা জীবন যে শাহী হালতে জীবন কাটিয়েছে, তার এটা সহনীয় হয় কীভাবে? সে ধমকের সুরে বলে উঠলো, 'এই, তোমার সাহস তো কম নয়, ময়লার ঝুড়ি আমার নাকের কাছে এভাবে নিলে কেন? ভাগ্য ভালো, এটা গাঙ্গুহ নয়, অন্যথায় দেখে নিতাম।' তারপর বলখের বুযুর্গ ঝাড়ুদারকে বললেন, কী বললো সে?' ঝাড়ুদার বৃত্তান্ত শুনালো। এতে বুযুর্গ মন্তব্য করলেন, 'উহু, আমিত্ব এখনো রয়ে গেছে। চাউল এখনো সেদ্ধ হয়নি।'

এভাবে আরো কিছুদিন অতিবাহিত হওয়ার পর বুযুর্গ ঝাড়ুদারকে ডেকে বললেন, 'এবারেও ময়লার ঝুড়িটি শুধু নাকের পাশ দিয়েই নিয়ে যাবে না, বরং এমনভাবে যাবে যেন ময়লা তার শরীরেও লেগে যায়। তারপর কি ঘটে আমাকে

জানাবে।' ঝাড়ুদারও বুযুর্গের কথা পালন করলো। বুযুর্গ এবার কী হয়েছে, জানতে চাইলে বললো, 'এবার ঝুড়িটি একেবারে তার শরীর ঘেঁষে নিয়ে গিয়েছি এবং এতে কিছু ময়লাও তার গায়ে লেগেছে। তবুও আমাকে কিছুই বলেনি। তবে খুব কটাক্ষ দৃষ্টির সাথে আমার প্রতি তাকিয়েছিলো।' বুযুর্গ মন্তব্য করলেন, 'আলহামদুলিল্লাহ কাজ হচ্ছে।'

এবার হৃদয়ের তাগুত ভেঙ্গেছে

অতঃপর কিছুদিন পর বুযুর্গ ঝাড়ুদারকে বললেন, 'এবার তুমি তার পাশ কেটে এমনভাবে যাবে, যেন তোমার ময়লার ঝুড়ি থেকে বেশ কিছু ময়লা তার গায়ে পড়ে। এতে তার প্রতিক্রিয়া কী হয় জানাবে। সে তা-ই করলো। বুযুর্গ জিজ্ঞেস করলেন, 'কী প্রতিক্রিয়া দেখলে?' উত্তর দিলো, 'এবারের ব্যাপারটি সত্যিই বিস্ময়কর। ঝুড়ি তার গায়ে ফেলতে গিয়ে আমিও পড়ে গিয়েছিলাম, তাতে সে একেবারে ব্যস্ত হয়ে পড়লো এবং আমাকে জিজ্ঞেস করতে লাগলো। ব্যথা পাননি তো?' বুযুর্গ মন্তব্য করলেন, 'আলহামদুলিল্লাহ, তার অন্তরে যে তাগুত বিরাজ করছিলো, সেটি ভেঙ্গে গেছে।'

শিকল ছাড়তে পারবে না

এবার তাকে ডেকে এনে দায়িত্ব পরিবর্তন করে দিলেন। বললেন, 'গোসলখানায় তোমার দায়িত্ব শেষ। এখন থেকে তুমি আমার সঙ্গে থাকবে। তবে এভাবে থাকবে যে, আমি যখন শিকার করতে বের হবো, তখন তুমি আমার শিকারী কুকুরটির শিকল হাতে রাখবে এবং আমার সঙ্গে চলবে।' এভাবে মর্যাদা কিছুটা বাড়লো। শায়খের সোহবত ও সঙ্গ লাভের মর্যাদা পেলো। কিন্তু সমস্যা দেখা দিলো, কুকুরের শিকল ধরে রাখতে গিয়ে কুকুর যখন শিকার দেখলো, তখন দৌড়-ঝাঁপ শুরু করে দিলো। এক পর্যায়ে সে মাটিতে লুটিয়ে পড়লো আর কুকুর তাকে নিয়েই টেনে-হেঁচড়ে চলতে লাগলো। তবুও সে কুকুরের শিকল ছাড়লো না। কারণ এ ছিলো শায়খের নির্দেশ। পরিণতিতে সে আহত হলো, ঝরঝর করে শরীর থেকে রক্ত পড়তে লাগলো।

ওই দৌলত ন্যস্ত করলাম

রাতের বেলা বুযুর্গ তাঁর শায়খ আব্দুল কুদ্দুস গাঙ্গুহী (রহ.)-কে স্বপ্নে দেখলেন। তিনি বলছেন, 'মিয়া! আমি তোমাকে দিয়ে তো এত কষ্ট উঠাইনি।' এতে বুযুর্গ দিশা পেলেন এবং তাকে ডেকে বললেন, 'আপনি যে দৌলত লাভ

করতে এখানে এসেছেন এবং যে দৌলত আমি আপনার বাড়ি থেকে এনেছিলাম, আমি সেই সম্পূর্ণ দৌলত 'আলহামদুলিল্লাহ' আপনাকে ন্যস্ত করলাম।' পিতার উত্তরাধিকার আপনি পেয়ে গেছেন। এবার আল্লাহ্‌র ফজলে আপনি দেশে ফিরতে পারেন।'

ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর ঘটনা

হযরত ইমাম আবু হানিফা (রহ.)। তাঁর ফিকহশাস্ত্রের উপরই আমরা আমল করি। পুরা দুনিয়ায় আল্লাহ তাআলা তাঁর ফয়েজ জারি করে দিয়েছেন। তাঁকে হিংসা করতো এমন মানুষের সংখ্যা ছিলো অনেক। আল্লাহ তাআলা তাঁকে অনেক সম্মান দিয়েছেন, ইলম দিয়েছেন, প্রসিদ্ধি দিয়েছেন এবং অনেক ভক্তবৃন্দও দান করেছেন। এ কারণেই তাঁর হিংসুকের সংখ্যা ছিলো অনেক, যারা তাঁর দোষচর্চা করে বেড়াতো।

একদিনের ঘটনা। এক ব্যক্তি ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর পিছু নিলো। ইমাম সাহেব বাড়ির দিকে যাচ্ছিলেন আর এ লোকটি পেছনে-পেছনে যাচ্ছিলো এবং মুখে শুধু গালি দিচ্ছিলো। সে ইমাম সাহেবের উদ্দেশ্য হরদম বলে যাচ্ছিলো, আপনি এমন আপনি তেমন। চলতে-চলতে ইমাম সাহেব একটি গলির মোড়ে এসে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং লোকটির উদ্দেশে বললেন, এখান থেকে আপনার আর আমার পথ ভিন্ন হয়ে যাবে। কারণ, আমি যাচ্ছি বাড়ির দিকে আর আপনার গন্তব্য হলো অন্য দিকে। কাজেই এক কাজ করুন, আপনি ইচ্ছামতো আমাকে বকতে থাকুন, যেন কোনো 'গালি' থেকে গেলে আপনার আফসোস করার প্রয়োজন না হয়।

চল্লিশ বছর পর্যন্ত ইশার নামাযের অযু দ্বারা ফজরের নামায

ঘটনাটি শুনেছি আমার শায়খ মাসীহুল্লাহ খান সাহেব (রহ.)-এর মুখে। ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর অভ্যাস ছিলো, ইশার নামাযের অযু দ্বারা ফজরের নামায পড়তেন। এর ইতিবৃত্তও বেশ বিস্ময়কর। প্রথমদিকে এ অভ্যাস তাঁর ছিলো না। বরং তাঁর তখনকার অভ্যাস ছিলো, তাহাজ্জুদের নামাযের জন্য উঠতেন শেষ রাতে। একদিন তিনি কোথাও যাচ্ছিলেন, তখন শুনতে পেলেন, এক বুড়ো লোক তাঁকে উদ্দেশে করে বলছেন, এই সেই ব্যক্তি, যিনি ইশার নামাযের অযু দ্বারা ফজরের নামায পড়েন। বৃদ্ধের এ মন্তব্য শুনে ভাবলেন, এ লোকটি আমার সম্পর্কে এত উঁচু ধারণা রাখে! অথচ আমার মাঝে এ সুন্দর অভ্যাসটি তো নেই। কাজেই আমি প্রতিজ্ঞা করছি, আজ থেকে যতদিন বেঁচে

থাকবো, ইশার নামাযের অযু দ্বারা 'ইন্‌শাআল্লাহ্‌' ফজরের নামায আদায় করবো। সেদিন থেকেই ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর এটা অভ্যাসে পরিণত হলো।

এর অর্থ আবার এটা নয় যে, তিনি সারারাত ইবাদত করতেন আর সারাদিন ঘুমাতেন। কারণ, দিনে তো ব্যবসা করতেন এবং দরস-তাদরিসে ব্যস্ত থাকতেন। লোকজন বিভিন্ন মাসআলা জানার উদ্দেশ্যে তাঁর কাছে আসা-যাওয়া করতো। এভাবে জোহরের নামায পর্যন্ত অত্যন্ত ব্যস্ত সময় কাটাতেন। শুধু জোহরের নামাযের পর থেকে আসর নামায পর্যন্ত ঘুমাতেন।

ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর আরেকটি বিস্ময়কর ঘটনা

একদিন জোহরের নামায পড়ে তিনি বাসায় চলে গেলেন। আরামের উদ্দেশ্যে বিছানায় পিঠ লাগালেন। এমন সময় গেটে এসে কে যেন খটখট আওয়াজে তাঁকে ডাকা শুরু করলো। একটু ভাবুন, যে ব্যক্তি সারারাত ইবাদতে কাটাতেন, দিনের বেলায় জোহর পর্যন্ত ব্যস্ত থাকতেন, তাঁর বিশ্রামের এ সামান্য সময়টুকুতে যদি কেউ এরূপ বিরক্ত করে, তখন তিনি কতটা চটে যাওয়ার কথা! অথচ ইমাম সাহেবকে দেখুন, তিনি উঠলেন, সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামলেন, দরজা খুললেন। দেখতে পেলেন, এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে আছে। লোকটি কেন এসেছে– প্রশ্ন করলে সে উত্তর দিলো, মাসআলা জানার জন্য এসেছি।

দেখুন, লোকটি কয়টি অন্যায় করেছে, প্রথমত, ইমাম সাহেব মাসআলা বয়ান করার জন্য প্রতিদিন যেখানে বসেন, সে সেখানে এলো না। দ্বিতীয়ত, এখন ইমাম সাহেবের মতো মানুষের বিশ্রাম নষ্ট হয় এমন মুহূর্তে। কিন্তু ইমাম সাহেব একটুও বিরক্ত হলেন না। বরং তাকে বললেন, ঠিক আছে ভাই, বলুন, কী মাসআলা জানতে এসেছেন? লোকটি উত্তর দিলো, কী মাসআলা জিজ্ঞেস করবো, তা তো ভুলে গেছি। আসার সময়ও মনে ছিলো, এখন তো ভুলে গেছি। ইমাম সাহেব বললেন, ঠিক আছে, যখন মনে পড়বে, তখন আসবেন। লোকটিকে তিনি ভালো-মন্দ কিছুই বললেন না– বকলেন না, ধমক দিলেন না, বরং নীরবে পুনরায় উপরে চলে গেলেন।

উপরে গিয়ে যেইমাত্র শুলেন, অমনি লোকটি পুনরায় দরজা খটখটানো শুরু করে দিলো। ইমাম সাহেব আবার উঠলেন, দরজা খুললেন, দেখলেন আগের সেই ব্যক্তি দাঁড়িয়ে আছে। জিজ্ঞেস করলেন, কী ব্যাপার? সে বললো, ওই মাসআলাটা আমার মনে পড়েছে। ইমাম সাহেব বললেন, ঠিক আছে, জিজ্ঞেস করুন। লোকটি বললো, এতক্ষণ তো মনে ছিলো, আপনি যখন সিঁড়ি বেয়ে নামছিলেন, তখনও মনে ছিলো, কিন্তু এখন যে আবার ভুলে গেলাম।

লোকটার কারবারটা দেখুন, যদি ইমাম সাহেব না হয়ে একজন সাধারণ মানুষের সাথে সে এ আচরণটা করতো, চিন্তা করুন, তখন লোকটার কী অবস্থা হতো! কিন্তু ইমাম আবু হানিফা (রহ.) তো ইমামে আ'যম– যিনি নিজেকে মিটিয়ে দিয়েছেন। তাই তিনি ক্ষুব্ধ না হয়ে স্বাভাবিকভাবেই বললেন, ঠিক আছে, যখন মনে পড়বে, তখন চলে আসবেন। এই বলে তিনি পুনরায় বিশ্রামের উদ্দেশ্যে চলে গেলেন।

সবেমাত্র বিছানায় পিঠ লাগালেন, তখনই আগের সেই ডাক। এবারও ইমাম সাহেব যথারীতি নিচে নামলেন। দেখলেন, আগের সেই ব্যক্তি দাঁড়িয়ে আছে। ইমাম সাহেবকে উদ্দেশ করে সে বলে উঠলো, মাসআলাটা মনে পড়েছে। ইমাম সাহেব বললেন, ঠিক আছে বলুন। লোকটি তখন জিজ্ঞেস করলো, আমি জানতে চাচ্ছি, মানুষের পায়খানার স্বাদ কেমন– তিতা, না মিঠা? (আল্লাহ্র কাছে পানাহ চাই, এটাও কী মাসআলা হলো!)

এবার ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে যেতো

এ ঘটনার মুখোমুখী মানুষটি যদি অন্য কেউ হতো, যদি তাকে এতক্ষণ ধৈর্য ধরতে হতো, তবে টের পাওয়া যেতো, কত ধানে কত চাল। অথচ ইমাম সাহেব তখনও একেবারে শান্ত। অত্যন্ত কোমলভাবে তিনি লোকটিকে বললেন, যদি মানুষের পায়খানা তাজা হয়, তখন কিছুটা মিঠা থাকে, আর শুকিয়ে গেলে কিছুটা তিতা হয়ে যায়। লোকটির স্পর্ধা দেখুন। এবার সে জিজ্ঞেস করে বসলো, আপনি কীভাবে জানলেন? খেয়ে দেখেছেন কি? ইমাম সাহেব শান্ত মেজাজে উত্তর দিলেন, জানার জন্য সব জিনিস খেয়ে দেখতে হয় না। এমন কিছু বিষয় আছে, যা বুদ্ধি দিয়ে জেনে নিতে হয়। তাজা পায়খানার উপর মাছি বসে, শুকনো পায়খানার উপর বসে না। তাতেই বোঝা গেলো, উভয়টার মধ্যে পার্থক্য আছে। অন্যথায় উভয়টার উপরই মাছি বসতো।

সমকালে ধৈর্যগুণে যিনি ছিলেন সেরা

ইমাম সাহেবের এ ব্যবহার দেখে লোকটি বললো, হযরত! আপনার কাছে হাতজোড় করে ক্ষমা চাচ্ছি, আপনাকে আমি অনেক কষ্ট দিয়েছি। আজ আমি আপনার কাছে হেরে গেলাম।

ইমাম সাহেব বললেন, আমি আবার আপনাকে কখন হারালাম? লোকটি উত্তর দিলো, আসল ব্যাপারটা ছিলো, আমি ও আমার এক বন্ধু তর্কে জড়িয়ে গিয়েছিলাম। তর্কের বিষয় ছিলেন আপনি ও হযরত সুফয়ান সাওরী (রহ.)।

আমার দাবি ছিলো, এ যুগে হযরত সুফয়ান সাওরী (রহ.) হলেন সবচে সেরা ধৈর্যশীল বুযুর্গ। আর আমার বন্ধুর দাবি ছিলো, আপনি। তর্কের সমাধানের জন্য আমরা উভয় বন্ধু যাচাইয়ের এ পদ্ধতি অবলম্বন করলাম। উদ্দেশ্য ছিলো, আপনার ধৈর্য যাচাই করা। বন্ধুকে বলেছিলাম, আমার এরূপ আচরণে যদি আপনি রেগে যান, তাহলে আমার কথাই ঠিক বলে বিবেচিত হবে। আর আপনি যদি রেগে না যান, তবে তোমার কথা সত্য হিসাবে ধরা হবে। কিন্তু আপনি আমাকে জিততে দিলেন না। বাস্তব কথা হলো, এ পৃথিবীর বুকে আপনার চেয়ে ধৈর্যশীল দ্বিতীয় কোনো লোক আমার চোখে পড়েনি।

এমন মানুষদের নিয়ে ফেরেশতারা ঈর্ষা করবে না তো কাকে নিয়ে করবে? তাঁরা নিজেদের আমিত্বকে সম্পূর্ণ মিটিয়ে দিয়েছিলেন।

ধৈর্য মানুষকে সাজিয়ে তোলে

তাই তো রাসূলুল্লাহ (সা.) দু'আ করেছিলেন–

اَللّٰهُمَّ اَغْنِنِىْ بِالْعِلْمِ وَزَيِّنِّىْ بِالْحِلْمِ - (كنـــز العمال ، رقم الحديث ٣٦٦٣)

'হে আল্লাহ্! আমাকে ইল্‌ম দ্বারা অভাবমুক্ত করুন আর সহনশীলতা দ্বারা সজ্জিত করুন।'

গোস্বা নিয়ন্ত্রণে রাখার উপায়

রাসূলুল্লাহ (সা.) গোস্বা থেকে বেঁচে থাকার নির্দেশই শুধু দেননি; বরং গোস্বা থেকে বাঁচার উপায়ও কুরআন মজীদে আল্লাহ পাক বলে দিয়েছেন এবং হাদীস শরীফেও রাসূলুল্লাহ (সা.) কৌশল বাতলে দিয়েছেন। প্রথম কথা হলো, অনিচ্ছাবশত যে গোস্বা আসে, তার জন্য আল্লাহ্র কাছে জবাবদিহি করতে হবে না। মূলত গোস্বার উদ্দেশ্য হলো, অন্যের অনিষ্টতা থেকে নিরাপদ থাকা। কিন্তু প্রয়োজনের চেয়েও বেশি রেগে যাওয়া গুনাহর অন্তর্ভুক্ত। যেমন গোস্বার বশবর্তী হয়ে কারো গায়ে হাত তোলা, গালি-গালাজ করা– এসবই সীমাতিরিক্ত বিধায় গুনাহের অন্তর্ভুক্ত।

গোস্বার সময় 'আউযুবিল্লাহ' পড়বে

গোস্বা এলে নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য সর্বপ্রথম সেটাই বলবে, যা কুরআন মজীদ শিক্ষা দিয়েছে। অর্থাৎ– গোস্বা এলে সঙ্গে-সঙ্গে 'আউযুবিল্লাহ' পড়বে এটা কুরআন মজীদের শিক্ষা। যেমন, আল্লাহ্ বলেছেন–

وَإِمَّا يَنْـــزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ إِنَّهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ-

আর যদি শয়তানের প্ররোচনা তোমাকে প্ররোচিত করে, তাহলে আল্লাহ্র কাছে পানাহ চাও। -(সূরা আল-আ'রাফ : ২০০)

'আউযুবিল্লাহি মিনাশ্শাইতানির রাজীম' পুরোটা পড়বে। কারণ, আল্লাহ্র কাছে পানাহ চাওয়ার জন্য এটা পরিপূর্ণ বাক্য। এটা করতে পারলে 'ইনশাআল্লাহ্ গোস্বা পানি হয়ে যাবে। আজ থেকে এর অনুশীলন করার চেষ্টা করবে।

গোস্বার সময় বসে পড় বা শুয়ে পড়

গোস্বার সময় দ্বিতীয়ত তা-ই কর, যা নবী করীম (সা.) আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন। মনোবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকেও এটি চমৎকার ও বিস্ময়কর। তিনি বলেছেন, 'যখন গোস্বা আসবে, তখন দাঁড়ানো অবস্থায় থাকলে বসে পড়বে, বসা অবস্থায় থাকলে শুয়ে পড়বে।' এর কারণ হলো, গোস্বার কারণে মানুষের মস্তিষ্ক স্ফীত হয়ে ওঠে। তাই সে শোয়া থাকলে বসে যায়। বসা থাকলে দাঁড়িয়ে যায়। সুতরাং এর চিকিৎসা হলো, গোস্বায় তাড়িত না হয়ে তাকে দলিত করা। আর এটা উল্টো মোড়েই হওয়াটাই যুক্তিযুক্ত। (আবু দাউদ, কিতাবুল আদব)

এক হাদীসে এসেছে গোস্বার সময় ঠাণ্ডা পানি পান করো। এটাও ফলদায়ক।

গোস্বার সময় আল্লাহ্র কুদরত সম্পর্কে ভাবো

আল্লাহ্র কুদরত নিয়ে ভাবা- এটাও গোস্বার এক প্রকার চিকিৎসা। এভাবে ভাববে যে, আমি যেমনিভাবে ক্ষেপে গিয়েছি, অনুরূপ যদি আল্লাহ্ আমার উপর গোস্বা করেন, তবে আমার উপায়টা কী হবে? হাদীস শরীফে এসেছে, একবার রাসূলুল্লাহ (সা.) কোথাও যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে দেখতে পেলেন, হযরত আবুবকর (রা.) নিজের গোলামকে বকাঝকা করছেন। তখন তিনি তাঁকে উদ্দেশ করে বললেন- لله اقدر عليه منك عليه 'জেনে রাখুন, তোমার যতটুকু কর্তৃত্ব এ গোলামের উপর রয়েছে, তার চেয়ে অধিক কর্তৃত্ব তোমার উপর আল্লাহ তাআলার রয়েছে। আপনি নিজের কর্তৃত্ব এই গোলামের উপর ঝেড়ে নিচ্ছেন, আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে আপনার উপরও তা করতে পারেন।

আল্লাহ্র ধৈর্যগুণ

আল্লাহ্র ধৈর্যগুণ দেখুন, মানুষ তাঁর নাফরমানি প্রকাশ্যে করে বেড়াচ্ছে। কুফরি করছে, শিরক করছে, এমনকি তাঁর অস্তিত্বকে অস্বীকার করছে। এরপরেও তিনি তাদের সকলকে রিযিক দান করছেন। বরং ক্ষেত্রবিশেষে সম্পদের প্রাচুর্য দিয়ে ভরে দিচ্ছেন। এত মহানুভব তিনি! তাই রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, تخلقوا باخلاق الله আল্লাহ্র চরিত্রগুণে সমৃদ্ধ হওয়া। ভাবো, আল্লাহ্ তাঁর এসব বান্দার উপর গোস্বা দেখাচ্ছেন না, আমার উপরও তিনি এটি প্রয়োগ করছেন না। সুতরাং আমি কীভাবে নিজের অধীনদের উপর গোস্বা দেখাবো!

হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রা.) যখন গোলামকে ধমকালেন

অপর এক হাদীসে এসেছে, একবার রাসূলুল্লাহ (সা.) দেখলেন, হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রা.) নিজের গোলামকে মন্দ বলছেন। তখন তিনি তাঁকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন-

لَعَّانِيْنَ وَصِدِّيْقِيْنَ كَلَّاوَرَبِّ الْكَعْبَةِ -

অর্থাৎ- আপনি গোলামের উপর রেগে গেলেন! তাকে তিরস্কার করছেন, ধমকাচ্ছেন! এরপরেও 'সিদ্দীক' বনে যাবেন? কা'বার প্রভুর কসম! মোটেও নয়, সিদ্দীকী মর্যাদা আর বর্তমান এ আচরণ একত্র হতে পারে না।

রাসূলুল্লাহ (সা.) এভাবে হযরত আবু বকর (রা.)-কে গোস্বা থেকে ফিরিয়ে আনলেন। মোটকথা, কুরআন-হাদীসে গোস্বা দমানোর একাধিক চিকিৎসা বিবৃত হয়েছে। আমরা এগুলোর উপর আমল করতে পারি।

প্রথমে গোস্বাকে সম্পূর্ণরূপে মিটিয়ে দাও

আত্মশুদ্ধির কথা ভাবছেন? নিজেকে সংশোধন করার ইচ্ছা করেছেন? তাহলে সর্বপ্রথম গোস্বাকে শেষ করে ফেলুন। অর্থাৎ- গোস্বার জায়েয ক্ষেত্র এবং নাজায়েয ক্ষেত্র যেহেতু আপনার জানা নেই, যেহেতু এ পথে আপনি এক নবীন মুসাফির, তাই শুরুতে গোস্বার উপর আঘাত হানুন। জায়েয ক্ষেত্র ও নাজায়েয ক্ষেত্র আপাতত খুঁজবেন না। বরং সবখানেই গোস্বা থেকে বিরত থাকুন। তাহলে এভাবেই আপনার গোস্বার মাঝে ভারসাম্য আসবে। একটা সময় আসবে, গোস্বাকে 'ইনশাআল্লাহ্' জায়েয ক্ষেত্রে ব্যবহার করতে সক্ষম হবেন।

প্রয়োজনীয় স্থানে রাগ দেখানোর যোগ্যতা এবং অপ্রয়োজনীয় স্থানে ফেটে পড়ার বাতুলতা থেকে রক্ষা পাওয়ার পথ তখন আপনি পেয়ে যাবেন।

গোস্বার মাঝে ভারসাম্যতা

অনেক সময় ক্ষোভ প্রকাশেরও প্রয়োজন দেখা দেয়। যেমন– পিতা ছেলের ভালোর জন্য, ওস্তাদ শাগরেদের কল্যাণের জন্য এবং পীর সাহেব মুরিদকে শোধরানোর জন্য প্রয়োজনে গোস্বা করতে হয়। তখন লক্ষ্য রাখতে হবে, গোস্বাটা যেন সীমা অতিক্রম করতে না পারে। কারণ, গোস্বার মাঝে ভারসাম্য বজায় না রাখলে গুনাহগার হওয়ার সম্ভাবনা আছে। নিজের স্বার্থ ও মনের কামনা জড়িত হয়ে তখন গোস্বা হয়ে যাবে বরকতশূন্য।

আল্লাহ্ওয়ালাদের বিচিত্র মেজাজ

অধিকাংশ বুযুর্গ কোমল হৃদয়ের হয়ে থাকেন। তাঁরা নিজের মুরিদদেরকে স্নেহমাখা দীক্ষা দেন। দরদঝরা কথা দিয়ে, স্নেহভরা আচরণ দিয়ে মুরিদদেরকে শুদ্ধ করেন। কিন্তু সব বুযুর্গের মেজাজ এক রকম হয় না। ব্যতিক্রম মেজাজের বুযুর্গের সংখ্যাও কম নয়। এদেরকে বলা হয়, জালালী তবিয়তের বুযুর্গ, ফারুকী মেজাজের ওলি। যেমন– হাকীমুল উম্মত হযরত আশরাফ আলী থানভী (রহ.) সম্পর্কে প্রসিদ্ধ আছে, তিনি ছিলেন জালালী ও ফারুকী। এর অর্থ এটা নয় যে, তাঁরা কারণে– অকারণে মুরিদদের উপর রেগে যেতেন। বরং এর অর্থ হলো, তাঁরা মুরিদদের সংশোধনের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনে রাগ করতেন। তাদের এ রাগ কখনও ভারসাম্য হারাতো না। যতটুকু করার, ততটুকু করতেন। সীমার চেয়ে আগে বাড়তেন না। আর সাধারণ অবস্থায় তাঁরা ধৈর্যগুণে অবিচল থাকতেন।

গোস্বার সময় ধমকাবে না

হযরত থানভী (রহ.) বলতেন, আমি অন্যকেও এ শিক্ষা দিই, নিজেও এর উপর আমল করি যে, যে লোকটি আমার কাছে দীক্ষা নিতে এসেছে, তার উপর তো প্রয়োজনে রাগ করি। কিন্তু যে লোকটি আমার দীক্ষাধীন নয়, তার উপর কখনও রাগ করি না।

তিনি আরো বলতেন, যখন তুমি ক্রুদ্ধ থাকবে এবং মস্তিষ্কে যখন চাপ থাকবে, তখন কাউকে ধমকাবে না, তিরস্কার করবে না। বরং চুপ থাকাই হবে তোমার তখনকার কাজ। তারপর গোস্বা যখন পড়ে যাবে, তখন কৃত্রিম গোস্বা

দেখিয়ে প্রয়োজনে তাকে তিরস্কার করবে। কারণ, কৃত্রিম গোস্বা সীমা ছাড়াবে না, কিন্তু বাস্তব গোস্বা সীমা ছাড়ানোর সম্ভাবনা আছে।

তিনি আরো বলতেন, আলহামদুলিল্লাহ, আমি যখন কাউকে দীক্ষা দিই, সংশোধন করি এবং এ উদ্দেশ্যে যখন তাকে কিছু সাজা দিই, তখন ঠিক সেই মুহূর্তেও আমি মনে করি, তার মর্যাদা আমার চেয়ে বেশি। তবে আমি আল্লাহ্র পক্ষ থেকে এ বিষয়ে দায়িত্ব পেয়েছি বিধায় এমনটি করছি।

তারপর তিনি বিষয়টি বোঝানোর উদ্দেশ্যে একটি উদাহরণ পেশ করে বলেন, যেমন একজন শাহজাদা। কোনো কারণে সে সাজার উপযুক্ত হয়েছে। তাই বাদশাহ জল্লাদকে বললেন, একে বেত লাগাও। এখন জল্লাদ বাদশাহর হুকুম পালন করতে শাহজাদাকে বেত লাগাচ্ছে। কিন্তু সেই একথা ভালো করেই জানে, যাকে আমি আঘাত করছি, সে তো শাহজাদা। আর আমি একজন সাধারণ জল্লাদ। কোথায় সে আর কোথায় আমি! কিন্তু আমি কী-ইবা করতে পারি! বাদশাহর হুকুম তো আমাকে মানতেই হবে।

তারপর তিনি বলেন, সংশোধনের উদ্দেশ্যে যখন কাউকে শাস্তি দিই, তখন ওই সময় মনে-মনে দুআ করতে থাকি যে, হে আল্লাহ্! আমি একে যেভাবে তিরস্কার করছি, ধমকাচ্ছি, আপনি আমাকে আখেরাতে এভাবে ধমকাবেন না। হে আল্লাহ্! কেয়ামতের দিন আমার সঙ্গে এ জাতীয় আচরণ করবেন না। কেননা, আমি যা কিছু করছি, আপনার হুকুম পালনার্থেই করছি।

হযরত থানভী (রহ.)-এর ঘটনা

মরহুম ভাই নিয়াজ সাহেব থানবী (রহ.)-এর খেদমত করেছেন অনেক দিন। থানভী (রহ.)-এর সঙ্গে থানাভবনের খানকাতেই থাকতেন তিনি। থানভী (রহ.)-এর দীর্ঘদিনের সংস্পর্শের ফলে তার তবিয়তে কিছুটা নাজুকতা চলে এসেছিলো। একবারের ঘটনা, কেউ একজন এসে থানবী (রহ.)-এর কাছে বিচার দিলেন যে, নিয়াজ ভাই আমার মুখের উপর কথা বলেছেন। তাছাড়া খানকাতে তিনি হুমকি-ধমকি দিয়ে কথা বলেন। এতে থানভী (রহ.) বিচলিত হলেন। ভাবলেন, খানকায় আগন্তুকদের সঙ্গে খিটখিটে ভাব নিয়ে কথা বলা তো মোটেও উচিত নয়। তাই নিয়াজকে ডেকে বললেন, মিয়া নিয়াজ! এটা কেমন কথা, তুমি খানকায় লোকদেরকে ধমকের সুরে কথা বলো। ভাই নিয়াজের মুখ ফসকে তখন বের হয়ে গেলো, হযরত! মিথ্যা বলবেন না, আল্লাহ্কে ভয় করুন। আসলে ভাই নিয়াজ বলতে চেয়েছিলেন, আপনার কাছে যারা আমার

ব্যাপারে অভিযোগ করেছে, তারা মিথ্যা বলেছে। তারা মিথ্যা না বলে যেন আল্লাহ্‌কে ভয় করে। কিন্তু তার মুখ ফসকে বের হয়ে গিয়েছিলো, মিথ্যা বলবেন না, আল্লাহ্‌কে ভয় করুন। এমন পরিস্থিতিতে চাকর-বাকর তো অধিক শাস্তির উপযুক্ত হয়। কিন্তু হযরত থানভী (রহ.) তার একথা শোনামাত্র দৃষ্টি অবনত করে নিলেন এবং 'আসতাগফিরুল্লাহ' বলতে-বলতে সেখান থেকে চলে গেলেন।

আসলে থানভী (রহ.) মিয়া নিয়াজের কথায় অনুতপ্ত হয়েছিলেন যে, তিনি একতরফা কথা শুনে বিচার করতে চেয়েছেন। অথচ এরকম পরিস্থিতিতে উচিত হলো, উভয় পক্ষের বক্তব্য শোনা। কাজেই এটা তাঁর ঠিক হয়নি। তাই তিনি প্রথমে ইস্তেগফার পড়ে তাওবা করে নিলেন। তারপর সেখান থেকে চলে গেলেন। এবার বলুন, এ ধরনের বুযুর্গ সত্যিই কি জালালী তবিয়তের?

এজন্যই আব্বাজান মুফতী শফী (রহ.) বলতেন, প্রকৃতপক্ষে থানভী (রহ.)-এর দরবারে আমরা স্নেহ আর দরদ ছাড়া কিছুই দেখিনি। হ্যাঁ, সংশোধনের লক্ষ্যে তিনি কাউকে-কাউকে ধমক দিতেন, তিরস্কার করতেন। তবে তখনও অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে করতেন।

গোস্বার বৈধ ক্ষেত্র

গোস্বা করার বৈধ ক্ষেত্র কী? আল্লাহ তাআলার নাফরমানি ও গুনাহ হতে দেখলে রাগ দেখানো হলো গোস্বার প্রথম বৈধ ক্ষেত্র। গুনাহর প্রতি ঘৃণা প্রকাশের জন্য এবং গুনাহকে দূর করার জন্য যতটুকু গোস্বা প্রয়োজন, ততটুকু করা যাবে।

পূর্ণাঙ্গ ঈমানের চারটি নিদর্শন

এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন–

مَنْ اَعْطٰى لِلّٰهِ، وَمَنَعَ لِلّٰهِ، وَاَحَبَّ لِلّٰهِ، وَاَبْغَضَ لِلّٰهِ، فَقَدِ اسْتَكْمَلَ اِيْمَانُهُ — (ترمذى ، ابواب صفة القيامة ، رقم الباب ٦١)

যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র জন্য কাউকে কিছু দেবে, আল্লাহ্‌র জন্য কাউকে কিছু দেয়া থেকে বিরত থাকবে, আল্লাহ্‌র জন্য কাউকে ভালোবাসবে এবং আল্লাহ্‌র জন্য কারো সঙ্গে শত্রুতা পোষণ করবে, তাহলে তার ঈমান পরিপূর্ণ ঈমান। এ হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা.) এমন ব্যক্তির ঈমান পরিপূর্ণ হওয়ার সাক্ষ্য দিয়েছেন।

প্রথম আলামত

আলোচ্য হাদীসে ঈমান পরিপূর্ণ হওয়ার চারটি নিদর্শন বিবৃত হয়েছে। প্রথম নিদর্শন হলো, দেয়ার সময় আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে দেবে। এর ব্যাখ্যা হলো, নেক কাজে খরচ করার সুযোগ এলে তা আল্লাহ্‌র জন্য করতে হবে। মানুষ নিজের প্রয়োজনে খরচ করে। পরিবার-পরিজনের জন্য খরচ করে, দান করে। এসব ক্ষেত্রে আল্লাহ্‌র রাজি-খুশির নিয়ত করা চাই। বিশেষ করে সদকার সময় এ নিয়ত করতে হবে। সদকা করে খোটা দেয়া বা এর মধ্যে লোক দেখানোর উদ্দেশ্য থাকলে তা 'আল্লাহ্‌র জন্য' হবে না।

দ্বিতীয় আলামত

দ্বিতীয় নিদর্শন হলো, খরচ করা থেকে যখন বিরত থাকবে, আল্লাহ্‌র জন্য বিরত থাকবে। যেমন– কোনো ক্ষেত্রে টাকা বাঁচালে, আল্লাহ্‌র জন্য বাঁচাবে। কেননা, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল (সা.) অপচয় থেকে বারণ করেছেন, তাই এ ক্ষেত্রেও 'আল্লাহ্‌র জন্য' অপচয় করেনি– এমন নিয়ত করবে। এটা পরিপূর্ণ ঈমানের দ্বিতীয় আলামত।

তৃতীয় ও চতুর্থ আলামত

তৃতীয় নিদর্শন হলো, কাউকে ভালোবাসলে আল্লাহ্‌র জন্য ভালোবাসবে। যেমন– কোনো আল্লাহ্‌ওয়ালাকে মহব্বত করার পেছনে সাধারণত কোনো স্বার্থ লুকায়িত থাকে না। বরং এর পেছনে দ্বীনী ফায়দা উদ্দেশ্য থাকে। আল্লাহ্‌কে খুশি করার আশা থাকে। সুতরাং এ মুহব্বত শুধু আল্লাহ্‌র জন্য হলো। এটাও ঈমানের আলামত।

চতুর্থ নিদর্শন হলো বিদ্বেষ ও গোস্বাও হবে আল্লাহ্‌র জন্য। ব্যক্তিকে নয়; বরং ব্যক্তির মাঝে বিদ্যমান গুনাহকে ঘৃণা করতে হবে। সুতরাং এটাও গোস্বার এক বৈধ ক্ষেত্র।

এজন্যই বুযুর্গানে দ্বীন একটি সারগর্ভ কথা বলেছেন। কথাটি হলো, ঘৃণা-বিদ্বেষ কাফেরের প্রতি নয় বরং কুফরের প্রতি, গুনাহগারের প্রতি নয় বরং গুনাহের প্রতি। সুতরাং ব্যক্তি গোস্বার পাত্র নয়, বরং তার অন্যায় কাজ হলো গোস্বার পাত্র। ব্যক্তি বেচারা তো গুনাহের রোগী। আর ঘৃণা রোগীর প্রতি হয় না, বরং রোগের প্রতি হয়। কাজেই ব্যক্তি যদি অন্যায় থেকে ফিরে আসে, তাহলে সে আলিঙ্গনযোগ্য অবশ্যই।

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কর্মপদ্ধতি

প্রিয় নবী (সা.)-এর আমল দেখুন। যে লোকটি তাঁর চাচা হযরত হামযা (রা.)-এর কলিজা চিবিয়ে খেয়েছে, তার নাম হিন্দ। ওয়াহশী নামক এক ব্যক্তি তাকে হত্যা করেছে। কিন্তু হিন্দ ও ওয়াহশী ইসলাম গ্রহণের পর হয়ে গিয়েছে সাহাবী– রাযিয়াল্লাহু আনহুমা। হিন্দ এখন মুসলিম বোন আর ওয়াহশী মুসলমান ভাই। কারণ, হিন্দ আর ওয়াহশীর ব্যক্তিসত্তার প্রতি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কোনো বিদ্বেষ ছিলো না। বিদ্বেষ ছিলো তাদের কুফরের প্রতি।

খাজা নিজামুদ্দীন আওলিয়া (রহ.)-এর ঘটনা

সমকালের এক বুযুর্গের নাম হযরত খাজা নিজামুদ্দীন আওলিয়া (রহ.)। তাঁরই ঘটনা। তাঁর যুগে একজন আলেম ও ফকিহ ছিলেন মাওলানা জিয়া উদ্দীন (রহ.)। খাজা নিজামুদ্দীন (রহ.) 'সুফী' হিসেবে বেশি প্রসিদ্ধ ছিলেন। আর তাঁর যুগের এ প্রসিদ্ধ আলেম 'মুফতী' ও 'ফকিহ' হিসাবে বেশি প্রসিদ্ধ ছিলেন। খাজা সাহেব সুর দিয়ে হাম্দ ও নাত পড়াকে জায়েয মনে করতেন। অনেক সুফী মহব্বত ও ভক্তি বাড়ানোর জন্য এরূপ সুরেলা হাম্দ ও নাত গাওয়া জায়েয মনে করে থাকেন। পক্ষান্তরে অনেক ফকিহ ও আলেমের মতে এটা বিদআত। হাকীম মাওলানা জিয়া উদ্দীন (রহ.) নামক এই মাওলানাও এটাকে মনে করতে বিদআত। আর খাজা নিজামুদ্দীন (রহ.) মনে করতেন এটা বিদআত নয় বরং জায়েয।

হাকীম মাওলানা জিয়া উদ্দীন (রহ.) মৃত্যুশয্যায় শায়িত হলেন। খাজা নিজামুদ্দীন (রহ.) তখন তাঁকে দেখতে গেলেন। গিয়ে তিনি হাকীম সাহেবের কাছে ভেতরে আসার অনুমতি প্রার্থনা করলেন। ভেতর থেকে হাকীম সাহেব উত্তর দিলেন, আপনার জন্য ভেতরে আসার অনুমতি নেই। কারণ, আমি কোনো বিদআতির মুখ দেখে মরতে চাই না। খাজা নিজামুদ্দীন (রহ.) তখন প্রতিউত্তরে বললেন, হযরত! বিদআতি বিদআত থেকে তাওবা করার জন্য আপনার কাছে এসেছে।

একথা শুনে হাকীম সাহেব খাজা সাহেবের নিজের পাগড়ি পাঠিয়ে দিয়ে বললেন, খাজা সাহেবকে বলো, তিনি যেন এ পাগড়ি বিছিয়ে জুতা পায়ে দিয়ে পাগড়ির উপর দিয়ে আসেন। খালিপায়ে যেন না আসেন। খাজা সাহেব বাহকের হাত থেকে পাগড়িটি নিলেন এবং মাথার উপর রাখলেন। বললেন, এটা আমার দস্তারবন্দি। আমার জন্য এটাকে আমি সৌভাগ্যের বস্তু মনে করি। অবশেষে এভাবেই তিনি ভেতরে এলেন। হাকীম সাহেবের সঙ্গে সালাম-মুসাফাহা ও কৌশল বিনিময় করলেন। কিছুক্ষণ সেখানে বসলেন। ইত্যবসরে খাজা সাহেবের উপস্থিতিতেই হাকীম জিয়া উদ্দীন (রহ.) ইন্তেকাল করলেন। খাজা সাহেব (রহ.) মন্তব্য করলেন, হাকীম জিয়া উদ্দীনকে আল্লাহ্ কবুল করেছেন। তিনি তাঁকে মর্যাদাবান করে নিজের কাছে নিয়ে গিয়েছেন।

এ ছিলো আমাদের বুযুর্গদের নমুনা। তাঁদের গোস্বা-ভালোবাসা সব আল্লাহ্র জন্যই হতো।

হযরত আলী (রা.)-এর গোস্বা

হযরত আলী (রা.)-এর একটি ঘটনা। এক ইহুদী একবার রাসূলুল্লাহ (সা.) সম্পর্কে কটূক্তি করে বসলো। আলী (রা.) তা শুনে ফেললেন। তিনি ইহুদীকে আছাড় দিয়ে তার বুকের উপর উঠে বসলেন। পালাবার পথ না পেয়ে ইহুদী আলী (রা.)-এর মুখে থুতু মেরে বসলো। এ অবস্থার সম্মুখীন হয়ে আলী (রা.) সঙ্গে-সঙ্গে ইহুদীকে ছেড়ে দিয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন। জিজ্ঞেস করা হলো, 'আপনি এ কী করলেন? ইহুদী তো আপনার সঙ্গে দ্বিগুণ হঠকারিতা দেখিয়েছে। উচিত তো ছিলো তাকে ভালোভাবে মারধর করা।' তিনি উত্তর দিলেন, ব্যাপার হচ্ছে, ইহুদী যখন আমার প্রিয় নবী (সা.) সম্পর্কে কটূক্তি করেছিলো, তখন তাকে শাস্তি দিয়েছিলাম নবীজী (সা.)-এর শানে গোস্তাখি করার কারণে। তখনকার গোস্বা আমার নিজস্ব স্বার্থসিদ্ধির জন্য ছিলো না। বরং ছিলো রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সম্মান রক্ষার নিমিত্তে। কিন্তু যখন সে আমাকে থুতু মারলো, তখন আমার ক্ষিপ্ততার মাঝে নিজের স্বার্থও জড়িত হয়ে গিয়েছিলো। নিজের জন্য প্রতিশোধ নেয়ার মানসিকতা আমার মাঝে চলে এসেছিলো। তখন আমি ভাবলাম, নিজের স্বার্থে আঘাত এলে প্রতিশোধ নেয়া ভালো নয়। নবীজী (সা.)-এর আদর্শ তো এমন ছিলো না, তিনি নিজের জন্য কারো থেকে প্রতিশোধ নেননি। তাই তাকে মুক্তি দিয়ে দিলাম। একেই বলে ভারসাম্যপূর্ণ গোস্বা। যৌক্তিক কারণে ক্ষুব্ধ হলেন, আবার প্রয়োজনের মুহূর্তে গোস্বাকে নিয়ন্ত্রণ করে নিলেন। ইহুদীকেও ছেড়ে দিলেন। এদের সম্পর্কেও বলা হয়েছে– كَانَ وَقَّافًا عِنْدَ حُدُوْدِ اللهِ 'আল্লাহ্র সীমানার সামনে তারা নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করে নিতেন।

হযরত উমর (রা.)-এর ঘটনা

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর চাচা আব্বাস (রা.)-এর 'পরনালা' সংক্রান্ত তার একটি ঘটনা প্রসিদ্ধ আছে। আব্বাস (রা.)-এর বাড়ি ছিলো মসজিদে নববীর

সঙ্গে লাগোয়া। বাড়ির একটি পরনালার মাথা মসজিদে নববীর আঙ্গিনায় এসে পড়তো। একবার ওই পরনালার উপর হযরত উমর (রা.)-এর দৃষ্টি পড়লে তিনি লক্ষ্য করলেন, পরনালাটি মসজিদের সঙ্গে এসে পড়েছে।

তিনি লোকদের জিজ্ঞেস করলেন, এই পরনালাটি কার? লোকেরা জানালো, এটি আব্বাস (রা.)-এর। তিনি ভেঙ্গে ফেলার নির্দেশ দিলেন। কারণ, মসজিদের দিকে পরনালা বের করা জায়েয নয়। ঘটনাটা যখন আব্বাস (রা.) জানতে পারলেন, তিনি উমর (রা.)-এর খেদমতে এসে বললেন, আপনি এ কী করলেন?

উমর (রা.) উত্তর দিলেন, এ পরনালা যেহেতু মসজিদে-নববীর সীমানায় এসে পড়েছে, তাই আমি তা ফেলে দিয়েছি। আব্বাস (রা.) বললেন, পরনালাটি তো আমি নবী কারীম (সা.)-এর অনুমতি নিয়েই লাগিয়েছিলাম। একথা শুনে হযরত উমর (রা.) বিচলিত হয়ে পড়লেন, বললেন, আপনি আমার সঙ্গে চলুন। উভয়ে যখন মসজিদে-নববীতে পৌছুলেন, উমর (রা.) রুকুর মতো ঝুকে গেলেন এবং বললেন, হে আব্বাস! আল্লাহ্র দোহাই, আমার পিঠের উপর দাঁড়িয়ে পরনালাটা পুনরায় লাগিয়ে দিন। কারণ, রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর অনুমতি নিয়ে লাগানো পরনালা ভেঙ্গে দেয়ার মতো অধিকার খাত্তাবের পুত্রের নেই। আব্বাস (রা.) বললেন, থাক, আমিই লাগিয়ে নেবো। কিন্তু হযরত উমর (রা.) বললেন, না, যেহেতু ভেঙ্গেছি আমি, তাই এর শাস্তি আমাকেই ভোগ করতে হবে। অবশেষে আব্বাস (রা.) বাধ্য হয়ে উমর (রা.)-এর পিঠের উপর দাঁড়িয়ে পরনালাটা আবার লাগিয়ে দিলেন। মসজিদে-নববীর ওই দিকটায় আজও পরনালাটি আছে।

আল্লাহ তাআলা ওইসব মনীষীকে উত্তম প্রতিদান দিন, যারা পরনালাটিকে আজও অক্ষত রেখেছেন। নির্মাণকালে সেটিকে তারা সেখানেই লাগিয়ে দিয়েছেন। যদিও পরনালাটি বর্তমানে আর ব্যবহৃত হচ্ছে না। কিন্তু স্মরণীয় করে রাখার জন্যই তাঁরা এমনটি করেছেন।

ঘটনাটি প্রকৃতপক্ষে আলোচ্য হাদীসেরই জ্বলন্ত উদাহরণ। গোস্বা করেছে আল্লাহ্র জন্য; আবার গোস্বাকে পানি করে দিয়েছে আল্লাহ্র জন্যই। এরাই তো পরিপূর্ণ মুমিন।

কৃত্রিম গোস্বা দেখিয়ে শাসাবে

মোটকথা, 'বুগ্য ফিল্লাহ' তথা আল্লাহ্র জন্য বিদ্বেষ প্রকাশার্থে মাঝে-মাঝে গোস্বা দেখাতে হয়। বিশেষভাবে যারা দীক্ষা নিচ্ছে, তাদের উপর এ গোস্বা দেখাতে হয়। যেমন ওস্তাদ ছাত্রের উপর, পিতা সন্তানের উপর, পীর সাহেব

মুরিদদের উপর গোস্বা দেখানোর প্রয়োজন হতে পারে। তখন এ গোস্বাকে রাখতে হবে সীমার ভেতরে। যতটুকুতে তারা সংশোধন হবে, শুধু ততটুকু গোস্বা দেখানোর সুযোগ আছে। একটু পূর্বে বলেছিলাম, এজন্য মেজাজ যখন চড়া থাকবে, তখন তা প্রকাশ না করে পরবর্তীতে যখন মেজাজ ঠাণ্ডা হবে তখন কৃত্রিমভাবে তা প্রয়োজন মতো প্রকাশ করলে গোস্বা সীমা ছাড়িয়ে যাবে না। এটা অবশ্য একটু কঠিন। কিন্তু এর অনুশীলন তো করতে হবে। অন্যথায় গোস্বা বিপর্যয় ডেকে আনার আশঙ্কা থেকে যাবে।

ছোটদের উপর বাড়াবাড়ির পরিণাম

গোস্বার পাত্র যদি গোস্বাকারীর তুলনায় বড় হয় বা কমপক্ষে যদি সমান হয়, তখন সাধারণ গোস্বার পাত্র ব্যক্তিই এর এ্যাকশন প্রকাশ করে দেয়। ফলে গোস্বাকারী বুঝতে পারে যে, আমার গোস্বার কারণে অমুকে মনে কষ্ট নিয়েছে। এর কারণে মাফ চাওয়ার সুযোগ আছে। কিন্তু গোস্বার পাত্র ব্যক্তিটি গোস্বাকারীর তুলনায় ছোট হয়। যেমন উস্তাদ শাগরেদের উপর বা পিতা সন্তানের উপর গোস্বা করলে সাধারণত তারা চুপ করে থাকে। তখন তারা নিজেদের মনোঃকষ্ট প্রকাশ করতে পারে না। ফলে গোস্বাকারীর কাছে এটা অবোধগম্য থেকে যায় যে, তার গোস্বার কারণে অমুকে মনে কষ্ট নিয়েছে কিনা? যার কারণে পরবর্তীতে মাফ চেয়ে নেয়ারও সুযোগ থাকে। এজন্য বিষয়টা খুবই নাজুক। বিশেষ করে যারা ছোট শিশুদেরকে পড়ান, তাদের জন্য ব্যাপারটা আরও নাজুক। কারণ, নাবালেগ শিশু মাফ করলেও মাফ হয় না। তাদের ক্ষমা করার কোনো বিবেচনা ইসলাম করে না। সুতরাং হযরত থানভী (রহ.) বলেন, এ ক্ষেত্রে বিষয়টা বেশি স্পর্শকাতর বিধায় সর্বোচ্চ সতর্কতা জরুরি।

সারকথা

আজকে আলোচনার সারকথা হলো, গোস্বাকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে। কেননা, গোস্বা অসংখ্য বিপর্যয়ের প্রজননতন্ত্র। এর কারণে অসংখ্যক আত্মিক ব্যাধি জন্ম নেয়। কাজেই শুরুতে গোস্বাকে একেবারে মিটিয়ে দেয়ার অনুশীলন করতে হবে। এমনকি বৈধ ক্ষেত্রেও গোস্বা না করার চেষ্টা করতে হবে। এ ধাপ অতিক্রম করার পর বৈধ-অবৈধ ক্ষেত্র বিবেচনা করে গোস্বা করতে হবে। সর্বাবস্থায় লক্ষ্য রাখতে হবে, গোস্বা যেন সীমা ছাড়িয়ে না যায়।

গোস্বার অবৈধ ব্যবহার

আল্লাহ্র জন্য গোস্বা করা চাই। কিন্তু অনেক সময় এ ক্ষেত্রেও আমরা গোস্বার অপব্যবহার করি। যেমন মুখে তো বলি, গোস্বাটা আল্লাহ্র জন্য করেছি; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আমার গোস্বা দ্বারা উদ্দেশ্য নিজের আমিত্ব ও অহঙ্কার চরিতার্থ করা এবং অপরকে তুচ্ছ হিসাবে তুলে ধরা। যেমন– দ্বীনের পথে যারা নবীন, তাদের ক্ষেত্রে এমনটি বেশি হয়। দ্বীনের উপর যখন চলা শুরু করে, তখন অনেক সময় তারা ঘরের সবাইকে, নিজের বাবাকে, মাকে, ভাইকে, বোনকে মনে করে এরা সবাই জাহান্নামি আর আমিই একা শুধু জান্নাতি। এদের সবার সংশোধনের দায়িত্ব আমার। এরূপ চেতনা নিয়ে তাদেরকে যখন-তখন ধমকায়, শাসায়, কটু কথা বলে– এভাবে তাদের অধিকারকে আহত করে। আর শয়তান তখন তাকে এই সবক দিয়ে রাখে যে, এরা সবাই নষ্ট হয়ে গেছে। কাজেই তুমি যা কিছু করছ, সবই 'বুগয্ফিল্লাহ' তথা আল্লাহ্র জন্যই করছো। মূলত এটা নিজের মনের কামনা চরিতার্থ করারই এক নিকেল রূপ। যার ফলে সংশোধনের পথ তো সৃষ্টি হয়ই না; উপরন্তু বিশৃঙ্খলা ও ফ্যাসাদের জন্ম হয়।

আল্লামা শাব্বীর আহমদ উসমানী (রহ.)-এর একটি চমৎকার বাক্য

এ প্রসঙ্গে হৃদয়ে গেঁথে রাখার মতো একটি চমৎকার বাক্য বলেছেন হযরত মাওলানা শাব্বীর আহমদ উসমানী (রহ.)। তিনি বলতেন, হক কথা হক নিয়তে, হক তরিকায় বললে অবশ্যই এর ফল শুভ হয়। তখন ফেতনা-ফ্যাসাদ সৃষ্টি হওয়ার অবকাশ থাকে না।

তাঁর এ ইঙ্গিতে আমরা দাওয়াতের কাজের জন্য মূলত তিনটি শর্ত পেলাম। প্রথমত, হক বলতে হবে। দ্বিতীয়ত, নিয়ত হক হতে হবে। তৃতীয়ত, তরিকা হক হতে হবে। যেমন খারাপ কাজে লিপ্ত ব্যক্তিকে দরদমাখা হৃদয় নিয়ে, সুন্দর ও কোমলভাবে যদি বোঝানো হয়, তাহলে এ তিনটি শর্ত পাওয়া গেছে বলে ধরে নেয়া হবে। তখন ফেতনা সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনাও কম থকবে। পক্ষান্তরে যেখানে দেখবে যে, হক কথা বলার কারণে ফেতনা সৃষ্টি হয়েছে, সেখানে প্রবল সম্ভাবনা এটাই ধরা হবে যে, উক্ত তিনটি শর্তের যে কোনো শর্ত লঙ্ঘিত হয়েছে।

তোমরা পুলিশ নও

তোমরা সৈনিক হয়ে এ পৃথিবীতে আসোনি। তোমাদের দায়িত্ব হলো, হক কথা হক নিয়তে হক তরীকায় মানুষের সামনে তুলে ধরা। এটা করতে গিয়ে কখনও হিম্মতহারা না হওয়া। এ তিনটি শর্ত পূরণ করে নিরবিচ্ছিন্নভাবে কাজ চালিয়ে যাও, দেখবে, ফেতনা সৃষ্টি হবে না। এগুলোর উপস্থিতি না থাকলে তখনই সৃষ্টি হয় নানা রকম ফেতনা।

আল্লাহ তাআলা দয়া করে আমাদেরকে এ কথাগুলো সঠিকভাবে অনুধাবন করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ -

মুমিন মুমিনের আয়না

"দোষী ব্যক্তি রোগীর মতো। রোগীর রোগের কারণে মানুষ তার উপর ক্ষোভ দেখায় না; বরং তার জন্য ব্যথিত হয়, আফসোস করে। অনুরূপভাবে কাউকে দোষ করতে দেখলে, গুনাহে লিপ্ত দেখলে তার উপর চটে না গিয়ে বরং তার জন্য ব্যথিত হতে হবে। দরদপূর্ণ হৃদয় নিয়ে, হৃদয়ছোঁয়া ভাষা দিয়ে, অত্যন্ত কোমলভাবে তার দোষটি ধরিয়ে দিতে হবে। তখনি সে সংশোধনের পথে অগ্রসর হওয়ার জন্য আগ্রহী হবে। মনে রাখবেন, অপরের মান-সম্মান নিয়ে মিছিমিছি খেলার অনুমতি ইসলামে কখনও নেই।"

মুমিন মুমিনের আয়না

اَلْحَمْدُ لله نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْه، وَنَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّاٰتِ اَعْمَالِنَا، مَنْ يَّهْدِهِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلاَ هَادِىَ لَهُ، وَاَشْهَدُ اَنْ لاَّ إِلٰهَ اِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، وَاَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَسَنَدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلاَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ .... صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا — اَمَّا بَعْدُ :

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اَلْمُؤْمِنُ مِرْآةُ الْمُؤْمِنِ — (ابو داود ، كتاب الادب ، باب فى النصيحه)

হামদ ও সালাতের পর

হযরত আবু হোরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন, 'মুমিন মুমিনের আয়না'।

হাদীসটি শব্দশরীরের দিক থেকে যদিও সংক্ষিপ্ত, শুধু তিনটি শব্দ সম্বলিত, কিন্তু মর্মার্থের দিক থেকে অত্যন্ত সারগর্ভ। শিক্ষার এক বিশাল জগত এ ছোট্ট হাদীসটিতে লুকায়িত। হাদীসের মর্মার্থ হলো, আয়না যেমন দর্শককে বলে দেয় তার চেহারার দাগ-চিহ্নের কথা, চেহার ময়লা থাকলে নীরবে সে জানিয়ে দেয়। সৌন্দর্য থাকলেও তা প্রকাশ করে দেয়। অনুরূপভাবে একজন মুমিন যখন দেখবে তার অপর ভাইয়ের মাঝে দোষ আছে, তখন সে তাকে তা ধরিয়ে দিবে, ফলে দোষী মুমিন নিজেকে শোধরানোর কাজে লেগে যেতে সক্ষম হবে।

সে তোমার উপরকারী বন্ধু

এ হাদীসের মধ্যে উভয়ের জন্য শিক্ষা রয়েছে। যে ভুল ধরিয়ে দেয় তার জন্য এবং যার ভুল ধরা হয় তার জন্যও। যে ভুলটি ধরা হয়েছে, সেই ভুলটি শোধরে নেয়াই কাম্য। যিনি ভুল ধরেছেন, তার উপর মনে কষ্ট নেয়া উচিত নয়। এটাই এ হাদীসের শিক্ষা। এজন্যই এক মুমিনকে অপর মুমিনের জন্য আয়না বলা হয়েছে। উপমাটা এখানে আয়নার সঙ্গে দেয়া হয়েছে। আয়নার সামনে দণ্ডায়মান ব্যক্তিটিকে 'আয়না' তার চেহারার দাগের কথা বলে, এতে সে খুশি হয়, অসন্তুষ্ট হয় না। দাগ মোছার সুযোগ পেয়ে সে আয়নাকে মনে করে উপকারী বস্তু। অনুরূপভাবে একজন মুমিন যখন অপর মুমিন ভাইয়ের দোষ ধরিয়ে দেবে, তখন দোষ কেন ধরা হয়েছে– এরূপ আপত্তি ও গোস্বা প্রকাশ করা যাবে না। বরং মনে করতে হবে, এ ব্যক্তি তো আমার উপকার করেছে। আমার দোষের কথা বলেছে, এখন আমি শুদ্ধ হওয়ার সুযোগ পাবো। নিজের দোষটা দূর করার চেষ্টা করতে পারবো।

যেসব উলামায়ে কেরাম ভুল ধরেন, তাদের উপর আপত্তি কেন?

বর্তমানে মানুষ উল্টো পথে চলেছে। তারা উলামায়ে কেরামের বিরুদ্ধে আপত্তি তুলছে যে, 'উলামায়ে কেরাম মানুষকে কাফের-ফাসেক বানিয়ে দেয়। কাফের-ফাসেক বিদআতি বানানোর ঠিকাদারি যেন উলামারা নিয়েছে। তারা অহরহ মানুষকে এসব ফতওয়া দিয়ে যাচ্ছে!' উলামায়ে কেরামের বিরুদ্ধে অনেকের এই অভিযোগ বর্তমানে খুব বেশি শোনা যায়।

এর জবাবে হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহ.) বলেন, উলামায়ে কেরাম কাউকে কাফের-ফাসেক বা বিদআতি বানায় না। বরং কেউ কুফরির কাজ করলে তাকে বলে, তুমি কুফরি করেছ। বিদআতিকে বলে, তোমার এ কাজ বিদআত। ফাসেককে বলে, তোমার এ কাজটা কবীরা গুনাহ। আয়না যেমনিভাবে মানুষের চেহারার দাগের কথা বলে দেয়, উলামায়ে কেরামও তেমনিভাবে তোমাদের দোষের কথা বলে দেয়। আয়নাকে তো খারাপ বলো না; বরং উপকারী বলো, কিন্তু উলামায়ে কেরামকে কেন খারাপ বলো? তাদেরকে তো খারাপ না বলে উপকারী বলা উচিত।

চিকিৎসক রোগ ধরিয়ে দেন, রোগী বানান না

যেমন, অনেক সময় রোগী জানে না, তার রোগ কী? তাই সে ডাক্তারের কাছে যায়। ডাক্তার তাকে বলে দেয়, তোমার মাঝে এ রোগ আছে। এজন্য

ডাক্তারকে তো একথা বলা হয় না যে, ডাক্তার অমুককে রোগী বানিয়ে দিয়েছে। বরং রোগীকে বলা হয়, তোমার রোগটা ডাক্তারের কাছে যাওয়ার কারণেই ধরতে পেরেছ। এতদিন তুমি রোগটার ব্যাপারে অজ্ঞ ছিলে। এখন ডাক্তার যখন রোগ ধরে দিয়েছে, সুতরাং চিকিৎসা করো।

একটি উপদেশমূলক ঘটনা

ঘটনাটি আমার আব্বাজানের মুখে শুনেছি। তাঁর নিজের ঘটনা। তিনি বলেন, তখন আমরা দেওবন্দ থাকতাম। আব্বাজানও এখানেই থাকতেন। তিনি অসুস্থ ছিলেন, দিল্লিতে একজন প্রসিদ্ধ হাকিম ছিলেন। অন্ধ ছিলেন, কিন্তু খুবই অভিজ্ঞ ও দূরদর্শী ছিলেন। আব্বাজানের চিকিৎসা তিনিই করতেন। একদিন দেওবন্দ থেকে আমি দিল্লিতে তাঁর দাওয়াতে গেলাম। আব্বাজানের জন্য অষুধ আনার উদ্দেশ্যেই তাঁর কাছে গিয়েছিলাম। তিনি আমার কণ্ঠস্বর শুনে আমাকে চিনে ফেললেন। বললেন, তোমার আব্বার চিকিৎসা পরে করবো, এর আগে ধরো, তোমার জন্য এ অষুধগুলো নাও। সকালে এ পরিমাণ খাবে, সন্ধ্যায় এ পরিমাণ। আমি বললাম, হাকিম সাহেব! আমি তো অসুস্থ নই। অসুস্থ তো আমার আব্বা! তিনি বললেন, তোমার আব্বার অসুধও দিচ্ছি। আর তোমার অষুধটা যেভাবে যখন খেতে বলেছি, সেভাবে খাবে। হাকিম সাহেবের কর্মকাণ্ড দেখে আমি তো অবাক!

বাড়িতে এসে আব্বাজানের কাছে বিস্তারিত জানালাম। আব্বাজান বললেন, হাকিম সাহেব যেভাবে বলেছে, সেভাবে করো।

এক সপ্তাহ পর আব্বাজানের অষুধের জন্য পুনরায় দিল্লিতে গেলাম। এবার হাকিম সাহেব আমার কণ্ঠস্বর শুনে বললেন, গত সপ্তাহে যখন তুমি এসেছিলে, তোমার কণ্ঠস্বর শুনেই আমি বুঝে ফেলেছি, তোমার ফুসফুসে সমস্যা আছে। আশঙ্কা ছিলো, এটা টি.বি-রোগের দিকে চলে যায় কিনা? এজন্য তোমার অষুধ দিয়েছিলাম। এখন 'আলহামদুলিল্লাহ' তুমি সুস্থ। আশঙ্কাটাও কেটে গেছে।

দেখুন, আমার আব্বাজান অসুস্থ ছিলেন, অথচ তিনি তা জানতেন না। ডাক্তার তা ঠিকই ধরে ফেলেছেন। এটা তো রোগীর উপর ডাক্তারের দয়া। ডাক্তার রোগী বানিয়েছেন– এ জাতীয় কথা তো এখানে বলা হয় না। এর জন্য ডাক্তারের উপর কেউ চটেও যায় না। বরং আরও খুশি হয় এবং নিজের রোগের ব্যাপারে সতর্ক হয় এবং চিকিৎসা করে।

যিনি রোগ ধরিয়ে দেন, তার উপর অসন্তুষ্ট হওয়া উচিত নয়

অবশ্য রোগের কথা যিনি বলেন, তাঁর বলার ধরনেও ভিন্নতা আছে। কেউ আপত্তিকর পদ্ধতিতে বলে দেন যে, তোমার মাঝে এ দোষ আছে। আর কেউবা সুন্দর ও সঙ্গত পদ্ধতিতে বলেন। যিনি আপত্তিকর অবস্থায় বলে দেন, তার উপরও অসন্তুষ্ট হওয়া উচিত নয়। কারণ, যদিও তার বলার ধরন ছিলো অসন্তোষজনক, তবুও তো তিনি আপনার রোগের কথাই বলেছেন। এজন্য উচিত তার উপর অসন্তুষ্ট না হওয়া। আরবী ভাষায় এ ব্যাপারে একটি চমৎকার কবিতা রয়েছে। যার মর্মার্থ অনেকটা এরকম যে, আমার দোষ-ত্রুটির হাদিয়া যে আমার সামনে রাখবে, সেই আমার সবচে' উপকারী বন্ধু। পক্ষান্তরে 'তুমি এমন', 'তুমি তেমন' মার্কা প্রশংসাবাক্য যে আমাকে শোনাবে, সে আমার অপকারী। কেননা, তার প্রশংসাবাক্যের কারণে আমার মাঝে সৃষ্টি হয় অহঙ্কার ও আত্মপ্রবঞ্চনা।

অপরের দোষ-ত্রুটির কথা সঙ্গত পদ্ধতিতে বলতে হবে

আলোচ্য হাদীসে আরেকটি শিক্ষাও রয়েছে। তাহলো, যিনি দোষ ধরেন, তাকে আয়নার সঙ্গে তুলনা দেয়া হয়েছে। আয়নার কাজ হলো, দর্শককে তার মুখের দাগ সম্পর্কে অবহিত করে দেয়া যে, তোমার মুখে অমুক জায়গায় এতটুকু দাগ রয়েছে। এ ক্ষেত্রে যতটুকু দাগ থাকে, আয়না ঠিক ততটুকুর কথাই বলে। সে বাড়িয়ে বলে না এবং দর্শনার্থীকে এ বলে বকাঝকাও দেয় না যে, তুমি দাগটা কোত্থেকে লাগিয়েছ? বরং আয়না শুধু বিদ্যমান দাগের কথাই বলে এবং নীরবে বলে। অনুরূপভাবে একজন মুমিন যখন অপর মুমিনের দোষের কথা বলবে, তখন শুধু তাকেই বলবে, যতটুকু দোষ আছে ততটুকুর কথাই বলবে। এ নিয়ে সে হইচই করবে না। অন্যদের সামনে মাতামাতি করবে না এবং দোষকে নুন-মরিচ লাগিয়ে বাড়িয়ে সে বলবে না। এটাই আয়নাসদৃশ মুমিনের চরিত্র। দোষী ব্যক্তিকে বকাঝকা করা, তার দোষের কথা মানুষের সামনে বলা বা এ নিয়ে মাতামাতি করা আয়নাসৃদশ মুমিনের চরিত্র হতে পারে না।

দোষী ব্যক্তির জন্য ব্যথিত হও

দোষী ব্যক্তি তো রোগীর মতো। রোগীর রোগের কারণে মানুষ তাকে বকাঝকা করে না। তার উপর গোস্বা হয় না; বরং তার জন্য ব্যথিত হয়, আফসোস করে। অনুরূপভাবে কাউকে ভুল করতে দেখলে বা গুনাহে লিপ্ত

দেখলে তার উপর গোস্বা না হয়ে তার জন্য ব্যথিত হতে হবে। দরদমাখা হৃদয় নিয়ে তার সঙ্গে কথা বলতে হবে। অত্যন্ত কোমল ভাষায় তার দোষটি ধরিয়ে দিতে হবে। তখনই সে সংশোধনের পথে অগ্রসর হওয়ার জন্য আগ্রহী হবে।

ভুলকারীর মর্যাদাহানি যেন না হয়

অপর মুমিন ভাইকে ভুলে লিপ্ত দেখলে, এ সম্পর্কে তাকে সতর্ক করা একজন মুমিনের কর্তব্য। বর্তমানে আমরা এ কর্তব্যের কথা ভুলে বসেছি। অথচ এক মুসলমান ভুলভাবে নামায পড়লে, অপর মুসলমান বিষয়টি টের পেলে, তাকে এ ভুলের কথা বলে দেয়া আবশ্যক। কেননা, এটাও 'আমর বিল মারূফ ও নাহী আনিল মুনকার' তথা সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধের অন্তর্ভুক্ত বিধায় এই কর্তব্য পালন করা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরজ। অথচ বিষয়টি নিয়ে আমরা এভাবে কখনও ভেবে দেখিনি। এর অনুভূতিও আমাদের মাঝে নেই। কারো-কারো মাঝে থাকলেও তা এতটাই তীব্র যে, মনে করে, আমি পুলিশ। যার কারণে সে অপরের দোষ ধরিয়ে দেয়ার ইচ্ছায় যখন তার মুখোমুখি হয়, তখন সৈনিকভাব নিয়ে তার দোষের কথা বলে। কণ্ঠটা থাকে প্রতিবাদী। লোকসম্মুখে দোষ ধরিয়ে দেয়। সে তখন অপর মুসলমানের মর্যাদাহানির মত জঘন্য কাণ্ড ঘটিয়ে বসে। অথচ রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, তুমি সৈনিক নও; বরং আয়না। সুতরাং দোষ ধরিয়ে দিতে গেলে ধমকি-হুমকি ভাব তোমার মাঝে থাকতে পারবে না। অপরের মান-সম্মান নিয়ে ছিনিমিনি খেলার অনুমতি ইসলাম তোমাকে দেয়নি। বরং কথা বলবে কোমলভাবে, হৃদয়ছোঁয়া ভাষায়।

হযরত হাসান ও হুসাইন (রা.) এর একটি ঘটনা

হযরত হাসান ও হুসাইন (রা.)। তাঁরা তখন ছোট ছিলেন। একদিন সম্ভবত ফুরাত নদীর তীর ঘেঁষে কোথাও যাচ্ছিলেন। দেখতে পেলেন, একজন বয়স্ক মানুষ অযু করছেন, তবে ভুল পদ্ধতিতে করছেন। তাঁরা ভাবলেন, লোকটির এ ভুলটি ধরিয়ে দেয়া আমাদের দ্বীনী কর্তব্য। কিন্তু বলি কীভাবে? কারণ, আমরা ছোট আর তিনি তো আমাদের চেয়ে বড়। তাই তাঁরা দুজনে পরামর্শ করলেন এবং পরামর্শমতো লোকটির কাছে গেলেন। তার কাছে বসলেন, কথাবার্তা বলতে লাগলেন। এরপর বললেন, আপনি তো আমাদের চেয়ে বড়। আমরা যখন অযু করি, তখন সন্দেহ থেকে যায়, আমাদের অযু সুন্নাত অনুযায়ী হয় কিনা? তাই দয়া করে আমাদের অযুটা একটু দেখুন। সুন্নাত পরিপন্থী হলে আমাদেরকে শিখিয়ে দেবেন। এই বলে দুই ভাই মিলে লোকটির সামনে নিজেরা

কীভাবে অযু করে তা দেখালেন। অযু শেষ করে বললেন, এবার বলুন, আমাদের অযু সুন্নাত পরিপন্থী হয়নি তো? লোকটি ছিলো বিচক্ষণ। তাই সে ব্যাপারটি বুঝে ফেললো এবং বললো, আসলে আমারটাই ভুল ছিলো। তোমাদের অযু থেকে আমি সঠিকটা পেয়ে গিয়েছি। 'ইনশাআল্লাহ্' ভবিষ্যতে আর ভুল করবো না। একেই বলে হেকমত। পবিত্র কুরআনে এ নির্দেশই আল্লাহ তাআলা দিয়েছেন যে–

اُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ

'আল্লাহ্র পথে হেকমতসহ ডাকো।' –(সূরা নহল : ১২৫)

একজনের দোষের কথা অপরজনের কাছে বলবে না

হাকীমুল উম্মত হযরত আশরাফ আলী থানভী (রহ.) আলোচ্য হাদীসের ব্যাখ্যায় একটি মূলনীতির কথা বলেছেন। তা হলো, আয়না দর্শককে নীরবে বলে দেয়, তোমার চেহারায় এ দাগ আছে। লোকটির মাঝে বিদ্যমান দোষটির কথা 'আয়না' অন্যের কাছে প্রকাশ করে না। অনুরূপভাবে যার দোষ ধরবে, শুধু তাকেই বলবে, তোমার মাঝে এ দোষ আছে। এ নিয়ে চর্চা করা, ফিসফাস করা কাম্য নয়। সুতরাং দোষের কথা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে বলতে হবে একান্তে ও নির্জনে।

অপরের দোষ ধরার মাঝে যদি তোমার উদ্দেশ্য হয় যে, এর মাধ্যমে আল্লাহ্কে সন্তুষ্ট করবে, তাহলে অপরের সামনে বলার অপরাধ তোমার দ্বারা অবশ্যই হবে না। কিন্তু এর দ্বারা যদি নিজের স্বার্থ চরিতার্থ করা উদ্দেশ্য হয়, তাহলে অপরের সামনে বলার মত অপরাধ তোমার থেকে প্রকাশ পাবে– এটাই স্বাভাবিক।

আমরা যা করি

বর্তমানে আমরা বিপরীত পথে চলছি। অপরের দোষচর্চা করার মতো কুস্বভাব আমাদের অনেকেরই মাঝে আছে। কল্যাণকামিতার মানসিকতা আজ বিলুপ্তপ্রায়। যার ফলে গীবতের গুনাহ, অপবাদের গুনাহ, বাড়াবাড়ি করে মিথ্যা বলার গুনাহ, অপর ভাইয়ের বদনাম করে বেড়ানোর গুনাহসহ অনেক অপ্রাসঙ্গিক গুনাহর মাঝে আমরা অহরহ জড়িয়ে যাচ্ছি।

ভুল ধরিয়ে দেয়ার পর নিরাশ হয়ো না

আলোচ্য হাদীস থেকে আরেকটি শিক্ষা পাওয়া যায়। তা হলো, একজন দর্শক তার চেহারায় বিদ্যমান দাগ নিয়ে যতবার আয়নার সামনে দাঁড়ায়, আয়না ততবারই বলে দেয়, তোমার চেহারায় এ দাগ আছে। এতে আয়না রাগ হয় না যে, তোমাকে একবার বললাম, তবুও তুমি দাগটা মুছলে না বা সে নিরাশও হয় না যে, লোকটিকে এতবার বললাম, তবুও সে তার দাগটা দূর করলো না। মোটকথা, আয়না দারোগাসুলভ আচরণ কিংবা হতাশাপূর্ণ ভাব তার দর্শককে দেখায় না। বরং সে প্রতিবারই নীরবে দাগটা ধরিয়ে দেয়। সে চটেও যায় না, হতাশও হয় না।

আম্বিয়ায়ে কেরামের কর্মপদ্ধতি

আম্বিয়ায়ে কেরামের কর্মপদ্ধতি ছিল অনুরূপ। তাঁরা নিরাশ হয়ে হাত-পা ছেড়ে বসে পড়তেন না; বরং সুযোগ পেলেই নিজেদের কথা বলতেন। আবার দারোগাসুলভ আচরণও তাঁরা দেখাতেন না। কুরআন মজীদে ইরশাদ হয়েছে– لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ 'হে নবী! আপনাকে দারোগা বানিয়ে পাঠানো হয়নি; বরং আপনার দায়িত্ব হলো, যে ভুল করবে, তাকে ভুলটি ধরিয়ে দেয়া। সতর্ক করে দেয়া এবং আমার কথা পৌছিয়ে দেয়া। যার কাছে পৌছাবেন তার দায়িত্ব হলো, আপনার কথা মানা ও আমল করা। সে যদি আমল না করে, তাহলে পুনরায় আপনি তাকে আপনার কথা বলবেন। প্রয়োজনে বারবার বলবেন। তবুও হতাশ হবেন না বা লোকটি আমার কথা তো শোনেই না– এ জাতীয় ভাব নিয়ে তার উপর অসন্তুষ্ট হবেন না।

উম্মতের জন্য রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর দরদ ও ব্যথা ছিলো অনেক। তাই কাফির-মুশরিকরা তাঁর কথা না মানলে তিনি ব্যথিত হতেন। এ প্রেক্ষিতে কুরআন মজীদের এ আয়াতটি নাযিল হয়–

لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ أَلَّا يَكُوْنُوْا مُؤْمِنِيْنَ –

কাফির-মুশরিকরা ঈমান আনে না, এ দুঃখে মনে হয় আপনি নিজেকে শেষ করে দেবেন। তাদের মানা-না মানা আপনার দায়িত্ব নয়। আপনার দায়িত্ব হলো, আপনি শুধু আপনার কথা বলে যাবেন। –(সূরা শু'আরা : ৩)

কাজটি কার জন্য করেছিলে?

আব্বাজান মুফতী শফী (রহ.) বলতেন, মুবাল্লিগের কাজ হলো নিজের কাজে লেগে থাকা। লোকেরা মানে না বিধায় কাজ ছাড়া যাবে না। নিরাশ হয়ে বা বিরক্ত হয়ে কাজ ছেড়ে দেয়া যাবে না। বরং ভাববে, কাজটি আমি কার জন্য করছি। আল্লাহ্কে সন্তুষ্ট করার জন্যই তো করছি। সুতরাং ভবিষ্যতেও তাঁকেই খুশি করার জন্য করবো। এতে 'ইনশাআল্লাহ্' প্রতিবারই আমি সাওয়াব পাবো।

আমার কথা সে মানবে কি মানবে না– এটার সঙ্গে তো আমার কোনো সম্পর্ক নেই। এটা আল্লাহ্র ব্যাপার। তিনি কাকে হেদায়াত দেবেন আর কাকে দেবেন না– এটা তাঁর ব্যাপার।

পরিবেশ শোধরানোর সর্বোত্তম পদ্ধতি

আসলে ইখলাসের সঙ্গে কথা বললে, বারবার বলতে থাকলে এবং সঙ্গে-সঙ্গে আল্লাহ্র কাছে এ দুআ করতে থাকলে যে, হে আল্লাহ্! আমার অমুক ভাই অমুক গুনাহে লিপ্ত, তাকে হেদায়াত করুন এবং তাকে সঠিক পথে জুড়ে দিন; তাহলে আল্লাহ তাআলা সাধারণত ওই ব্যক্তির মন ঘুরিয়ে দেন এবং হেদায়াত দান করেন। উক্ত দু'টি পদ্ধতি অব্যর্থ। এর বরকতে আল্লাহ তাআলা পরিবেশকেও শুধরে দেন।

আমার আব্বাজান বলতেন, এ দু'টি কাজ হলো অটোমেটিক নিয়ন্ত্রকের মতো। একজন মুমিন অপর মুমিনকে যদি এভাবে শোধরানোর চেষ্টা চালিয়ে যায়, তাহলে এর দ্বারা তার সংশোধন হয়। পরিবেশটাও অটোমেটিকভাবে সুন্দর হয়ে যায়।

আল্লাহ্ আমাদের সবাইকে আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ -

দুটি ধারা–কিতাবুল্লাহ ও রিজালুল্লাহ

"ওস্তাদ ছাড়া শুধু পড়ালেখা দ্বারা কাজ হয় না। একথাটি শুধু আল্লাহ্র কিতাবের বেলায় নয়; বরং দুনিয়ার প্রতিটি জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও এটি এক স্বীকৃত নীতি। ছাত্রত্ব গ্রহণ প্রতিটি শিক্ষার্থীর জন্যই অপরিহার্য। বিষয়ের উপর পারদর্শিতা ছাড়া সংশ্লিষ্ট বিষয়ে দক্ষতা অর্জন করতে পারে না।

...একথাগুলো হৃদয়ে গেঁথে নিন। বর্তমানের সব বুদ্ধিপ্রসূত ভ্রষ্ট মতবাদ ও কর্মকাণ্ডের তোড়জোড় এ মৌলিক কথাগুলো না জানার কারণেই দেখা যাচ্ছে। শুধু কিতাব পড়ে রিজালকে পেছনে ঠেলে দিচ্ছে এবং নিজেকে ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মতো মুজহাতিদ দাবি করার সাহস দেখাচ্ছে।"

দু'টি ধারা–কিতাবুল্লাহ ও রিজালুল্লাহ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلٰى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ اَجْمَعِيْنَ ، اَمَّا بَعْدُ :

فَأَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ – بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ إِذْ بَعَثَ فِيْهِمْ رَسُوْلاً مِّنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُوْ عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ ○

(سورة آل عمران ١٦٤)

দু'টি ধারা

মানবজাতির সংশোধনের জন্য আল্লাহ তাআলা দু'টি ধারা একসঙ্গে দান করেছেন। এক. কিতাবুল্লাহর ধারা। কিতাবুল্লাহ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে নাযিলকৃত আসমানী কিতাব। যেমন– তাওরাত, যবূর, ইঞ্জিল ও সর্বশেষ নাযিলকৃত কিতাব কুরআন মজীদ।

দুই. রিজালুল্লাহর ধারা। রিজালুল্লাহ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, আম্বিয়ায়ে কেরাম। রিজালুল্লাহ পাঠানো হয়েছে কিতাবুল্লাহর ব্যাখ্যাদানের জন্য, যেন তাঁরা 'কিতাবুল্লাহ' বাস্তবায়ন করতে পারেন, কিতাবের মর্মার্থ ও উদ্দেশ্য মানুষের সামনে পেশ করতে পারেন, নিজেদের কথা ও কর্ম দ্বারা কিতাবুল্লাহর বাস্তবায়ন পদ্ধতি বাতলে দিতে পারেন। এসব উদ্দেশ্যেই এ পৃথিবীতে আম্বিয়ায়ে কেরামের শুভাগমন। এ মর্মে আল্লাহ তাআলা বলেন–

وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ-

আপনার কাছে আমি এ যিক্‌র তথা কুরআন মজীদ অবতীর্ণ করেছি, যাতে আপনি লোকদের সামনে ওইসব খুলে খুলে বর্ণনা করেন, যেগুলো তাদের প্রতি নাযিল করা হয়েছে, যাতে তারা চিন্তা-ভাবনা করে। –(সূরা নহল : ৪৪)

এ প্রসঙ্গে অন্যত্র তিনি বলেন–

لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ إِذْ بَعَثَ فِيْهِمْ رَسُوْلاً مِّنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُوْ عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ -

"আল্লাহ্ ঈমানদারদের উপর অনুগ্রহ করেছেন যে, তাদের মাঝে তাদের নিজেদের মধ্য থেকে নবী পাঠিয়েছেন। তিনি তাদের জন্যে তাঁর আয়াতসমূহ পাঠ করেন, তাদের পরিশোধন করেন, তাদেরকে কিতাব ও কাজের কথা শিক্ষা দেন।" –(সূরা আলে-ইমরান : ১৬৪)

প্রতীয়মান হলো, প্রত্যেক নবীর আগমনের মূল উদ্দেশ্য হলো, আল্লাহ্‌র কিতাব মানুষদেরকে শেখানো। এজন্যই নবীগণ হলেন মানবজাতির শিক্ষক। শিক্ষকের দিক-নির্দেশনা ও ব্যাখ্যাদান ছাড়া আমরা আল্লাহ্‌র কিতাব থেকে সরাসরি শিক্ষাগ্রহণ করার যোগ্যতা রাখি না।

ওস্তাদ ছাড়া শুধু পড়ালেখা দ্বারা কাজ হয় না। এটা আল্লাহ্‌র কিতাবের বেলায়ই কেবল প্রযোজ্য নয়; বরং দুনিয়ার প্রতিটি জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও এটি এক স্বীকৃত নীতি। ছাত্রত্ব গ্রহণ প্রতিটি শিক্ষার্থীর জন্যই অপরিহার্য। বিষয়ের উপর পারদর্শিতার জন্য শুধু লেখাপড়া যথেষ্ট নয়। বরং প্রয়োজন শিক্ষক ধরা। এছাড়া কেউ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে দক্ষতা অর্জন করতে পারে না।

কবরস্থান আবাদ করবে

মেডিকেল সায়েন্স বিষয়ে বাজারে বই-পত্রের অভাব নেই। সব ভাষাতেই এ বিষয়ে যথেষ্ট লেখনী বাজারে পাওয়া যায়। কোনো মেধাবী ব্যক্তি যদি ডাক্তার হওয়ার আশা করে, তাহলে তাকে এ বিষয়ে বাজারের কিতাবগুলো সহযোগিতা করতে পারে, কিন্তু প্রকৃত ডাক্তার বানাতে পারে না। কারণ, ঘরে বসে বই পড়ে ডাক্তার হওয়া যায় না। এরূপ হতে চাইলে সে ডাক্তার হবে ঠিক, তবে কবরস্থান আবাদকারী ডাক্তার হবে। এজন্যই বিশ্বের কোনো রাষ্ট্র এ ব্যক্তিকে ডাক্তারির অনুমতি দেবে না। মানুষের জীবন নিয়ে খেলা করার অনুমতি কেউই দিতে পারে

না। সুতরাং প্রকৃত ডাক্তার হতে হলে তাকে সুস্থ ধারা অবলম্বন করতে হবে। ওস্তাদ ধরতে হবে। একজন পেশাদার ডাক্তারের কাছে থেকে তাকে ডাক্তারি শিখতে হবে। এ ছাড়া ডাক্তার হওয়ার দ্বিতীয় কোনো পথ তার জন্য খোলা নেই।

মানুষ ও জন্তুর মাঝে পার্থক্য

মানুষ ও জন্তু এক নয়। আল্লাহ তাআলা এদের মাঝে ভিন্নতা দান করেছেন। জন্তুর শিক্ষক নেই। তাদের বেলায় শিক্ষকের প্রয়োজন খুব একটা নেই। যেমন মাছের পোনা ডিম থেকে বের হয়েই সাঁতার কাটা শুরু করে দেয়। তাকে সাঁতার শেখাতে হয় না। সৃষ্টিগতভাবে এক্ষেত্রে তার শিক্ষকের দরকার হয় না।

কিন্তু মানুষকে সাঁতার শিখতে হয়। মাছের পোনার মতো সে প্রথমেই সাঁতার কাটতে পারে না। কোনো ব্যক্তি যদি মাছের পোনার মতো নিজের বাচ্চাকে পানিতে ছেড়ে দেয় আর সাঁতার কাটতে বলে, তাহলে সে মহাবোকা বৈ কিছু নয়।

অনুরূপভাবে মুরগির বাচ্চা ডিম থেকে বের হওয়ামাত্র হাঁটতে পারে। নিজের খাবার নিজে খেতে পারে। পক্ষান্তরে মানুষের সন্তান এমনটি পারে না। তাকে হাঁটা শেখাতে হয়। ধীরে-ধীরে খাবার খাওয়াতে হয়, শেখাতে হয়।

বোঝা গেলো, মানুষ আর পশুপাখি এক নয়। পশুপাখি শিক্ষানির্ভর নয়; কিন্তু মানুষ সব সময়ই শিক্ষানির্ভর। প্রায় কাজই তাকে শিখতে হয়। শিক্ষক বা মুরুব্বি দ্বারা তাকে শেখাতে হয়।

বই পড়ে আলমারি বানানো

কারিগরি শিক্ষার বই। টেবিল, চেয়ার, আলমারি ইত্যাদি কীভাবে বানাতে হয়– সবকিছুই বইটিতে লেখা আছে। কী-কী কাচামাল লাগবে– তাও বিস্তারিত লেখা আছে। বলুন, এ বইটিকে সামনে রেখে আলমারি বানানো যাবে কি? না। কিন্তু বইটির আদ্যোপান্ত হয়ত তোমার জানা নেই, তবে একজন মিস্ত্রী তোমাকে হাতে-কলমে শিখিয়ে দিয়েছে আলমারি কীভাবে বানাতে হয়, তাহলে নিশ্চয় আলমারি বানানো তোমার দ্বারা সম্ভব হবে। সহজেই তুমি আলমারি বানিয়ে দেখাতে পারবে।

বই দ্বারা বিরিয়ানি হয় না

রান্না-বান্না শেখার বই। পোলাও, কোরমা, বিরিয়ানি, কাবাবসহ সব ধরনের খাবার তৈরির টিপ্স বইটিতে পাবে। বইটি হাতে নিয়ে যদি তুমি বিরিয়ানি পাকাতে বসে যাও, নির্দেশনা মতো লবণ-মরিচ, মসলা ইত্যাদি ব্যবহার কর, আমি বলবো, বিরিয়ানি পাকানো তোমার দ্বারা হবে না। তখন বিরিয়ানি না কোন মাথা পাকাবে, আল্লাহ্ই ভালো জানেন। বরং বিরিয়ানি পাকাতে হলে তোমাকে একজন পাচকের থেকে শিক্ষা নিতেই হবে। শুধু বই পড়ে বিরিয়ানি পাকানো সম্ভব নয়।

বাস্তব নমুনা মানুষের লাগবেই

মোটকথা, শুধু বই পড়ে মানুষ কোনো বিষয়ে দক্ষ ও পারদর্শী হতে পারে না। আল্লাহ তাআলা মানুষকে এভাবেই সৃষ্টি করেছেন। এজন্য মানুষের শিক্ষা-দীক্ষার জন্য প্রয়োজন হয় ওস্তাদের, মুরুব্বির বা একজন দীক্ষাগুরুর। দুনিয়ার সকল জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেই একথাটি প্রযোজ্য। দ্বীনী শিক্ষার বিষয়টিও এ থেকে মুক্ত নয়। শুধু দ্বীনী বই-পুস্তক পড়ে দ্বীন শেখা যায় না। দ্বীন শিখতে হলে ওস্তাদ, মুরুব্বি বা মু'আল্লিম লাগবেই, যাদের সোহবত কিংবা জীবনাচার দেখা ছাড়া দ্বীন শেখা আদৌ সম্ভব নয়।

শুধু কিতাব পাঠানো হয়নি

কিতাব এসেছে। তার সঙ্গে কোনো নবী বা রাসূল আসেননি– এমন একটি উদাহরণও আপনারা পেশ করতে পারবেন না। হ্যাঁ, নবী এসেছেন, কিতাব আসেনি, বরং পূর্ববর্তী কিতাবের অনুসরণ তিনি করেছেন– এরূপ দৃষ্টান্ত অবশ্যই আছে। কিন্তু নবী ছাড়া কিতাব এসেছে– এ জাতীয় কোনো দৃষ্টান্ত নেই। কেন নেই?

এর কারণ হলো, যদি শুধু কিতাব পাঠানো হতো, মানুষ এ থেকে কিছুই শিখতে পারতো না এবং হিদায়াতের পথও পেতো না। শুধু কিতাব থেকে উপকৃত হওয়ার যোগ্যতা মানুষের মাঝে নেই। তাই আল্লাহ্ নবী ছাড়া শুধু কিতাব পাঠাননি। তিনি যে শুধু কিতাব পাঠাতে পারতেন না এমন নয়। তাছাড়া মুশরিকরাও প্রায় এরকমই দাবি করেছিলো যে–

لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْاٰنُ جُمْلَةً وَّاحِدَةً –

'আমাদের কাছে একবারেই কুরআন পাঠানো হয়নি কেন?'

বস্তুত আল্লাহ্র জন্য এটা মোটেও কঠিন ছিলো না যে, মানুষ সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখবে, তার শিয়রে একটা কিতাব ঝকঝক করছে। আর আল্লাহ্ আসমান থেকে বলে দেবেন, হে মানবজাতি! এটা তোমাদের কাছে পাঠানো হয়েছে। তোমরা এরই শিক্ষার আলোকে চলবে, এর উপর আমল করবে। কিন্তু আল্লাহ এ জাতীয় কিছু করেননি। তিনি শুধু কিতাব পাঠাননি। বরং কিতাবও পাঠিয়েছেন, সঙ্গে শিক্ষকও পাঠিয়েছেন। এমনটি কেন করেছেন?

কিতাব পড়ার জন্য দুই নূরের প্রয়োজনীয়তা

কারণ, আম্বিয়ায়ে কেরামের শিক্ষার নূর যতক্ষণ না থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত কিতাব বুঝে আসবে না। শুধু কিতাব থাকলে হয় না, বরং কিতাবের লেখাগুলো দেখার জন্য বাইরের আলোর প্রয়োজন হয়। কিন্তু পাঠক যদি অন্ধ হয়, তার চোখে যদি জ্যোতি না থাকে, তাহলে বহিরাগত আলোও কোনো কাজে আসে না। অর্থাৎ- কিতাব বোঝার জন্য দুই আলো প্রয়োজন। প্রথমত, বাইরের আলো তথা বাতির বা সূর্যের আলো। দ্বিতীয়, নিজের আলো তথা চোখের জ্যোতি। এ দু'টির কোনো একটি না থাকলে, কিতাব বোঝা তো দূরে থাক, পড়াও যাবে না। অনুরূপভাবে হিদায়াত পাওয়ার জন্য শুধু কিতাবুল্লাহ নামক নূর থাকলেই হয় না বরং রিজালুল্লাহ নামক নূরেরও প্রয়োজন। এ কারণেই কিতাবুল্লাহ ও রিজালুল্লাহ নামক দুই ধারা আল্লাহ্ মানুষের কাছে পাঠিয়েছেন।

'হাসবুনা কিতাবুল্লাহ'র শ্লোগান

একটি ভ্রান্ত দলের শ্লোগান ছিলো, حَسْبُنَا كِتَابُ اللهِ অর্থাৎ- আল্লাহ্র কিতাবই আমাদের পথ চলার জন্য যথেষ্ট। শ্লোগানটা দৃশ্যত চমৎকার। বাহ্যিক দৃষ্টিতে মনে হয় যথার্থ শ্লোগান! যেহেতু কুরআন মজীদেই তো এসেছে- تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ 'তার মধ্যে প্রতিটি বিষয়ের বিবরণ রয়েছে।'

কিন্তু বাস্তবে এ শ্লোগানটা অত্যন্ত জঘন্য। এদের কাছে প্রশ্ন রাখুন, মেডিকেল সায়েন্সের বই তো তোমার কাছে আছে, যেখানে চিকিৎসার প্রতিটি বিষয়ের বিবরণও আছে, কিন্তু শিক্ষক ছাড়া শুধু বইটি পড়ে কি কেউ ডাক্তার হতে পারবে? অনুরূপভাবে শুধু কিতাবুল্লাহ দ্বারা মানুষ হেদায়াত পেতে পারে না। বরং কিতাবুল্লাহর সঙ্গে প্রয়োজন রিজালুল্লাহ। তথা আম্বিয়ায়ে কেরামের শিক্ষা ছাড়া কিতাবুল্লাহ থেকে ফায়দা গ্রহণ করার কল্পনাও করা যায় না।

মোটকথা, যারা শুধু কিতাবুল্লাহ পেয়েই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছে এবং রিজালুল্লাহ তথা আম্বিয়ায়ে কেরামের শিক্ষাকে অপাঙক্তেয় মনে করেছে, প্রকৃতপক্ষে তারা পথভ্রষ্ট হয়েছে। কারণ, রিজালুল্লাহকে অস্বীকার করা তো কিতাবুল্লাহকে অস্বীকার করার নামান্তর। কিতাবুল্লাহতেই তো রয়েছে রিজালুল্লাহ তথা আম্বিয়ায়ে কেরাম হলেন কিতাবুল্লাহর শিক্ষক। শিক্ষক ছাড়া কিতাবুল্লাহ থেকে ফায়দা নেয়ার সুযোগ কারো জন্য নেই। কিতাবুল্লাহ মানতে হলে রিজালুল্লাহ মানতেই হবে। রিজালুল্লাহকে অস্বীকার করা মানে কিতাবুল্লাহকেই অস্বীকার করা।

মেডিকেল সায়েন্সের গ্রন্থরাজি খুলে দেখলে শুরুতে একটি লেখা সাধারণত সকলের নজর কাড়ে। তা হলো, 'চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া অষুধ সেবন করা নিষেধ।' কোনো ব্যক্তি যদি এ সতর্কীকরণ বার্তাটা ভুলে যায় এবং সব রোগের চিকিৎসা শুরু করে দেয়, তবে রোগ-প্রবৃদ্ধির সহায়তা করা ছাড়া তার দ্বারা আর কিছুই হবে না। অনুরূপভাবে যারা রিজালুল্লাহ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং শুধু কিতাবুল্লাহকেই যথেষ্ট মনে করে, তাদের দ্বারা ভ্রষ্টতার পথ বেগবান হওয়া ছাড়া আর কিছুই হবে না।

শুধু রিজালও যথেষ্ট নয়

আরেকটি দল রয়েছে, যারা রিজালুল্লাহকেই মনে করে সবকিছু। রিজালুল্লাহর প্রতি আনুগত্য দেখিয়ে তারা কিতাবুল্লাহকে পেছনে ঠেলে দেয়। তারা বলে, আমাদের জন্য রিজালই যথেষ্ট, কিতাবুল্লাহতে কী আছে, তা আমাদের জানার দরকার নেই। এই বলে যেই 'রিজাল' তাদের মনঃপুত হয়, তার কাছে গিয়ে ধর্না দেয়। তাকে নিজেদের নেতা মনে করে, পূজা শুরু করে দেয়। এরাও ভ্রান্ত, এরাও পথহারা।

সঠিক পথ

সঠিক পথ হলো, এর মাঝামাঝিটা। অর্থাৎ- কিতাবুল্লাহ ও রিজালুল্লাহ উভয়টাই ধরো। রিজালুল্লাহর শিক্ষার আলোকে কিতাবুল্লাহর উপর আমল করো। উভয়টার সমন্বয় হলেই তবে হেদায়াত পাওয়া যাবে। এ দিকে ইঙ্গিত করে এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন- مَا اَنَا عَلَيْهِ وَاَصْحَابِىْ এখানে مَا اَنَا عَلَيْهِ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, কিতাব। আর اَصْحَابِىْ দ্বারা উদ্দেশ্য- রিজাল। অর্থাৎ কিতাব- যার উপর আমি আছি তা গ্রহণ করো এবং সাহাবায়ে কেরামের

অনুসরণ করো। যে ব্যক্তি এ উভয়টার সমন্বয় ঘটাতে পারবে, সে হেদায়াত পাবে।

আলোচ্য মৌলিক কথাগুলো হৃদয়ে বসাতে পারলে বর্তমানের সব বুদ্ধিপ্রসূত ভ্রষ্ট মতবাদ ও কর্মকাণ্ডের পথ বন্ধ হয়ে যাবে। যারা কিতাব পড়ে-পড়ে নিজেদেরকে ইমাম আবু হানীফার মতো মুজতাহিদ দাবি করে, তাদের দাবিও থিতিয়ে পড়বে ইনশাআল্লাহ্।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ -